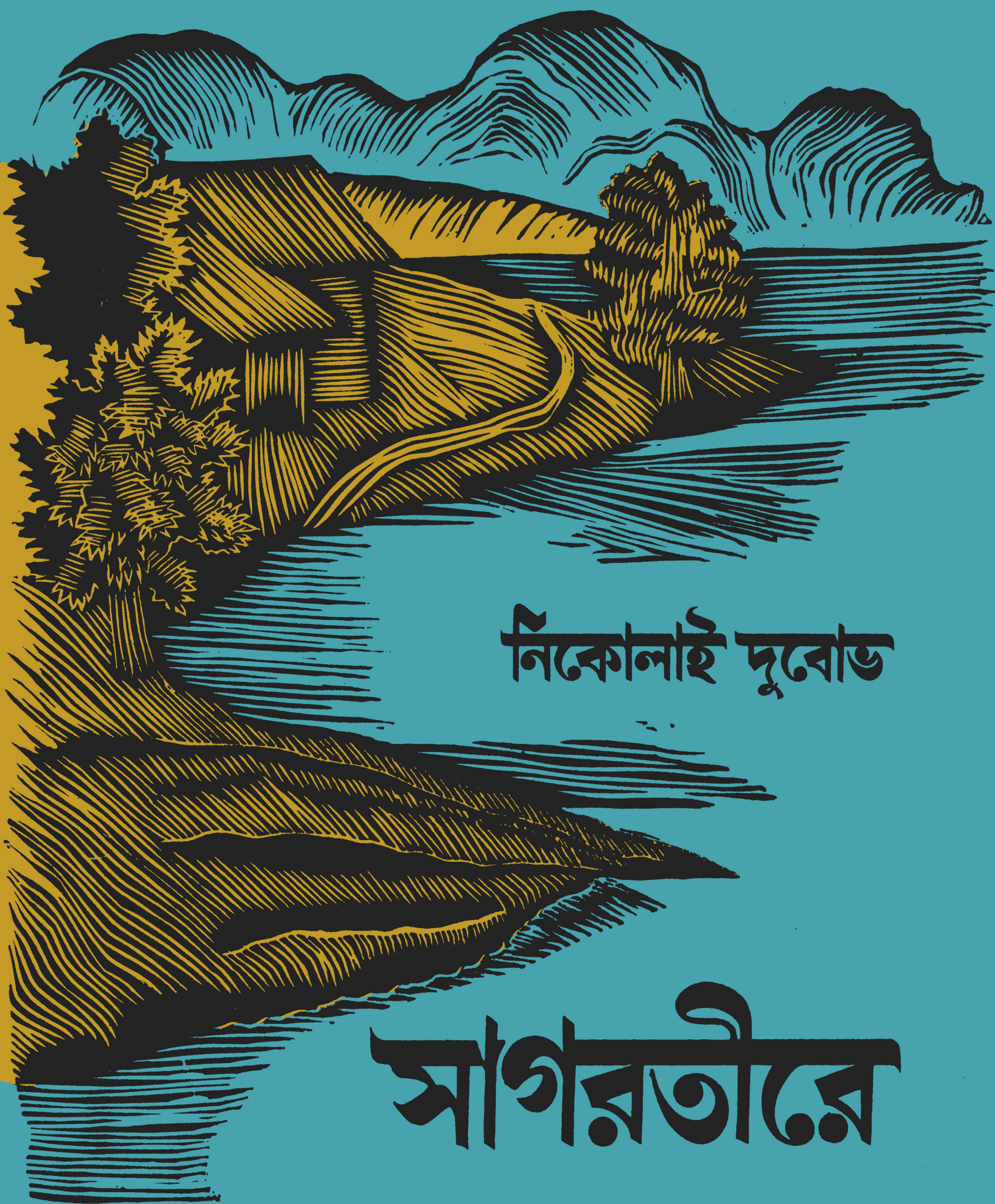


নিকোলাই দুবোভ

সাগরতীরে

নিকোলাই দুবোভ · সাগরতীরে



নিকোলাই দুবোভ

সাগরতীরে

দুটি উপাখ্যান



'রাদুগা' প্রকাশন
তাশখন্দ

মূল রুশ থেকে অনুবাদ
অরুণ সোম
ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: আ. বুরকাতোভ্স্কি

Н. ДУБОВ

МАЛЬЧИК У МОРЯ

Повести

На языке бенгали

DUBOV N.

A BOY BY THE SEA

Stories

In Bengali

স্কুলের মাঝারি ও বড় বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

Д $\frac{4803010102—571}{031(05)—85}$ 090—84

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-000107-2

সূচী

গ্রন্থকার প্রসঙ্গে ৫
নদীর বুকে আলোর মেলা (অনুবাদ: অরুণ সোম) ১১
সাগরতীরে (অনুবাদ: ননী ভৌমিক) ১২৫



গ্রন্থকার প্রসঙ্গে

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত উপাখ্যানদুটির রচয়িতা নিকোলাই দুবোভ — খ্যাতনামা আধুনিক সোভিয়েত লেখক। তাঁর অধিকাংশ রচনাই শিশুদের সম্পর্কে এবং শিশুদের জন্য। সাহিত্যজগতে দুই দশকের কিঞ্চিদধিক কর্মকালের মধ্যে নিকোলাই দুবোভ এমন সমস্ত বই লিখেছেন যেগুলি সোভিয়েত দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েদের অন্যতম প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। কেবল সোভিয়েত দেশের ছেলেমেয়েদের কথাই বা বলি কেন। দুবোভের লেখা বই বাইরের বহু দেশে অনূদিত হয়েছে। পনেরোটি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নে, যেখানে অসংখ্য জাতির বাস, সেখানে অধিকাংশ প্রজাতন্ত্রের ভাষায়ই দুবোভের রচনা অনূদিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে নিকোলাই দুবোভের উপন্যাস 'একের দুঃখ' সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন করে। আর তাঁর 'নদীর বুকে আলোর মেলা' ও 'সাগরতীরে' — বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই দুই উপাখ্যান অবলম্বনে যে চলচ্চিত্র তোলা হয় সেগুলি ছোট বড় সব দর্শকের কাছেই বিপুল সাফল্য লাভ করে।

যে-সমস্ত প্রকাশনী থেকে দুবোভের বইগুলি প্রকাশিত হয় সেখানে প্রায়ই খুদে পাঠক-পাঠিকারা চিঠি লিখে প্রশ্ন করে: ছোটদের এবং বড়দের যিনি এত ভালো করে জানেন, যিনি কঠিন সত্য উপস্থাপিত করে তাঁর পাঠকবর্গকে ভয় পাইয়ে দিতে পিছপা নন, এই যে লেখকটি, ইনি কে? প্রশ্নটি মোটেই ফাঁকা ধরনের নয়, বরং অতি গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকারের ভালো বইয়ে লেখকের কল্পিত চরিত্রগুলি ছাড়া থাকে আরও একটি চরিত্র — সম্ভবত প্রধানতমও বটে: স্বয়ং লেখক, গ্রন্থকার নিজে। তাঁর অনুরাগ ও বিরাগ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বইয়ে প্রভাব ফেলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে। বিবেচনাশীল পাঠক এটা অনুভব

করে, তাই যে-সমস্ত মানুষকে লেখক তাঁর রচনায় হাজির করেছেন তাদের প্রতি আগ্রহের চেয়ে লেখকের প্রতি আগ্রহও তার কোন অংশে কম নয়। পাঠকবর্গের অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল কেন লেখক তাঁর অধিকাংশ চরিত্র নির্বাচন করেন শ্রমিকদের মধ্য থেকে; কেন বয়স্কদের সঙ্গে ছোটদের সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর এত মনোযোগ। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহের জবাব মিলবে নিকোলাই দুবোভের জীবনীতে এবং তাঁর রচনায়।

১৯১০ সালে সাইবেরিয়ায় লোকোমোটিভ মেরামত কারখানার এক শ্রমিকের পরিবারে নিকোলাই দুবোভের জন্ম। পিতার মতো তিনিও তাঁর জীবনপথপরিক্রমা শুরু করেন এই কারখানায়ই শ্রমিক হয়ে। অতি অল্প বয়সেই এই তরুণ শ্রমিকের সাহিত্যিক ক্ষমতার স্ফুরণ ঘটে। তিনি লিখতে শুরু করেন কারখানার সংবাদপত্রে, পরে হলেন শহরের একটি বড় পত্রিকার কর্মী। তাঁর যে কেবল লেখার সাধ ছিল তা-ই নয়, লেখার উপযুক্ত বিষয়বস্তুও তাঁর ছিল। ইতিমধ্যে কাজ করার এবং লোকজনকে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছে — তাদের মধ্যে দেখেছেন নানা ধরনের মানুষ, একে অন্যের চেয়ে আলাদা। যত অগ্রসর হতে লাগলেন ততই ভবিষ্যৎ লেখকের কাছে জীবনের পাঠশালা জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করতে লাগল : যেন কোন এক বিশাল পাঠশালায় তিনি এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে হতে চলেছেন। সমস্ত কিছু নিজের চোখে দেখার এবং নিজে জানার সাহিত্যিকসুলভ প্রবল তৃষ্ণায় তাড়িত হয়ে নিকোলাই দুবোভ অসংখ্য জীবিকা ও কর্মস্থল বদল করেন। শিক্ষাগ্রহণ করেন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিভাগে, শিক্ষকতা করেন, গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন, কারখানার ক্লাব পরিচালনা করেন। বাস করেন মস্কো জেলায়, মধ্য এশিয়ায়, আলতাইয়ে, ইউক্রেনে। সাংবাদিকতা থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে আসেন নাট্যকার রূপে। যুদ্ধের পর দুবোভের প্রথম দিককার নাটকগুলি বেশ কয়েকটি থিয়েটারে অভিনীত হয়, সেগুলির একটি পুরস্কারেও ভূষিত হয়। নাট্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং খ্যাতি অর্জনের পর চল্লিশ বছর বয়সে পড়তে লেখত যখন হঠাৎ নাটক ছেড়ে শিশুদের জন্য আর শিশুদের বিষয়ে বই লিখতে শুরু করলেন তখন সকলের কাছেই সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল।

কিন্তু দুবোভের লেখক-জীবনের এহেন আকস্মিক গতি পরিবর্তনের নিজস্ব এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। যে সব বয়স্ক লোকজনের মাঝখানে দুবোভ জীবন কাটান তারা সকলে — ভালো হোক আর মন্দ হোক, উদগ্র হোক আর উদাসীন হোক, প্রফুল্ল হোক আর সদা অসন্তুষ্ট হোক — কোন এক সময় ছিল জীবনের আনন্দ রসে উচ্ছল শিশু, তখনও তারা কারও ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই করার অবকাশ পায় নি। তাহলে তারা বড় হয়ে এমন ভিন্ন ভিন্ন রকমের হল কী করে? কবে, তাদের ছেলেবেলার কোন্ বছরে তাদের একেক জনে অলক্ষিতে এমন একেকটি প্রথম পদক্ষেপ করে যার ফলে কেউ পরিচালিত হয় সৎ ও অকপট জীবনের পথে কেউ বা পরিণত হয় নীতিজ্ঞানহীন কুৎসিত মানুষে — নির্মম ও নির্দয় ব্যক্তিতে?

একা নিকোলাই দ্ববোভই যে নিজেকে এই প্রশ্ন করেন এমন নয়। মানুষের ভেতরে তার মানবিক মর্যাদা সম্পর্কে চেতনা, নিকট জনের প্রতি ভালোবাসা, সমাজের প্রতি ও নিজের প্রতি তার কর্তব্যবোধ কী করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, এমন একজনও বড় লেখক নেই যিনি এই বিষয়ের বিশ্লেষণে রত হন নি। নিকোলাই দ্ববোভ ছোটদের সম্পর্কে এবং ছোটদের জন্য যে লিখতে আরম্ভ করেন তার কারণ তিনি মনে করেন: শিশু বয়স আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তার মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই যা ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখা যায়! কোন হিংসা-বিদ্বেষের, কোন অসৎ মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন হবে না, বুঝতে হবে যে এই বয়সেই মানুষ তার জীবনের প্রধানতম পাঠগুলি গ্রহণ করে থাকে।

নিকোলাই দুবোভের গ্রন্থসমূহের প্রধান চরিত্র — সোভিয়েত শিশুরা। তারা বড় হয়ে উঠছে এমন এক মানব-সম্মিলনের মধ্যে যেখানে প্রত্যেককে পরিমাপ করা হয় সকলের জন্য সে কতটা ভালো করছে তার নিরিখে। মানুষ কেবল তার নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য — এখানেই তার মূল্য। কতটা মাছ সে ধরল, কতটা ফসল ফলালো, বনভূমি রক্ষা করল, তার সামান্য অথবা বিরাট কাজ কী ভাবে সম্পাদন করল — এরই মধ্যে মানুষের পরিচয়। দুবোভের রচনায় বড়দের আর ছোটদের জগৎ একে অন্য থেকে বিছিন্ন নয়। সত্যিকারের জীবনের মতোই এই জগৎ একক, আর একমাত্র এই কারণেই শিশুরা ক্ষমতা রাখে সেই জীব হয়ে উঠার যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'হোমো স্যাপাইনস' — বিচক্ষণ মানুষ।

জন্তুজানোয়ারেরা ছোট শিশুকে অপহরণ করার পর সেই শিশু তাদের মধ্যে হয়ে উঠে কী ভাবে মানুষ থেকে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার জন্তুজানোয়ারের সমস্ত রকম হাবভাব এবং ভাষাও শেখে এবিষয়ে কৌতূহলজনক বই সাহিত্যে আছে। সকলেরই সম্ভবত জানা আছে কিপলিং-এর মাওগ্লি রূপকথা, অনেকেই হয়ত টার্জন সম্পর্কিত বইগুলির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন। উক্ত কিংবদন্তীগুলি যে কতদূর অসার ও অলীক, আধুনিক বিজ্ঞানে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। জন্তুজানোয়ার কর্তৃক অপহৃত ছোট শিশুরা জন্তুদের মধ্যে বেড়ে উঠে কখনই মানুষ হতে পারে নি: শিখতে পারে নি ভাবনাচিন্তা করতে, কথাবার্তা বলতে, দুপায়ে হাঁটতে। তার একমাত্র কারণ, মানুষ সামাজিক জীব। একমাত্র বয়স্ক মানুষদের মাঝখানে বসবাস করার ফলেই শিশু শিখতে পারে মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া, হাঁটাচলা, কথাবার্তা, মেলামেশা করতে পারে অন্য লোকজনের সঙ্গে। আর একমাত্র বয়স্কদের কাছ থেকে শিশু শিখতে পারে ন্যায়পরায়ণতা, সততা কিংবা এসবের বিপরীত: মিথ্যাচার ও নিষ্ঠুরতা। এই কারণেই দুবোভের রচনায় শিশুদের প্রতি যতখানি, ঠিক ততটাই মনোযোগ দেওয়া হয় বয়স্কদের প্রতিও।

বয়স্ক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত শিশুর জীবনে যে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত উপাখ্যানদুটিতে তার উজ্জ্বল বিবরণ আছে। 'নদীর বুকে আলোর মেলা' উপাখ্যানের নায়ক শহুরে ছেলে কোস্তিয়া মোটেই সোনার টুকরো ছেলে নয়, আদর্শ সুবোধ বালকটি নয়। মা'র

দিকে সে খুব একটা নজর দেয় না, সুযোগ পেলে ছোট বোনটির মাথায় চড়চাপড় মারে আর বড়াই করতেও ছাড়ে না। অধিকাংশ শিশুর ক্ষেত্রেই যেমন দেখা যায়, কোস্তিয়াও তেমন পছন্দ করে না যখন তাকে অনবরত কেউ বলতে থাকে — 'এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত নয়'। সে এসে পড়ল তার মামার পরিবারে। নীপার নদীর এই বয়া-তদারককারীটি জীবনে সাফল্য লাভ করেন নি, করুণ তাঁর ভাগ্য। যে বয়সে লোকে পড়াশুনা করে তখন তাঁকে যেতে হয় যুদ্ধে, আর ফিরে আসার পর দেখতে দেখতে হারালেন তার স্বল্পকালীন সুখ: হারালেন প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে, বয়া-তদারককারী হয়ে বসলেন নদীর তীরে, মাতৃহারা কন্যার সঙ্গে বাস করতে থাকেন এক নিঃসঙ্গ কুঠিতে।

কিন্তু এই শান্ত, সদাশয় ও প্রফুল্ল মানুষটির ভেতরে নিজের 'ভাগ্যহীনতা' সম্পর্কে বিষণ্ন চিন্তার ছায়ামাত্র নেই। কোস্তিয়ার মামার কাছে শ্রমের মধ্যে ছোট বড় কোন বিভাগ নেই, মানুষে মানুষে সম্পর্ক নির্ভর করে না পদমর্যাদা ও খেতাবের উপর। সব মানুষের জন্য তাঁর আছে একটিই মাপকাঠি — নৈতিক মাপকাঠি। না মেয়ের সঙ্গে, না ভাগ্নের সঙ্গে কথাবার্তায় শিক্ষাদানের চেষ্টা তিনি করেন না। আর দশজনের সঙ্গে যেমন, তাদের সঙ্গেও তিনি সেই একই রকম — তিনি যেমন, তেমনি! তিনি তার মেয়ের ওপর, ভাগ্নের ওপর এবং তাঁর আশেপাশের সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন কেবল তাঁর জীবনের আদর্শ দিয়ে, কেবল তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ... কেবল এই!.. কিন্তু এটা কি কম হল?

নিকোলাই দুবোভ স্বভাবতই গভীর মনোযোগ দিয়ে থাকেন মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি। আর সর্বোপরি শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতি। অনেকের ধারণায়, শিশু এখনও পূর্ণমানের মানুষ নয়, সে হল অনেকটা অর্ধপ্রস্তুত জিনিস, যা দিয়ে মানুষ গড়া হয়ে থাকে। 'নদীর বুকে আলোর মেলা' আর 'সাগরতীরে'র লেখকের কাছে এর চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছুই হতে পারে না। দুবোভের কাছে শিশু হল ব্যক্তিত্ব, এমন এক ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে এবং গড়ে উঠছে নৈতিক মতামত, নিজস্ব চরিত্র, পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। তদুপরি শিশুর মনে থাকে এই নৈতিক নিয়মের প্রতি দৃঢ়, অনড় বিশ্বাস যে যে-জগতে সে এসেছে তার সৃষ্টিই হয়েছে যাতে সেখানে বসবাস করা আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হতে পারে।

'সাগরতীরে'র নায়ক হিশেবে লেখক নির্বাচন করেছেন খুবই ছোট একটি বালককে। সাশুকের এখনও স্কুলে পড়ারই বয়স হয় নি, সে সবে শুরু করেছে জগতের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়, জানতে শুরু করেছে লোকজনকে, দেখতে শুরু করেছে পাহাড়পর্বত, সমুদ্র। কিন্তু এই বালকের জন্ম ও জীবনযাত্রা জেলে পরিবারে, যার কাছে জীবনযাপন করা, অন্ন ও বস্ত্র যোগানোর অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত হল দুরূহ ও বিপজ্জনক শ্রম। মা অসুস্থ হয়ে পড়লে সাশুককেই যখন মা'র জায়গায় সমুদ্রগামী জেলের জন্য খাবার রান্না করতে হয় তখন সেটা তার পক্ষে খেলা নয়, কোন অসাধারণ অনুরাগের বিষয় নয়, তা হল কাজ, এমন এক কাজ যা করতেই হবে। সে

জানে যে ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত জেলেরা ফিরে আসবে, তাদের জন্য কাউকে না কাউকে রান্না তৈরি করতেই হবে।

সাশুক যাদের মাঝখানে বাস করে সেই ছোট্ট দলবদ্ধ মানুষেরা শিশুর কাছে দেখা দিল সত্যিকারের বৃহৎ জগতের প্রতিরূপ হয়ে। তাকে নিজে নিজে সমাধান করতে হয় অসংখ্য জটিল, অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের। মানুষের আচার-আচরণ ও ব্যবহারের প্রভেদ কেন হয় তাদের প্রকৃত অভ্যন্তরীণ অবস্থার কারণে? লোকে কী বলে অনিষ্টাচরণ করতে পারে? কেন এমন সমস্ত সুন্দর সুন্দর শিক্ষিত মানুষ আছে যারা তাকে অন্য বলে ভাবে, নিজেদের সমান, নিজেদের ছেলেমেয়েদের সমকক্ষ বলে ভাবতে পারে না? পাঁচ বছরের ছোট্ট মানুষটি একান্তে এই রকম জ্বালাধরা, এত দুরূহ প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতে আত্মপ্রকাশ করে এক ব্যক্তিত্ব হয়ে, যে ব্যক্তিত্ব একাধারে সূক্ষ্ম বোধ আর জটিল অনুভূতি প্রকাশে সক্ষম। কিন্তু তা ঘটার কারণ এই যে এ জগতে সাশুক নিঃসঙ্গ নয়, কেননা বালক যেখানে বাস করে সেই বিচিত্র লোকসমিতির অধিকাংশ মানুষই দৃষ্টি রাখে যাতে তার মনে এই বিশ্বাস সদা জাগরূক থাকে যে এ জগৎ বিচক্ষণ চিন্তায় শৃঙ্খলাবদ্ধ, এখানে আছে ভালো ও মন্দের সীমানা আর খাঁটি মানুষকে অবশ্যই জানতে হবে এই সীমানা এবং কোন মতেই তা অতিক্রম করা চলবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে নিকোলাই দুবোভের রচনা সংগ্রহ তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত খণ্ডগুলিতে আছে বড় উপন্যাস, আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান ও ছোটগল্প। ঘটনাস্থল বিভিন্ন: সাগরতীর, সাইবেরিয়ার গণ্ডগ্রাম, বড় শহর ও অতি ক্ষুদ্র জনবসতি। চরিত্রও নানা ধরনের, শিশু ও বয়স্ক, কারও সঙ্গে কারও কোন মিল নেই। দুবোভের রচনায় বহু আনন্দের বিষয় আছে, বিষাদেরও আছে, আছে ছোট ও বড় নানা ঘটনা। কিন্তু সেগুলির মধ্যে নেই, থাকতে পারে না কোন অকিঞ্চিৎকর, কোন তুচ্ছ বিষয় যা লেখা হয়েছে নিছকই পাঠককে হাসানোর জন্য, নেহাৎই তার অনুকম্পাসূচক অশ্রুপাতের জন্য। তাঁর আঁকা চরিত্রগুলির জীবনে যা যা ঘটে সে সবই অতি গুরুত্বপূর্ণ। কেবল চরিত্রগুলির পক্ষেই নয়, যাঁরা দুবোভের বই পড়েন তাঁদের জন্যও বটে। জীবনের মতোই এই রচনাগুলিতেও শুভ ও অশুভ নিজেদের মধ্যে বিবাদ না করে, একে অন্যকে বাধা না দিয়ে শান্তিতে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না। এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত নয় — ভালো আচরণের কেবল এমনি সব নিয়ম রক্ষা করলেই সত্যিকারের ভালো মানুষ হওয়া যায় না। যা অশুভ, যা অসাধু, লোক-দেখানো ও অসত্য, তাকে ঘৃণা করতে জানা উচিত। এই শঠতাকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, তোমার পক্ষে লাভজনক হবে কিনা, এর ফলে তোমার ভালো হবে কিনা এসব কথা না ভেবে, কোন রকম ইতস্তত না করে তোমাকে যুঝতে হবে এই শঠতার বিরুদ্ধে।

হ্যাঁ, লোকে কখনও সহজ ও শোকদুঃখহীন জীবনের উপযোগী পরিপাটী, পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো অবস্থায় এই দুনিয়াকে পায় না। তৈরি জিনিসের ওপর ভরসা না রেখে

দুনিয়াকে তৈরি করতে হবে ভালো করে, সে কাজ করতে হবে নিজেকে — যুবক ও বৃদ্ধ সকলকে, করতে হবে মানবজীবনের সমস্ত কাল জুড়ে। নিকোলাই দুবোভের সমস্ত রচনার নায়ক — যাদের যাদের চরিত্রচিত্রণে তিনি এত জ্ঞান ও এত ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন তারা সকলেই যে আত্মীয়তার সূত্রে একত্রে গাঁথা তা হল জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িয়ে পড়ার প্রবল বাসনা, জীবনকে নিজের হাতে সুন্দর ও ভালো করে তোলার এবং নিজের হাতে এ কাজের সমস্ত প্রতিবন্ধককে পথ থেকে সরানোর বিপুল প্রয়াস। একমাত্র তখনই তারা হয়ে থাকে এমন এক জীবনের অধিকারী যেখানে সহজে ও স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা যায়, বাস করা যায়, মিলেমিশে থাকা যায়। একমাত্র তখনই তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হবে সুখ: তারা হতে পারবে যা তারা হতে চায় তা-ই, প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে নিজেদের যাবতীয় ক্ষমতা, শক্তি আর নৈপুণ্য। আর তখনই প্রতিটি মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে জন্মভূমির নিসর্গের সঙ্গে নিরন্তর মেলামেশার আনন্দ।

আর এটাও ত মানবজীবনের পরম আনন্দগুলির একটি! জন্মভূমির নিসর্গের সৌন্দর্য দর্শন করতে না শিখলে প্রকৃত আনন্দের জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত উপাখ্যানদুটিতে লেখক অনেক কথা লিখেছেন সেই সুখ সম্পর্কে, যা প্রতিটি স্বাভাবিক, খাঁটি মানুষ প্রত্যহ জন্মভূমির নিসর্গের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করে। আমরা বুঝতে শুরু করি যে লোকে যাকে সচরাচর 'সুন্দর' আখ্যা দিয়ে থাকে এই সুখ তার মাত্রার ওপর নির্ভর করে না। মানুষ নিসর্গের সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব পেতে পারে অতি সাধারণ বালি ঢাকা নগ্ন তীরভূমিতে, সে সৌন্দর্য থাকতে পারে নদীর বাঁকের ধারের তৃণভূমিতে, অন্তহীন তুন্দ্রার বুকে, ভয়াল তাইগায়, এমন কি হয়ত বা মেরুপ্রদেশের কোথাও, চিরতুষারাবৃত স্থানে, যেখানে বরফ কখনও গলে না।

কিন্তু দুবোভ এবং তাঁর নায়কদের কাছে নিসর্গের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে আর সব কথা ভুলে থাকলে চলে না। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই দেখা যায় যারা সহজ তৃপ্তিলাভের খাতিরে, ছিটেফোঁটা লাভের খাতিরে নদীতে আবর্জনারাশি ফেলতে, তৃণভূমি পদদলিত করতে, বন কাটতে ইতস্তত করে না, সেই সমস্ত দুষ্টপ্রকৃতির নিষ্কর্মা লোকজনের হাত থেকে, বুদ্ধিহীন, ভোঁতা লোকজনের হাত থেকে জন্মভূমির নিসর্গকে রক্ষা করার প্রবল, অপ্রতিরোধ্য চিন্তা।

নিকোলাই দুবোভের রচনা সম্পর্কে এবং তাঁর সম্পর্কে আমার এই যৎসামান্য বিবরণ থেকে, বর্তমান গ্রন্থে যে দুটি উপাখ্যান পাঠকবর্গ পাঠ করবেন তা থেকেও একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আমাদের সামনে যে লেখকটিকে আমরা পাচ্ছি তিনি যেমন লোকের কাছে তেমনি নিজের কাছেও দাবি করেন অনেক, তিনি অস্থির প্রকৃতির, আক্রমণাত্মক। কিন্তু এই অস্থিরতা কেবল মহৎই নয়, আমাদের সকলের পক্ষে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণও বটে। কেননা শিশুদের জন্য, প্রকৃতির জন্য অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা — এটাই হল জগতের ভবিষ্যতের জন্য, মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা।

লেভ রাজগোন্

নদীর বুকে আলোর মেলা



যাত্রা

কোস্তিয়াকে বিদায় দিতে এলেন তার মা, সেই সঙ্গে লিওল্‌কা।

মা আসার মানেটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু লিওল্‌কা ? লিওল্‌কা কেন ? মা তাকে বাড়িতেই রেখে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে এমন পরিত্রাহি কান্না জুড়ে দিল যে তাকে সঙ্গে নিতে হল। কোস্তিয়াকে বিদায় দিতে যাওয়া অবশ্য নয়, তার কাছে বেশি মজার ছিল জেটি আর স্টিমার দেখা। কেউ তাকে বিদায় দিতে আসে এটা কোস্তিয়ার ভারী দরকার পড়েছিল। তায় আবার লিওল্‌কার মতো কেউ ! সঙ্গী ছেলেরা, বিশেষত প্রাণের বন্ধু, লড়িয়ে ছেলে ফিওদর হলে না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু বন্ধু ফিওদর নেই, গতকাল সন্ধ্যাবেলায়ই সে তার বাবার সঙ্গে মাছ-শিকারে চলে গেছে ওস্তিওরে। প্রত্যেক শনিবার ওরা ওখানে যায়। কোস্তিয়া কতবারই না মাকে ধরাধরি করেছে ওদের সঙ্গে যাবার অনুমতি চেয়ে, কথা দিয়েছে পুরো একটা বালতি ভর্তি মাছ নিয়ে আসবে, কিন্তু মা ওকে ছাড়েন না, বলেন মাছ ত বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়। আসলে তাঁর ভয়, কোস্তিয়া বুঝি জলে ডুবে যায়। সে ডুবতে যাবে কেন ? ক্লাস ফাইভের 'বি' সেকশনে সে সবার চাইতে ভালো সাঁতার কাটতে পারে।

এখন সে মাছ ধরবে মামার বাড়ি গিয়ে ! কেবল ছিপগুলোই ফেলে আসতে হল বাড়িতে। মা কোন কথাই শুনতে চাইলেন না:

'না, ওটি চলবে না! ট্রলিবাসে কোন লাঠি-ছড়ি নয়। অমনিতেই কত ঝক্কি! পা আর চলে না!'

লাঠি-ছড়ি! কোস্তিয়ার ছিপের চেয়ে ভালো ছিপ আর কারও আছে নাকি? এমন কি ফিওদরেরও নেই। খাঁটি বাঁশের কঞ্চির। মামারই বা অমন আছে কিনা এখনও জানা নেই। তাছাড়া পা না চলার মতো ত কিছু দেখা যাচ্ছে না। চলছেন দেখ কেমন দমদমিয়ে — কোস্তিয়া কোন রকমে পেরে উঠছে, যাতে পিছিয়ে পড়তে না হয় তার জন্য বড় বড় পা ফেলতে হচ্ছে ওকে।

'কোস্তিয়া, বকের মতো পা ফেলবি না বলছি! এ কী অবাধ্যতা রে বাবা!'

গত বেশ কিছু দিন হল তাঁর মন যোগানো ভার হয়ে পড়েছে — কিছুই তাঁর মনঃপূত হয় না, সব সময় খুঁতখুঁত। মা অনবরত বলছেন কাজ উপলক্ষে বাইরে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে তিনি মাথা মোটেই ঠিক রাখতে পারছেন না। কথাটা বুঝতে না পেরে লিওল্‌কা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে:

'সে কেমন কথা মা? মাথা ত ঠিক জায়গায়ই আছে দেখছি।'

'তুই এখনও ছোট, বুঝিস না,' হাসতে হাসতে বলল কোস্তিয়া।

কোস্তিয়া বড়, ও বোঝে।

ওঃ, কাখোভ্‌কায় যাওয়া! তা মাথার ঠিক না থাকারই কথা — একেবারে যাওয়া ত দূরের কথা, এমন কি যদি কাজ উপলক্ষে যেতে হয় তাহলেও। যে জায়গায় এবং যে পথ বরাবর বাঁধ তৈরি হবে তা দেখতে পাওয়া আর ভূতত্ত্ববিদদের নানা রকম তৈলকুপ বসাতে দেখতে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নাকি! কিন্তু মা'র দুশ্চিন্তা এর জন্য নয়, তার দুশ্চিন্তা নেহাৎই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে: লিওল্‌কা ও কোস্তিয়াকে কোথায় কী ভাবে রাখা যায়, ঘরের কী ব্যবস্থা করা যায়, মামা এলেন না কেন, কী উপায় হবে এখন?

কোস্তিয়া খুবই বিচক্ষণ প্রস্তাব দিল: সবাই মিলে একসঙ্গে যাওয়া যাক, বেড়াতে গেলে ওদের অনুপস্থিতিতে ঘরবাড়ির কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মা রেগে গিয়ে বললেন ওর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। এটা বেড়াতে যাওয়া নয়, কাজের উপলক্ষে যাওয়া, আর ওখানে বাচ্চাদের করার কিছু নেই। মোটের ওপর বলতে গেলে কি ও মানুষের মতো মানুষ হত, তাহলে ওকে আর লিওল্‌কাকে মারিয়া আফানাসিয়েভনার কাছে রেখে তিনি নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু ও একেবারেই হাতের বাইরে চলে গেছে — ভয়ের ব্যাপার বৈকি, যখন বাচ্চারা বাবা ছাড়া বেড়ে উঠতে থাকে! — কারও কথা শোনে না, মারিয়া আফানাসিয়েভনার কথা যে শুনবে না তা ত বলাই বাহুল্য। তা-ই যদি হয় তাহলে লিওলিয়াকে তিনি রেখে দেবেন আর ওকে পাঠিয়ে দেবেন পলিয়ানস্কায়া গ্রেব্‌লিয়াতে, ওর মামার কাছে, উনি কোস্তিয়াকে শক্ত হাতে ধরে রাখতে পারবেন।

সে ত খুবই ভালো! গেল বছর মারিয়া আফানাসিয়েভনার কাছে ওকে থাকতে হয়েছিল,

যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে তার। 'কোস্তিয়া, কুঁজো হয়ে থাকিস নে!' 'কোস্তিয়া, ড্যাবড্যাব করে তাকাস নে!' 'খেতে বসার আগে হাত ধুলি নে যে?' 'অমন ভাবে কেউ উত্তর দেয় নাকি? কী অসভ্য ছেলে রে বাবা!' 'তোর পেট ব্যথা করছে নাকি?' 'কপালটা এগিয়ে দে ত, ছুঁয়ে দেখি'।... পেট, কপাল, গায়ের জামা। এহেন বাড়াবাড়ি রকমের দরদে কোস্তিয়ার বিতৃষ্ণা, তার বড় বিশ্রী লাগে এতে, তাই সে শুরু করে দেয় দুরন্তপনা, এমন কি ইচ্ছে না হলেও।

কিন্তু মামার সঙ্গে ওর অবশ্যই বনবে।

আর মা মিছিমিছিই দুশ্চিন্তা করছেন: ও ভালোয় ভালোয় পেঁৗছে যাবে। মামা এলেন না ত কী হয়েছে? উনি যে কাজে আছেন। তাছাড়া উনি যে স্টীমার-ঘাটে আমাকে নিতে আসবেন সেই মর্মে টেলিগ্রামও ত এসেছে। তার মানে, সব ঠিক আছে।

কিন্তু মা দুশ্চিন্তা না করে পারেন না। কাজ উপলক্ষে বাইরে যেতে হবে জানতে পারার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার দুশ্চিন্তার শুরু, আর এর পর থেকে কেবলই দুশ্চিন্তা, একের পর এক দুশ্চিন্তা। ও ঠিকমতো পেঁৗছুতে পারবে ত? কেমন থাকবে ওখানে? পথের জন্য কী কী দেওয়া যায় ওকে?

পথে আবার ওর কী দরকার হবে? লোকে যেমন যুদ্ধে যায়, অভিযানে যায় — সঙ্গে নেবে জাঙ্গিয়া আর জামা। তা নয় ত মা পুরো একটা তালা-আঁটা ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছেন, তাছাড়া পুঁটলিতে এটা-ওটা খাবারদাবার এমন ঠেসে পুরে দিয়েছেন যে মনে হচ্ছে সে বুঝি চলেছে কোন জনহীন দ্বীপে। এখন মা'র মনে হচ্ছে যে তিনি নির্ঘাত কিছু একটা ভুলে বাড়িতে ফেলে এসেছেন তাই ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে খুলে ফেলে তিনি সবকিছু ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকেন, কোস্তিয়াকে বলেন কোথায় কী আছে।

কোস্তিয়া কান দেয় না। ট্রলিবাসের খোলা জানলা দিয়ে দমকা হাওয়া ঢুকে লিওল্কার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে, কোস্তিয়ার শার্ট ফুলিয়ে দিচ্ছে পটকার মতো। দেখতে দেখতে ওরা চিড়িয়াখানা পেরিয়ে গেল, পেছনে ছুটে চলে গেল পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের বেড়া; পেছনে পড়ে থাকা ট্রামগাড়ির উদ্দেশে অবজ্ঞাভরে টায়ারের হিসহিস আওয়াজ তুলে ব্রেস্ত-লিথুয়ানিয়া হাইওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রলিবাস।

'লিওলিয়া, সীটে বসে বসে অমন পাক খাস নে!.. দ্যাখ্ রে কোস্তিয়া, এখানে আছে শার্ট, আর এই যে গরম জ্যাকেট, এই রইল রুমাল...'

'ঠিক আছে,' মুখ না ফিরিয়েই সাড়া দেয় কোস্তিয়া। 'আমরা কি একেবারে শেষে গিয়ে নামব, মা?'

'তা কেন? ট্রলিবাস বদলে ট্রামে চাপব, তারপর ঝুলন্ত ট্রেনে চড়ে নিচে নামব। তর্কাতর্কি করিস নে বাপু, অমনিতেই আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে!' মা বললেন, যদিও তর্কাতর্কির চিন্তা ঘুণাক্ষরেও কোস্তিয়ার মাথায় আসে নি।

লিওল্‌কা যখন সঙ্গ ধরে বসল তখন দেরি হওয়া আর বিচিত্র কী! — তাকে জামাকাপড় পরাও, তার মাথা আঁচড়ে দাও, মাথায় নানা কায়দার ফুল করে ফিতে বেঁধে দাও। ঐ ত মাথায় ফিতের কী বাহার! — যেন প্রপেলার।

বগী প্রায় খালি। কোস্তিয়া জানলার ধারে বসে, কিন্তু লিওল্‌কার ঐ জায়গাটাই চাই; এদিক ওদিক চারপাশে মাথা ঘোরাচ্ছে — নীপার নদী, নীচের চলন্ত বগী, তেলমাখা চকচকে, কালো মোটা তার — সবই সে চায় একসঙ্গে দেখতে। নীচে, মাটির দিকে তাকাতে তার ভয় লাগছে, আতঙ্কে সে কিঁউ-কিঁউ করছে, তবে অস্ফুটে, যাতে মা জানলার ধার থেকে তাকে সরিয়ে না নিয়ে যান।

বগীটা নীচ থেকে ওপরে উঠতে উঠতে তাদের সমান সারিতে চলে আসে, তারপর উঠতে থাকে ওপরে, দেখতে দেখতে হয়ে যায় একটা ছোট্ট খেলনার মতো। এদিকে মোটা তার যে চাকাগুলির ওপর দিয়ে চলে গেছে সেগুলিও আগাগোড়া তৈলচর্চিত, কালো, তখনও ঘুরছে ত ঘুরছেই, যেন ওটার নাগাল ধরার জন্য ছুটে চলেছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে।

নীচের দিকে তাকাতে সত্যি সত্যিই একটু ভয় ভয় লাগে। সোজা গড়ানে ঢালটার পাদদেশে নেমে গেছে ঝকঝকে রেললাইন, আর চারপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছ। তাদের মাথাগুলো বগী ছুঁই-ছুঁই, আর মাটির দিকে না তাকালে মনে হয় বগীটা যেন রেললাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলছে না, ভেসে চলেছে গাছপালার মাঝখানে বাতাসের ওপর দিয়ে এবং এই বুঝি দাড়িদড়া ছিঁড়ে নীচেকার স্টেশন আর পদোল্‌* তলাকার ঘরবাড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ে — শূন্যদেশ দিয়ে এমনই তুরন্ত ছুটে চলেছে নীপারের ওপর দিয়ে দূর নীল বনানীর দিকে।

কিন্তু দাড়িদড়া ছেঁড়ে না, বগী কোথাও ভেসে যায় না, মন্থরগতিতে এসে থেমে যায় সোপানশ্রেণীর ধারে। কোস্তিয়া, মা আর লিওল্‌কা তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ির ধাপ বয়ে ছুটতে থাকে, তারপর একটা কংক্রিট বাঁধানো গমগমে করিডর বয়ে গুমোট রাস্তা পেরোয় — অবশেষে স্টীমার-ঘাটা।

স্টেশনের কাঠের দালানের ওপারে শোনা যাচ্ছে গম্ভীর ভাঙা ভাঙা গর্জন। লিওল্‌কা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুহাতে কোস্তিয়াকে জড়িয়ে ধরে।

কোস্তিয়াও বিচলিত হতে শুরু করে। তার মনে হয় তারা যেন বড় আস্তে আস্তে চলছে, নির্ঘাত দেরি করে ফেলবে।

স্টীমার-স্টেশনের দালান পেরিয়ে সিঁড়ি বয়ে তারা নামতে থাকে জেটির দিকে — একটা প্রকাণ্ড গাধাবোটের দিকে, যার ওপর খাড়া হয়ে আছে বাড়ির মতো দেখতে একটা ইমারত। ঐ ইমারতটার আড়ালে স্টীমারটা একেবারেই চোখে পড়ে না — উঁচিয়ে আছে কেবল সামান্য লাল

---

* পদোল্‌ — কিয়েভ শহরের একটি অঞ্চল। — সম্পাঃ

পাড় দেওয়া একটা মোটা কালো চোঙা আর একটার পর আরেকটা বাতি ঝোলানো মাস্তুল। গাধাবোটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্টীমার। দুয়ের মাঝখানে জল আদৌ চোখে পড়ে না, লাফ দেবার পর্যন্ত কোন দরকার হয় না, নঙ্গরের জায়গা থেকে সোজা পা ফেলে স্টীমারে গিয়ে ওঠা যায়, তবে পথটা আটকানো আছে একটা মোটা কড়িকাঠ দিয়ে। রয়েছে কেবল গ্যাঙওয়েতে যাতায়াতের একটা সংকীর্ণ পথ — আড়াআড়ি সরু সরু তক্তায় আঁটা রেলিং-ঘেরা দুটো কাঠের টুকরো।

গ্যাঙওয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন নাবিক। কোস্তিয়া জানে যে ওরা নাবিক নয়, ওরা হল মাল্লা — নাবিক নদীতে হয় না, হয় সমুদ্রে ; কিন্তু তাহলে কী হবে, ওরা বিলকুল নাবিকের মতো ; ঝকঝকে বোতাম আঁটা আঁটোসাঁটো শার্ট গায়ে, মাথায় সাদা টুপি। তাদের টুপির ওপর শোভা পাচ্ছে 'কাঁকড়া' — সোনালি লতাপাতায় ঘেরা সোনালি নঙ্গর। মাল্লারা এমন নিশ্চিন্তমনে কথাবার্তা বলছে আর হাসাহাসি করছে যে নিজের তাড়াহুড়োর জন্য কোস্তিয়ার বড় যা-তা লাগছিল, তাই সে ইচ্ছে করে মন্থরগতিতে, হেলেদুলে পা ফেলে চলতে লাগল; ফলে মাকে ওর জামার আস্তিনে টান মারতে হয় :

'কোস্তিয়া, ঘুমিয়ে পড়িস নে রে বাবা ! আচ্ছা, ক্যাপ্টেনকে কোথায় পাব বলতে পারেন ?' সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করেন মাল্লাদের।

'ক্যাপ্টেন এখন নেই,' ওদের মধ্যে যে লোকটি স্টীমারের করিডরে কোন একটা ঘটনার ওপর নজর রাখছিল, সে জবাব দিল।

'তাহলে উপায় ? এখন তাহলে কী হবে ?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

দ্বিতীয়জন তাকিয়ে তাকিয়ে মাকে দেখে, তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কোস্তিয়া জানে যে তার মা সুন্দরী, সে নিজেও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসে — অবশ্য যখন মা রাগ করেন এবং কোন কিছুর জন্য বকাঝকা দেন তখন নয়। কিন্তু লেফটেনাণ্টের কাঁধপটি আঁটা এবং ফিওদরের মতোই ফেকাসে চুলওয়ালা এই অল্পবয়সী মাল্লাটি যেন বড় বেশিক্ষণ ধরে তাকাচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। ব্যাপারটা কোস্তিয়ার ভালো লাগল না, সে ভুরু কোঁচকাল।

'কী ব্যাপার বলুন ত ?' ফেকাসে-চুল লেফটেনাণ্টটি জিজ্ঞেস করল।

'ভাই আমাকে লিখেছিল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে, কিন্তু উনি নেই... এখন তাহলে উপায় ? ওর কোন অ্যাসিস্টেণ্ট যদি থাকেন...'

'সিনিয়র মেট ব্যস্ত। আমি সেকেণ্ড মেট। বলুন না আপনি, কী ব্যাপার।'

মা থতমত খেয়ে অসংলগ্নভাবে লোকটাকে বুঝিয়ে বললেন যে তাঁর ভাই পলিয়ানস্কায়া গ্রেব্লিয়াতে নদীর বয়া-তদারককারী — ছেলেকে তিনি ভাইয়ের কাছে পাঠাচ্ছেন। ওখানে ভাই ওকে নিতে আসবে। কিন্তু ছেলেকে একা ছাড়তে তাঁর ভয়, ওখানে আবার জেটিও নেই; অথচ

তাঁর বেগতিক অবস্থা, তাঁকে জরুরী কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে, তিনি ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ক্যাপ্টেনের দেখা মিলল না।

লেফটেনাণ্ট অনেক আগেই সব বুঝতে পেরেছে, কিন্তু মা বলছেন ত বলছেনই। এদিকে লোকটাও তাঁর কথায় বাধা দিচ্ছে না — আসলে মা'র দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে, মা'র কথাগুলো শুনতে তার বেশ লাগছে। এটা লক্ষ করে কোস্তিয়া আরও বেশি বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

'বুঝলাম,' অবশেষে লেফটেনাণ্ট বলল। 'তা আপনার ছেলেটি কোথায় ? এই রাগী বন্ধুটি নাকি ? আমি ত ভেবেছিলাম বুঝি ভাই। দস্তুরমতো সাবালক পুরুষমানুষ !'

এই স্থূল চাটুবাক্যে কোস্তিয়া ভোলার পাত্র নয়, সে আগের মতোই ভুরু কুঁচকে থাকে।

'কোন চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে। অটুট ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পেঁাছে দেব। তাছাড়া এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ কিচেয়েভ্‌কে আমি চিনি — চিনব না ? — বয়ার সেরা তদারককারী যে ! আপনার ছেলে দিব্যি পেঁাছে যাবে, ঘুমের কোন অসুবিধে হবে না, আর ওখানে পেঁাছুতে পেঁাছুতে পথেই আমরা ওকে মাল্লা বানিয়ে ফেলব... আসুন, আসুন, ছেলেকে গোছগাছ করে দিয়ে যান — এখনও অনেক সময় আছে। এক্ষুনি আমি ডেকে আনছি কণ্ডাক্টরকে !'

মুখ গোমড়া করে কোস্তিয়া গ্যাঙওয়েতে পা ফেলে, তার পেছন পেছন লিওল্‌কার হাত ধরে চলেন মা।

'পাশা-মাসী !' লেফটেনাণ্ট চেঁচিয়ে বলল, 'যাত্রীকে কেবিনে নিয়ে যাও।'

করিডরের কোথা থেকে যেন আবির্ভাব ঘটল এক লম্বা, রোগা মহিলার। তার নাকটা লম্বা, সরু আর ঠোঁটজোড়া চাপা। এত বেশি চাপা যে কোস্তিয়ার মনে হল যেন সে ঠোঁট না খুলেই কথা বলছে।

পাশা-মাসী করিডরের ওপর কয়েক পা ফেলে এগিয়ে এসে বাঁদিকে ঘুরে গিয়ে হঠাৎ যেন ধপ করে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

'হা ভগবান, এ কী সিঁড়ি !' মা আঁতকে উঠে বললেন।

'সিঁড়ি নয় মা, এটা হল ল্যাডার,' কোস্তিয়া বলল।

'হুঁঃ, তুই সবই জানিস, নামজাদা নাবিক... দেখিস, ধাক্কা খাস নে !'

কবে ধাক্কা খেয়েছে শুনি ? কোস্তিয়া ওদের আগে আগে যেতে দেয়, তারপর বাহাদুরী করে নাবিকের ভঙ্গিতে তড়তড় করে নীচে নামতে থাকে। কিন্তু ল্যাডারটা এত খাড়া, ধাপগুলো এমন গায়ে গায়ে লাগানো আর তাদের গায়ে লোহার চৌকাটগুলোও এত পিছল যে সে ডিগবাজী খেয়ে ছিটকে পড়ে যায় আর কি, ফলে সামলানোর জন্য পাশের হাতল চেপে ধরতে হয়। সন্দেহজনক আওয়াজ শুনে মা ঘুরে দাঁড়ান, কিন্তু কোস্তিয়া ততক্ষণে টাল সামলে নিয়ে ধীরেসুস্থে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপের ওপর পা ফেলে।

'এই যে কেবিন,' ঠোঁটজোড়া আলগা না করেই বলল পাশা-মাসী, 'ব্যবস্থা করে নিন,' এই বলে সে চলে গেল।

কেবিনটা ছোট — এখানে মোটে দুটো বাঙ্ক, দরজার কাছাকাছি আলমারি, আর বাঙ্কদুটোর মাঝখানে একটা ছোট সরু টেবিল। সত্যি বলতে গেলে কি বাঙ্ক একটাই, অন্যটি হল বাঙ্কের বদলে অয়েলক্লথ মোড়া তক্তপোশ। তবে হ্যাঁ, টেবিলের মাথার ওপর, প্রায় ছাদের কাছাকাছি জায়গায় আছে সত্যিকারের পোর্টহোল — গোলাকার ছোট্ট একটি জানলা পেতলের উইং-নাট্ দিয়ে স্টীমারের গায়ে আঁটা। কোস্তিয়া তৎক্ষণাৎ টেবিলে উঠে উইং-নাটের প্যাঁচ খুলতে লেগে গেল।

'খবরদার কোস্তিয়া! শুনছিস? মোট কথা — হয় তুই আমাকে কথা দিবি যে জানলা খুলবি না, নয়ত আমরা এক্ষুনি পাড়ে চলে যাব, কোথাও যাওয়া চলবে না তোর!'

কোস্তিয়া টেবিল থেকে নেমে পড়ে: যাক গে, এখন অমনিতেও পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে গাধাবোটের আলকাতরা-মাখা গাটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

লিওল্কা কেবিনে ঘুরঘুর করে বেড়ায়, টেবিল, বাঙ্ক, কর্কের লাইফবেল্ট হাতড়ে হাতড়ে দেখে, মা ততক্ষণে ফের পরামর্শ দিতে থাকেন: আমি যেন মামার কথা শুনি, ভগবান রক্ষা করুন, বড়দের সঙ্গে ছাড়া যেন স্নান করতে না যাই, ছোট ছেলেপুলেদের মতো সঙ্গে সঙ্গে যেন মিষ্টি পেস্ট্রি খেতে লেগে না যাই, প্রথমে খেতে হবে সিদ্ধ মাংস আর পুরো সিদ্ধ করা ডিম, তারপর মিষ্টি; স্টীমার জুড়ে যেন ছুটোছুটি করে না বেড়াই, কিনারায় যেন না যাই, আর জলের দিকে যেন না তাকাই, তাহলে মাথা ঘুরতে থাকবে — এক কথায়, এক্ষেত্রে মায়েরা সচরাচর যা বলে থাকেন তিনি তা-ই বললেন, আর তার ফলে কোস্তিয়ার অসহ্য রকমের বেজার লাগছিল।

পাশা-মাসীর মতো কোস্তিয়াও ঠোঁট না খুলে কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু মা তাতে ঘাবড়ে যান:

'তুই অমন চেপে চেপে কথা বলছিস কেন? তোর কি দাঁত ব্যথা করছে?'

কোস্তিয়াও ঘাবড়ে যায় — এর জন্য মা তাকে বাড়িতে না রেখে দেন! — সে তাই পাশা-মাসীর অনুকরণ না করে আর দশটা লোকের মতো স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে থাকে।

দেখা যাচ্ছে সময় বাস্তবিকই অঢেল। বিদায়ের পালা চুকে যাবার পর, যখন যা যা করার এবং বলার শেষ হয়ে গেছে, অপেক্ষা করতে হচ্ছে কেবল সত্যিকারের ছাড়াছাড়ির তখন, মাঝখানের এই সময়টিতে যে যন্ত্রণাদায়ক অনিশ্চয়তার ভাব মনে জাগে, কোস্তিয়াকে তা ভোগ করতে হচ্ছে। মা এখনও কোস্তিয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন সব বলে চলেছেন। তাঁর খয়েরী রঙের বড় বড় চোখদুটি হয়ে উঠছে কেমন যেন আকুল আর করুণ। লিওল্কাও শান্ত হয়ে এসেছে, যেমন ভাবে ফোঁস ফোঁস করছে তাতে মনে সন্দেহ জাগে — তার মানে এখুনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করবে। এসবের ফলে কোস্তিয়া এমন অস্থির হয়ে পড়ে যে তার নিজেরই তখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা, ঠিক এমন সময় ডেকের ওপরে ফের গম্ভীর ও ভাঙা ভাঙা গর্জন করে উঠল স্টীমারের

ভেঁপ; লিওল্কা ঝাঁপিয়ে পড়ল মা'র কোলে, মা'র টনক নড়ে : এবার তাদের যেতে হয়। তারা বেরিয়ে আসে সরু প্যাসেজটায়। গ্যাঙওয়ের ওপর দিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটছে দেরি-করে-আসা যাত্রীরা, তারা পোঁটলা-পুঁটলি আর ঝুড়ি দিয়ে ওদের গায়ে ধাক্কা মারছে, কিন্তু মা কিছুই নজরে আনছেন না। উনি ফের ব্যাকুল ও করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন কোস্তিয়ার দিকে, তারপর কোস্তিয়াকে কয়েকবার গাঢ় চুমু দিয়ে তড়বড় করে আবার বলেন :

'দেখিস কোস্তিয়া, বুদ্ধিমানের মতো চলিস কিন্তু। আর হ্যাঁ, আজেবাজে কাণ্ডকারখানা বাধাস নে বাবা!..'

লিওল্কাও মুখ বাড়িয়ে দেয় চুমো খাবার জন্য। কোস্তিয়া মা'র অলক্ষে ঝটকা মেরে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মা তা লক্ষ করে বলেন :

'কোস্তিয়া, তোর লজ্জা করে না! ছিঃ, কী অসভ্য ছেলে তুই! বোনকে চুমো খা বলছি!'

কোস্তিয়া কিন্তু মোটেই অসভ্য নয়, আসল কথা হল এই সব আদর-টাদর সে একেবারে সহ্য করতে পারে না। তবে এখন কিছু করার নেই। কোস্তিয়া বাধ্য হয়ে ঝুঁকে পড়ে গাল বাড়িয়ে দেয়। কাণ্ডটা দেখ না! বাড়ি থেকে বেরোনোমাত্রই লিওল্কা আবদার করে আইসক্রীম আদায় করে নিয়েছে, এখন তার মুখ আর হাত চটচট করছে চিটে গুড়ের মতো। মোটের ওপর, এই চুমোর ব্যাপারটা যে কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল!

মা আর লিওল্কা জেটিতে নেমে গিয়ে রেলিং-এর ধারে দাঁড়ায়। কোস্তিয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল আরেকটু সামনে এগিয়ে যাবার, কিন্তু লোকে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল:

'এই খোকা, ওখানে যায় না, আমরা এখুনই নঙর তুলব!'

কোস্তিয়া অনেক আগেই দেখে রেখেছিল যে ওপরতলায় ল্যাডার উঠে গেছে আর ল্যাডার যাবার হ্যাচওয়ের ভেতর দিয়ে উঁকি মারছে নীল আকাশ। সে ল্যাডার বয়ে ওপরের ডেক-এ গিয়ে উঠল।

ডেক-এর মাঝখানে, উঁচু কালো চিমনির সামনে — কাচ লাগানো গুমটি, সেখানে দেখা যাচ্ছে চালানোর চাকা — স্টীয়ারিং হুইল। ডেক-এর দুপাশে, কিনারা ঘেঁষে — কাচের গুমটি, খানিকটা ছোট, সেখানে ঝকঝক করছে মাজাঘষা পেতলের চোঙ। 'টেলিফোন বুথ' — আন্দাজ করল কোস্তিয়া। তার মানে সে আছে ক্যাপ্টেনের মঞ্চে। এখান থেকে ওকে তাড়িয়ে দেবে না ত? না তা ত মনে হচ্ছে না। সামনের গলুইয়ে আর পাছগলুইয়ে আছে কাঠের বেঞ্চি, বাগানে যেমন দেখা যায়; এমনকি ছোট ছোট টেবিলও আছে, ডেক ত নয়, যেন জলখাবারের দোকান। বেঞ্চিগুলোতে বসে আছে যাত্রীরা, কেউ তাদের তাড়াচ্ছে না। তার মানে এটা হল সেই ধরনের স্টীমার যেখানে একই জায়গায় থাকে ক্যাপ্টেনের মঞ্চ আর ডেক।

ডেক-এর চারপাশে ঘিরে চলে গেছে দুটি লোহার রড দেয়া রেলিং। কোস্তিয়া রেলিং-এর ধারে এগিয়ে গিয়ে রেলিং ধরে নাবিকের ভঙ্গিতে দু'পা বেশ ফাঁক করে দাঁড়ায়। ওঃ ক্লাস ফাইভের

'বি' সেকশনের সবাই, কিংবা অন্ততপক্ষে লড়াকু বন্ধু ফিওদরও যদি দেখতে পেত কোস্তিয়া কেমন দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেনের মঞ্চে! ঠিক ব্রিজে অবশ্য নয় — ডেক-এ, কিন্তু তাহলে কী হবে, মঞ্চ ত আর তেমন একটা দূরে নয়!

কিন্তু ফাইভ 'বি'-এর কেউ নেই, বন্ধু ফিওদরও নেই। নীচে, জেটিতে দাঁড়িয়ে আছেন মা, বড় বড় আকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোস্তিয়াকে। লিওল্‌কা ওকে প্রথমে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে :

'ঐ যে, ঐ ত ও! ঐ যে!'

মাও চোখের দৃষ্টিতে ওকে খুঁজে পান, হাসেন, চেঁচিয়ে কী যেন বলতে চান, কিন্তু ঠিক সেই সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে ওঠে, জলের ছাঁট এসে কোস্তিয়ার গায়ে লাগে, আর তার পেছন থেকে তিনগুণ কান ফাটানো গর্জন হতে থাকে। জেটির ওপরকার লোকজন কী যেন বলছে বা চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ঐ গর্জনের জন্য কিছুই শোনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে তারা যেন মাছের মতো নিঃশব্দে খাবি খাচ্ছে।

'সামনে চল!'

নির্দেশ দেয় ফেকাসে-চুল সেকেণ্ড মেট। সে বাঁদিকের কাচের গুমটিটার ভেতরে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে সকেট-পাইপে কী যেন বলল, তারপর সকেটটা চেন-দেয়া-ছিপি এঁটে রেখে দিল।

ডেক, রেলিং-এর লোহার রড অল্প অল্প কাঁপতে থাকে। নীচের ডেক-এ, কোস্তিয়ার একেবারে পায়ের নীচে লোহার থাম থেকে কাছির পাক খোলা হচ্ছে; কাছিটা সরসর করে ঝুলে পড়তে তার ফাঁস লাগানো অন্য প্রান্তটি জেটির থাম থেকে খুলে ঝপাং করে ফেলে দেওয়া হল জলে। স্টীমার আর জেটির মাঝখানে জলের যে সংকীর্ণ ব্যবধানটা ছিল সেটা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ইস্‌! কত কিছুই না দেখা দরকার — কিন্তু উপায় নেই: রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কোস্তিয়ার দিকে, তার মানে কোনমতে জায়গা ছেড়ে যাবার উপায় নেই। কোস্তিয়ার ইচ্ছে নয় মা'র মনে দুঃখ দেয়। ঐ যে হাসছেন, এদিকে দু'গাল বয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল, আঙুলের ডগা দিয়ে মুছছেন সেই জল।

কাঁদার কী আছে শুনি? সে কি এক বছরের জন্য বিশ্বভ্রমণে বেড়িয়েছে নাকি? তা বললে কী হবে, কোস্তিয়ার মনটা কেমন যেন দমে যায়। এর আগে কিন্তু তাদের কখনও ছাড়াছাড়ি হয় নি। আগে কোস্তিয়া গিয়েছিল কেবল রেলগাড়িতে, তাও মা'র সঙ্গে, আর তখন সে ছিল নেহাৎই ছোট, এত ছোট যে সেই সফরের কথা তার এখন তত ভালো মনেও নেই। কোস্তিয়া দারুণ কপাল কোঁচকায়, যাতে একেবারে ভেঙে না পড়তে হয়, আরও জোরে ডেক-এর রেলিং চেপে ধরে, লিওল্‌কার হাত নাড়ানোর দিকে নজর দেয় না। কোস্তিয়াকে ডেক-এ দেখামাত্রই লিওল্‌কা হাত নাড়তে থাকে, আর তারপর থেকে অনবরত নাড়িয়েই চলেছে, কিন্তু কোস্তিয়া সাড়া দিচ্ছে না দেখে সে মাটিতে পা ঠুকতে থাকে, আহতস্বরে চেঁচিয়ে বলে :

'কোস্তিয়া ! এই কোস্তিয়া !'

মাও হাত তোলেন, রুমাল নাড়েন।

স্টীমারের গলুইটা জেটি থেকে আলাদা হয়ে পড়ে, জেটি ভেসে চলে বাঁয়ে, পেছন দিকে, লোকজন ক্রমেই ছোট হতে থাকে, এখন মনে হচ্ছে মা আর লিওল্‌কা নয়, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মেয়ে — একটি বড়, আরেকটি একেবারে ছোট। কোস্তিয়া যতক্ষণ তাদের মূর্তিদুটো আলাদা করে চিনতে পারে ততক্ষণ হাত নেড়ে সাড়া দেয়, তারপর হাত নামায়। এখন হয়ত ওরা উঁচু টিলাটার ওপরে গিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখবে স্টীমারটাকে, যাতে চেপে কোস্তিয়া পাড়ি দিচ্ছে।

'আশখাবাদ'

স্টীমার নাক বাড়িয়ে মোড় নিয়ে চলল স্রোত বরাবর, তারপর কেন জানি ফের ভোঁ বাজিয়ে ভ্লাদিমির-টিলা, স্নানের ঘাটের পুল আর ত্রুখানভ দ্বীপের পাশ দিয়ে তরতর করে ছুটল। দ্বীপটা জলের একেবারে কিনারা অবধি প্লাইউডের ছাউনিতে ও দোকানপাটে ছেয়ে গেছে, এদিকে সত্যিকারের সবুজ গাছপালা তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে তীরভূমিকে ফেলে রেখেছে নির্মম সূর্যতাপের দয়ার উপর।

সাদা ফেনার 'গোঁফজোড়া' বাগিয়ে স্টীমারের মুখোমুখি ছুটে আসছে একটা গিলসার বোট। বোটে যে লোকগুলি বসে ছিল ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাদের বিদায় দেবার পর কোস্তিয়া স্টীমারের বিশদ পরিচয় নিতে শুরু করল।

ডেক-এর ঠিক কিনারায়, কাচের গুমটিদুটোর সামনে, ডাইনে ও বাঁয়ে ক্যানভাসের কাপড়ে ঢাকা আছে লাইফবোট। প্রত্যেকটার গলুইয়ের গায়ে লেখা আছে 'আশখাবাদ'। কেবল একটা লাইফবোটের গায়ে কেন যেন 'দ' লেপাপোঁছা, আর তার ফলে দাঁড়াচ্ছে স্রেফ 'আশখাবা'। গুমটিদুটোর দেয়ালের কাছে সার বেঁধে রাখা আছে সাদা রঙের খালি বালতি। প্রতিটি বালতির গায়ে নীল রঙে আঁকা আছে কেবল একটি করে অক্ষর, কিন্তু বালতিগুলো এমন ভাবে দাঁড় করানো যে এখানেও সব অক্ষর মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে স্টীমারের নাম — 'আশখাবাদ'। রেলিং-এর গায়ে ঝোলানো লাইফবয়গুলির ওপর এবং স্টীমারের চাকার ঢাকনার ওপরও লেখা আছে ঐ একই শব্দ। ডেকটা একেবারে সত্যিকারের — কাঠের, সরু সরু লম্বা লম্বা তক্তা দেওয়া, তক্তাগুলির মাঝখানের ফাঁক ফেঁসো দিয়ে আটকানো, আলকাতরা দিয়ে ভরাট করা।

কোস্তিয়া গুনতে শুরু করল ডেক-এর ওপর আড়াআড়ি কতগুলো তক্তা পাতা আছে, কিন্তু এমন সময় মাস্তুলটা হঠাৎই পেছনে হেলতে থাকে, হেলতে হেলতে প্রায় সমান্তরাল রেখায় চলে

আসে: 'আশখাবাদ' একটা সেতুর কাছাকাছি এসে গেছে, সেতুর গায়ে যাতে বেধে না যায় সেইজন্য মাস্তুল নীচু করা হচ্ছে।

স্টীমারটা গুরুগম্ভীর ভেঁপু বাজায়। এবারে কোস্তিয়া দেখতে পেল যে ভেঁপুটা আসলে অর্ধবৃত্তাকার দুটি ফুটোওয়ালা পেতলের বাঁশি — স্টীমারের চোঙের পেছনে শক্ত করে আঁটা। ওখান থেকে প্রথমে ভকভক করে বেরিয়ে আসে জলের কণা, বাষ্প, আর তারপরই শুরু হয়ে যায় খাদের সুরের গুঞ্জন।

'আশখাবাদ' চলেছে প্রায় বাঁ তীর ঘেঁষে, পথচারি চলাচলের সেতুর নীচের দুটো থামের মাঝখান দিয়ে। ওপরে যে-সমস্ত গাড়ি আর বাস ছুটে চলছে সেতুর তক্তার ফাঁক দিয়ে কোস্তিয়া সেগুলি দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু সেখানে কাঠের গুঁড়ি ও কড়িকাঠের জড়ানো গাঁথুনি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। থামের একেবারে ওপরে একের পর এক ঝুলছে বাতি, সেগুলির দিকে জল থেকে সোজাসুজি উঠে গেছে ধরে ধরে ওপরে ওঠার শিক — এগুলি হল সিঁড়ি। কোস্তিয়া আঁচ করতে থাকে ওখানে ওঠা সোজা কিনা, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসে যে ফিওদর অবশ্যই উঠতে পারবে, কোস্তিয়াও পারবে — যদিও জায়গাটা উঁচু এবং খানিকটা ভয়েরও। অবশ্য বিশেষ কিছু নয়।

পেছনে পড়ে থাকছে দক্ষিণ তীরের ঝোপঝাড়ে ঢাকা ঢাল, বড় মঠের আকাশছোঁয়া ঘণ্টাচূড়া, রেলসেতু। তীরভূমি পশ্চাদপসরণ করছে, যেন উবু হয়ে বসে পড়ে ঘন সবুজ ছোট ছোট উইলো ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে। ডেক-এর ওপর সামান্য কিছু সংখ্যক যাত্রী বাতাসের দিকে পিঠ রেখে চোঙটার আড়ালে, পাছগলুইয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে — সেখানে মেশিনঘরের হ্যাচওয়ে থেকে বেরিয়ে আসছে তেতে ওঠা তেলের গন্ধমাখা ঈষদুষ্ণ হাওয়া।

হ্যাচওয়ের ভেতর দিয়ে উঁকি মারলে সেখানে দেখা যাবে কলকব্জা, খয়েরী রঙের মোটা মোটা পট্টি দিয়ে জড়ানো পাইপ, যেন গায়ে সেঁক লাগানো হয়েছে; আর আছে ঝকঝকে কতকগুলি হাতল, সেগুলি কনুইয়ের মতো সামনে-পিছনে নড়ছে। একটা পাইপের ওপর শুকোতে দেওয়া হয়েছে নাবিকের ডোরাকাটা ভেস্ট, আরেকটার ওপর — কালো প্যাণ্টলুন।

মেশিনঘরটা আরও ভালো করে দেখার উদ্দেশ্যে কোস্তিয়া নীচে নামে। এখানে ডেকটা লোহার, গোটা মেঝেতে বিঁধানো আছে উঁচু উঁচু ডুমো, যাতে পা পিছলে না যায়। কিন্তু জুতো আর হাইবুটের ঘষায় এখানকার লোহায় এত পালিশ পড়েছে যে ডুমোগুলো তেমন একটা কাজে আসে না, জায়গাটা অমনিতেই পিছল। মেশিনঘরে নামার ল্যাডার দেখতে পেয়ে কোস্তিয়া যেই লোহার উঁচু চৌকাটের ওপারে পা বাড়িয়েছে অমনি কে যেন চেঁচিয়ে বলল:

'তুই এখানে কী করছিস? ওখানে যাওয়া নিষেধ!'

কোস্তিয়া ঘুরে গিয়ে চলে গেল পাছগলুইয়ের বড় হলঘরটায়। এখানে যাত্রী কম, তারা আলাদা আলাদা ছড়িয়ে ছিটিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। কেবল মাসী-মাসী চেহারার তিনজন মহিলা

দু'পায়ের মাঝখানে ঝুড়ি আর বস্তা চেপে ধরে রেখে একে অন্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে চতুর্থ আরেক জনের কথায় সায় দিয়ে ঘন ঘন মাথা নেড়ে চলছে। চতুর্থ জন অনুচ্চস্বরে, উত্তেজিতভাবে কিসের যেন বৃত্তান্ত দিচ্ছে। কোস্তিয়া ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল — এমন ভাব ক'রে যেন আচম্‌কা এসে পড়েছে — তার মনে হচ্ছিল এখানে মজার কিছু শোনা গেলেও যেতে পারে।

'এসে দেখি — কী দেখলাম জানেন ?' কথক মহিলাটি করুণস্বরে বলছিল। 'দেখি যে আমার বকনা-বাছুরটাকে দানাপানি দেওয়া হয় নি !'

বোঝা গেল ব্যাপারটা। বকনা-বাছুরে কোস্তিয়ার কোন আগ্রহ নেই।

খানিকটা দূরে, জানলার ধারে বসে আছেন এক মহিলা, মুখে তাঁর ক্লান্তির ছাপ। তাঁর আশেপাশে আর শক্ত সোফাটার নীচে গোছগাছ করে রাখা আছে পোঁটলাপুঁটলি, বস্তা, বড় বড় ঝোলানো তালালাগানো কাঠের বাক্স। ডান দিকের বড় পুঁটলির গায়ে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে বছর চৌদ্দ বয়সের একটি মেয়ে। গরমে আর ক্লান্তিতে অবসন্ন মহিলাটি থেকে থেকে ঐ পুঁটলিটার ওপর ঢলে পড়ছেন। বয়সে আরও ছোট আরেকটি মেয়ে, তার কপালের ওপর এসে পড়েছে শণ রঙের ছোট ছোট কোঁকড়া চুল, হলঘরটার মধ্যে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। মেয়েটা খানিক পরে পা রেখে সোফার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পিছুপানে ছুটন্ত, গড়ানে সবুজ তীরভূমি দেখতে থাকে। মনে হয় ওরও ঘুম পেয়েছে — মনের সুখে মস্ত হাই তুলছে।

'দেখিস, মুখের ভেতরে কিছু ঢুকে না যায় !' বলতে বলতে কোস্তিয়াও সোফায় উঠে পড়ে তারই পাশে। 'ভালো ঘুম হয় নি নাকি ?'

'হুঁ। আমরা চলছি ত চলছিই, কিছুতেই ভালোমতো ঘুমোতে পারছি না।'

'তা কী করে হয়, স্টীমার যে সবে ছাড়ল।'

'আমরা এসেছি আরও দূর থেকে। আসছি সাখালিন থেকে। তিন হপ্তা হয়ে গেল।'

'সাখালিন থেকে ?' কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল, সন্দেহ মেশানো, লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মেয়েটিকে।

মেয়েটির সঙ্গে সে কথা বলতে এসেছিল নেহাৎই একঘেয়ে লাগছিল বলে — নইলে কোথাকার কোন্ একটা মেয়ে ! ভারি আমার সঙ্গী ! কিন্তু এখন মেয়েটাকে তার মনে হল অসাধারণ, এমন কি বহু ধোপের ফলে তার ছিটের ফ্রকটার ওপরকার রঙজ্বলা ছোট ছোট ফুলগুলিও কোস্তিয়ার মনে হচ্ছে আশ্চর্যের।

'মিথ্যে কথা বলছিস, না ?'

'ও মা, মিথ্যে বলতে যাব কেন ?' মেয়েটি নির্বিকার কণ্ঠে বলল। 'ঐ ত, মাকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না।'

কোস্তিয়া ক্লান্ত চেহারার মহিলাটির দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু মহিলা ততক্ষণে পোঁটলার ওপরে সম্পূর্ণ ঢুলে পড়েছেন, দিব্যি ঘুম দিচ্ছেন।

‘সেখানে তোমরা কী করতে?’

‘কী আবার করতাম? — থাকতাম। বাবা মাছের কারখানায় কাজ করতেন — সেখানেই আমরা থাকতাম কারখানার মহল্লায়।’

‘তুই সাগর দেখেছিস? — ঐ যে যাকে বলে মহাসাগর — প্রশান্ত মহাসাগর?’

‘তা আর বলতে? আমরা যে ওর পাড়েই থাকতাম!’

‘আর স্টীমারে চেপে সমুদ্রে ঘুরেছিস?’

‘নয় ত কী! তা নইলে সাখালিনে পেঁছুনোই যাবে না। অবশ্য এরোপ্লেনেও যাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের যে অনেক মালপত্তর।’

মেয়েটি কথা বলে শান্ত ও নির্বিকার ভঙ্গিতে, এদিকে কোস্তিয়া মনে মনে অনুভব করতে থাকে ঈর্ষা আর পরম কৌতূহল। সে বুঝে উঠতে পারে না লোকে কী করে উদাসীনভাবে এই কথাগুলি বলে যেতে পারে। ওঃ সে যদি সাখালিনে যেতে পারত, থাকতে পারত সাগরের তীরে!.. সব বিষয় সম্পর্কে একসঙ্গে সবকিছু জানতে তার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু মেয়েটা আগের মতোই নীরস আর একঘেয়ে জবাব দিচ্ছে।

‘এঃ তুই কী রে!’ ভর্ৎসনার সুরে বলল কোস্তিয়া। ‘এমন ঝিম-মারা কেন রে তুই? এত কিছু দেখেছিস, অথচ বলতে পারিস না!’

‘ঘুম পেয়েছে যে! পেঁছুনোর পর ভালো করে ঘুমবো, ঘুমানোর পর...’

‘তোমরা কোথায় যাচ্ছ?’

‘এখন যাচ্ছি দিদিমার কাছে, চেরকাসিতে, তারপর কাখোভ্কায়।’

‘কাখোভ্কায়?’ কোস্তিয়ার কৌতূহল ও ঈর্ষা আরও উদগ্র হয়ে উঠল। ‘কাখোভ্কায় কেন?’

‘বাবা ওখানে বাড়িঘর তৈরির কাজ নিতে চান।’

‘আর তুই?’

‘আমি? আমি আবার কী করব? পড়াশুনা করব। বাবার ইচ্ছে ছিল আরও আগে যান, কিন্তু পরে ঠিক করলেন আমার আর সোনিয়ার ক্লাস শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করবেন। শেষ হতেই আমরাও চললাম।’

‘তোর বাবা তাহলে কোথায়?’

‘খাবার ঘরে। অনেকক্ষণ হল ওখানে গেছেন। হয়ত বীয়ার খাচ্ছেন।’

‘চল্, দেখাবি তোর বাবাকে।’

‘কিন্তু ওখান থেকে যদি তাড়িয়ে দেয়?’

‘আরে না না, তাড়াবে না কেউ।’

লোহা বাঁধানো ডেক-এর ওপর দিয়ে ফাঁপা ফাঁপা ঠকঠক আওয়াজ তুলে তারা চলে গেল

সামনের দিকের একটা ঘরে — এটা হল খাবার ঘর। বার-স্ট্যান্ডের মুখোমুখি চারকোনা টেবিলের ধারে বসে আছে তিনজন লোক: একজন মোটাসোটা, তার মাথায় টাক, চোখে চশমা, আরেকজন শ্যামবর্ণ যুবক, অন্যজন এক রোগাটে পুরুষ — তার মুখটা রোদে পোড়া, যেন ঝলসে গেছে, গায়ে জার্সি, প্যাণ্টের ভেতরে গোঁজা। তাদের সামনে বীয়ারভর্তি পাত্র, পাত্রের ওপরে বুদ্বুদ তুলছে বীয়ারের উচ্ছলিত তুষারশুভ্র ফেনা।

'কী রে, আমাকে ডাকতে এলি নাকি? ভালো লাগছে না বুঝি?' জার্সি-গায়ে পুরুষটি বলল। 'এক্ষুনি যাচ্ছি!'

বীয়ারেরই মতো হালকা রঙের গোঁফজোড়া সে ফেনার ভেতরে ডুবিয়ে দিল, পরে পাত্রটা সরিয়ে রেখে দিয়ে গোঁফ মুছে আলাপের সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল:

'আমি নিজে ত ওখানকার, ঐ আলিওর্শাকিরই লোক। আমার জন্মভূমিতে যখন এমন সব ব্যাপার-স্যাপার শুরু হয়ে গেছে তখন কী বলে আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকি? এবারে কিন্তু আমরা আমাদের দেশকে গড়ে তুলবই!' এই বলে সে টেবিলের ওপর এমন এক ঘুষি মেরে বসল যে বীয়ারের পাত্রগুলি সামান্য লাফিয়ে উঠল; তারপর এক ঢোকে বাকি বীয়ারটুকু পান করে সে উঠে দাঁড়াল। মাত্র এখনই চোখে পড়ল লোকটা বিরাট আর বেশ শক্তসমর্থ চেহারার। 'চল্ রে নাস্তিয়া!'

সাখালিনবাসীরা চলে গেল। যুবকটি বীয়ার পান করে চলল আর মোটাসোটা পুরুষটি টাক মুছতে মুছতে ওদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে বলল:

'বোঝ ব্যাপার — একটা লোক কিনা বারো হাজার ভার্স্ট দূর থেকে ছুটে চলল!'

'তা নইলে কী করে হবে?' যুবকটি বলল। 'আমার পড়াশোনা শেষ হলে আমিও যাব।'

ওরা দু'জনে চুপ করে গেল।

কোস্তিয়া অপেক্ষা করতে লাগল এর পর আর কী কথাবার্তা হয়, কিন্তু টাকমাথা ততক্ষণে উঠে চলে গেল, এদিকে যুবক একটা বইয়ের ভেতরে ডুবে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে কোস্তিয়া আবার গেল পাছগলুইয়ের হলঘরটার দিকে, যেখানে ঠাঁই নিয়েছে সাখালিনবাসীরা। দেখা গেল নাস্তিয়া ইতিমধ্যে মা'র কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে; সরু সোফার ওপর দীর্ঘ শরীরটা টানটান করে দিয়ে ওর বাবাও ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোচ্ছে না কেবল নাস্তিয়ার দিদি — সে জিনিসপত্র পাহারা দিচ্ছে। কোস্তিয়া তার সঙ্গে কথা বলার মতলব করল, কিন্তু মেয়েটি সতর্ক হয়ে ঈষৎ ফোলা ফোলা চোখের পাতা পিটপিট করতে করতে আড়চোখে তার দিকে তাকাল, চুপ করে রইল। জীবনে কত অন্যায়-অবিচারই না দেখা যায়! — কোস্তিয়া মনে মনে ভাবে! — এই দেখ না কেন, একটা অপদার্থ ঘুমকাতুরে চলেছে কাখোভ্কায় আর তার কিনা ওখানে যাবার উপায় নেই!...

যাই হোক, এখানে কিছু করার নেই, তাই কোস্তিয়া আবার চলে গেল খাবার ঘরে। সেখানে

বহু বড় জানলা, জানলাগুলো দিয়ে সামনের দিকে আর দুপাশের সব দেখা যায়, আর দরজাটার মুখ সামনের গলুইয়ের দিকে, যেখানে একটা ড্রামে জড়ানো রয়েছে নঙ্গরের শেকল আর খাড়া হয়ে আছে কিসের যেন কতকগুলো হাতল। কোস্তিয়া দরজা খুলে সেখানে বেরিয়ে এলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে তাড়া করল একটা বজ্র হুঙ্কার:

'সামনের গলুইয়ের যাবে না খোকা! দেখতে পাচ্ছ না দরজার ওপর কী লেখা আছে!'

সে কিছুই করতে যাচ্ছিল না, কেবল ইচ্ছে ছিল নঙ্গরটা দেখে আর দেখে স্টীমারের মুখ থেকে ছুটন্ত ঢেউয়ের খেলা। না, এখানেও যদি সবের ওপর এমন কড়াকড়ি তাহলে কেবিনে বসে থাকাই ভালো!

ল্যাডারের সামনে কে যেন তার কাঁধে হাত দিল:

'কি হে বীরপুরুষ, আমাদের এখানে তোমার ভালো লাগছে?'

কোস্তিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই লেফটেনাণ্টটি, স্টীমারের মেট; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাসছে। কোস্তিয়া অমনিতেই নিজের অসাফল্যের কারণে বিরক্ত হয়ে আছে, লেফটেনাণ্টের হাসিতে তার পিত্তি জ্বলে গেল, সে তাই এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর রেগে গরগর করে বলল:

'না!'

'তাই নাকি? কেন, শুনি?'

'এ আবার কী স্টীমার, যার এখানে যাওয়া নিষেধ, ওখানে দেখা নিষেধ!'

'ও এই কথা! তোমার বুঝি ইচ্ছে হচ্ছে ইঞ্জিনটা চালিয়ে দেখার, হুইলটা ঘোরানোর, আর ঐ মেগাফোনের ভেতর দিয়ে যদি চেঁচিয়ে বলা 'বাঁয়ে ঘোরাও!' তাহলে মন্দ হত না, কী বল? নাকি ঐ রকম আরও কিছু, অ্যাঁ?'

'মোটেই না! আমি কেবল দেখতে চাই।'

'আচ্ছা। তাহলে চল, দেখিয়ে আনি। এখানে গুমোটের মধ্যে বসে থেকে কী হবে!.. এই যে,' মেট বলল, 'ইঞ্জিনের পরেই স্টীমারের সবচেয়ে বড় জিনিস — রাডার। রাডার আছে ওখানে, নীচে, পাছগলুইয়ের তলায়, এই স্টীয়ারিং হুইলটা থেকে রাডারের দিকে চলে গেছে স্টীয়ারিং-রোপ। হালের নাবিক যখন স্টীয়ারিং হুইল ঘোরায় তখন রাডারও ঘুরতে থাকে।'

'কী গো মেট মশাই, নতুন কর্মী নাকি?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল হালের নাবিক।

'সবই হতে পারে। কালে হয়ত আমাদের জায়গায় কাজ করবে।'

'তা ত বটেই। স্বাধীন কাজ।'

'কম্পাসের ডালা কোথায়?' কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল।

হালের নাবিক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক জানলার ধারে, কিন্তু তার সামনে কম্পাস নেই, অথচ কোস্তিয়া বইয়ে যে সমস্ত জাহাজ-স্টীমারের কথা পড়েছে সেগুলিতে সব সময় কম্পাস থাকে।

'দেখলি ত? শিক্ষিত ছেলে!' মেট হাসতে থাকে। 'কম্পাস আমাদের দরকার হয় না। আমরা

ত সমুদ্রে যাচ্ছি না — যাচ্ছি নীপার নদীর ওপর দিয়ে, এখানে নদীর পাড় আর পথের সমস্ত চিহ্ন আমাদের চোখের সামনে।'

'আর ম্যাপ ?'

'ম্যাপ আছে এখানে,' এই বলে হালের নাবিক নিজের কপালে টোকা মারল।

কোস্তিয়ার চোখেমুখে হতভম্ব ভাব ফুটে উঠতে মেট তাকে বুঝিয়ে বলল:

'নদীকে আমাদের নীচ থেকে ওপরে আর ওপর থেকে নীচে, আগাপাশতলা মুখস্থ রাখতে হয়।'

'এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ম্যাপে যতক্ষণে চোখ বুলাবে ততক্ষণে তীরে এসে ধাক্কা খাবে,' হালের নাবিক বলল। 'ম্যাপ না থাকলেও পথ ভুল করার কোন ভয় নেই আমাদের...'

'সামাল, সামাল !' তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল মেট, কিন্তু হালের নাবিক ততক্ষণে স্টীরিং-এর চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে, ফলে স্টীমার ধীরগতিতে মোড় নিতে লাগল। 'এই ডোবা চড়াটা যেন আমার কেমন-কেমন লাগছে: সময়ের আগে বেরিয়ে পড়ল যেন।'

'না না, ঠিকই আছে। জল তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছে, তাই ওটাও উঠে আসছে ওপরে,' হালের নাবিক বলল।

'আর কী তোমাকে দেখাব বল ? কথাবার্তা চালানোর টিউবটা ? ওটার ভেতর দিয়ে আমরা ইঞ্জিনঘরে নির্দেশ পাঠাই — কী রকম গতিতে চলতে হবে জানাই।'

'আচ্ছা যদি চাই...' কোস্তিয়া কথাটা শুরু করে আর শেষ করার অবকাশ পায় না।

'না, আজেবাজে কথাবার্তা বলা চলবে না।'

'না না, আমি শুধু শুনতে চাই।'

'সে আর এমন কি — অবশ্যই।'

মেট নলের ছিপিটা খুলে দিতে, কোস্তিয়া নলের মুখটা কানে চেপে ধরল। নলের ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে ভাসা ভাসা অস্পষ্ট কোলাহল, ঘন ঘন শোঁ-শোঁ আওয়াজ, যেন কেউ জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে কোস্তিয়ার ঠিক কানের ভেতরে।

'আচ্ছা আমরা চলছি ত চলছিই, কিন্তু নদীর পাড়ে না গ্রাম না শহর কিছুই দেখছি না কেন ?'

'আছে, তবে ক্বচিৎ — যেখানে যেখানে জায়গা উঁচু। দেখছ না পাড় কেমন নীচু। বসন্তকালে বান ডাকে, নীপার পাড়টাড় সব ভাসিয়ে দিয়ে যায়। মাইলের পর মাইল বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যায় ভাই। এখানে গাঁ থাকলে তাও ভেসে যেত। গাঁ আছে আরেকটু দূরে, টিলার ওপরে, যাতে জল নাগাল না পায়। এই জন্যেই মনে হয় পাড়গুলো যেন খাঁ খাঁ করছে।'

কোস্তিয়াকে নিয়ে মেট গোটা ডেকটা ঘুরল, ওকে দেখাল ডেক-এর গায়ের সারি সারি আলো — ডান দিকে সবুজ, বাঁয়ে লাল — ভেন্টিলেটরের মুখ, এত চওড়া যে কোস্তিয়া অনায়াসে

তার ভেতর দিয়ে গলে যেতে পারে। বাইরে সাদা আর ভেতরটা লাল এই ভেন্টিলেটর-পাইপগুলো দেখতে বিশাল বিশাল হাঁ-করা মুখের মতো।

'আচ্ছা ঐ ওখানে, নীচে মেঝেটা লোহা বাঁধানো কেন?'

'আগে থেকেই রয়ে গেছে আর কি। আগে আমাদের স্টীমারটা ছিল গাধাবোট, পরে ওটাকে প্যাসেঞ্জার-স্টীমার বানানো হয়, তৈরি করা হয় ওপরের অংশ, কেবিন, কিন্তু ডেক থেকে যায় যে কে সেই।'

ফেকাসে চুলওয়ালা মেটকে কে যেন ডাকে।

'এক্ষুনি,' সে সাড়া দিয়ে বলল। 'তাহলে বন্ধু, তোমার নামটা কী? কোস্তিয়া? ঘুরে বেড়াও কোস্তিয়া আমাকে ছাড়াই, তবে হ্যাঁ, দেখবে, ডেক-এর ধারে যাবে না কিন্তু! তোমার মাকে আমি কথা দিয়েছি কিনা — অতএব দায়িত্ব আমার। বুঝলে?'

'জো হুকুম, ডেক-এর ধারে যাওয়া চলবে না!' কোস্তিয়া জোর দিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে।

'ওঃ! পাকা জাহাজী! না, তুমি শেষকালে একটা কিছু না হয়ে ছাড়বে না দেখছি!' এই বলে হাসতে হাসতে মেট ল্যাডার বয়ে তরতর করে নীচে নামতে থাকে।

মোট কথা দেখা যাচ্ছে এই মেট ছোকরাটা নেহাৎ মন্দ নয়, আর সব সময় যদি হাসে তাতেই বা বলার কী আছে? স্রেফ এই কারণে যে বয়স অল্প, ফুর্তিবাজ, সবকিছুই ভালো লাগে ওর।

কোস্তিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ডেক-এর ওপাশে জল ফেনায়িত হয়ে ছুটে চলেছে; জলের এই অপূর্ব ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ঝলক দেয় কাল্পনিক দৃশ্য — একটি আরেকটির চেয়ে বেশি লোভনীয়। আর কোস্তিয়া যখন মাথা ওঠায় তখন দেখতে পায় সামনে, বহু দূরে, দিগন্তের ঠিক কাছটায় পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে গোলাপী রঙের ধোঁয়া, যেন ঊষালগ্নের মেঘমালা।

মেঘরাশি বাড়তে থাকে, আরও ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে, একটু একটু করে ধারণ করে পীতবর্ণ। তাদের গায়ে দেখা যায় ছায়া, ছায়া শ্যামল হতে থাকে, শিগগিরই কোস্তিয়া অনুমান করতে পারে যে সেগুলি ধোঁয়া নয়, মেঘও নয় — ফাঁকা ফাঁকা সবুজ গাছপালায় ঘেরা খাড়া, উঁচু তীর। প্রথম প্রথম মনে হয় স্টীমার যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, পরে নদী হঠাৎ ডান দিকে বাঁক নিলে উঁচু ঢালগুলি দ্রুত বাড়তে বাড়তে অর্ধেক আকাশকে আড়াল করে ফেলে। ডান দিকে ঐসব ঢাল বয়ে গুঁড়ি মেরে ওপরে উঠছে কদাচিৎ এক-আধটা কুটির। খাড়া ঢালের পাদদেশে, নদীর তীরে বিঁধে আছে একটা জেটি — স্টীমার-ঘাটা। স্টীমার এসে ভিড়তে থাকে জেটির গায়ে। সেখানে রেলিং-এর ধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট মেয়ের দল আর তাদের মাথা ছাড়িয়ে একটি মূর্তি ডিমে তা দেওয়া মুরগীর মতো থেকে থেকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে — ইস্কুলের দিদিমণি বা পাইওনীয়র-লীডার হবে।

'এটা কী?' ডেক-এ একজন ছোটখাটো চেহারার বুড়ো মানুষ বসে ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করল কোস্তিয়া।

'ত্রিপোলিয়ে।'

'সেই ত্রিপোলিয়ে?'

'সেই আবার কোন্? ত্রিপোলিয়ে একটা বৈ দুটো নেই।'

কোস্তিয়া ডিগবাজী খেয়ে এক লাফে হুড়মুড় করে ল্যাডার বয়ে গ্যাঙওয়ের দিকে ছুটে গেল। ততক্ষণে গ্যাঙওয়ে লাগানো হয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে একের পর এক সার বেঁধে ব্যস্তসমস্তভাবে অথচ সাবধানে পা ফেলে চলেছে ইস্কুলের মেয়েরা, দিদিমণি রেলিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে একটা হাত সামান্য উঁচিয়ে বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়িয়ে গুনে চলেছেন মেয়েদের।

'এই যে কোস্তিয়া, ওদের ডেক-এ নিয়ে যাও ত!' ওকে হাঁক দিয়ে বলল পরিচিত মেটটি।

'না না, কেবিনে!' দিদিমণি চেঁচিয়ে বললেন।

'কেবিনে, আচ্ছা, তাহলে কেবিনেই,' মেট রাজী হয়ে বলল। 'পাছগলুইয়ের হলঘরে।'

কোস্তিয়ার ইচ্ছে ছিল তীরে নামে, কিন্তু মেট-এর অনুরোধ অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। সে পাছগলুইয়ের হলঘরের দিকে চলল, তার পেছন পেছন কানাকানি করতে করতে চলল মেয়ের দল। ওদের পেছন পেছন আগমন ঘটল দিদিমণির; ইস্কুলের মেয়েরা তাঁকে ছেঁকে ধরল, ওরা হলঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, আহা-ওহো শুরু করে দিল আর এমনই হল্লা জুড়ে দিল যে কোস্তিয়াকে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করতে হল।

তাহলে কী হবে তীরে নামা কিন্তু হয়ে উঠল না। দেখতে দেখতে ঘণ্টা বাজল, স্টীমার ভোঁ দিয়ে জেটি থেকে আলগা হয়ে গেল। চাকাগুলোর ওপরকার ঢাকনার নীচ থেকে শোঁ-শোঁ আর হিস্-হিস্ আওয়াজ তুলে গলগল করে ভাপ বেরোচ্ছে, জেটি তাতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আরও এবং আরও বেশি করে বেরোচ্ছে — স্টীমারটা যেন সরবে ফুঁ দিতে দিতে পথে নামার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে।

ওপরের ডেক-এ উঠে কোস্তিয়া রুদ্ধশ্বাসে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে খাড়া পাড়। উঁচু ঢালগুলি ফাঁকা, জনমানবশূন্য। আধা পাহাড়গোছের ঢিবিগুলিতে এঁটেল জমির ওপর, যেখানে খাড়া হয়ে আছে অল্পস্বল্প ঘাসের গোছা, সেখানে চরে বেড়াচ্ছে একটি সাদা রঙের ছাগী। ছাগীটা খুঁটে খুঁটে ঘাস মুখে দেয়, তারপর মাথা তুলে ঘাস চিবোতে চিবোতে স্টীমারের দিকে তাকায়, আবার ঘাস খুঁটতে শুরু করে।

ত্রিপোলিয়ে! কিয়েভের কমসমোলসদস্যদের আত্মাহুতি ও অমর গৌরবের ক্ষেত্র! এই কিছুদিন আগেও শিক্ষাবর্ষ শেষ হবার মুখে পাইওনীয়র-লীডারের মুখে ও শুনেছে ত্রিপোলিয়ের করুণ কাহিনী, শুনেছে ১৯১৯ সালে কুলাক* 'সবুজ' দস্যুদলের বিরুদ্ধে কিয়েভ থেকে

* কুলাক — জোতদার। — সম্পাঃ

কমসমোলবাহিনীর সংগ্রাম ঘোষণার কথা, ত্রিপোলিয়েতে এসে অসমান যুদ্ধে তাদের মৃত্যুবরণের কথা। হয়ত বা এই খাড়াইয়ের ওপর থেকেই ল্যুবা আরোনভা ও মিশা রাত্‌মান্‌স্কি শেষ বারের মতো তাকিয়ে দেখে নীপার আর নীপারসংলগ্ন অপার দূরপ্রান্ত, জন্মভূমির প্রতি জানায় তাদের বিদায় অভিনন্দন।

কোস্তিয়া চোখের দৃষ্টিতে খুঁজতে থাকে স্মৃতিস্তম্ভ, কিন্তু তীরে স্মৃতিস্তম্ভের মতো কিছুই ছিল না।

কোস্তিয়ার দুঃখ হল এই ভেবে যে স্মৃতিস্তম্ভ নেই, নেই সুন্দর বিশাল এমন কোন স্মৃতিস্তম্ভ যা সব জায়গা থেকে চোখে পড়ে, যাতে তাকে দেখতে পেয়ে স্টীমার বিষণ্ণ সুরে দীর্ঘ ভোঁ ছাড়ে আর যাত্রীরা কঠোর নীরবতা অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে সেই সব মানুষকে যাঁরা একান্ত আপন সোভিয়েত শাসনক্ষমতার জন্য, কমিউনিজমের জন্য বিসর্জন করেছেন তাঁদের জীবন।

স্মৃতিস্তম্ভ এখান থেকে চোখে পড়ে না, স্টীমার ভোঁ না দিয়ে দ্রুতগতিতে, ব্যস্তসমস্তভাবে জলের ওপর ছপাছপ চাকার বৈঠা ফেলে। ডেক-এর ওপরকার বেঞ্চিতে ছোটখাটো চেহারার বুড়ো লোকটা বসে বসে একমনে একটা সেঁকা মাছের ছাল ছাড়াচ্ছে।

কোস্তিয়া 'অ্যাটেনশনের' ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে পাইওনীয়রের কায়দায় স্যালুট করে, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে দূরে অপসৃয়মাণ ত্রিপোলিয়ের খাড়াইয়ের দিকে।

সূর্য আরও নীচে নামতে থাকে, বাতাসের বেগ বাড়ে, কোস্তিয়া তার কোর্তাটা আনার জন্য কেবিনে গেল। ফিরতি পথে ও পাছগলুইয়ের হলঘরটায় একবার উঁকি মারল। ইস্কুলের মেয়েগুলো সেখানে ছোট ছোট সোফা দিয়ে একটা কোণ ঘেরাও করে নিয়েছে, ওদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে মাথার নীচে পোঁটলা রেখে শুয়ে পড়েছে, বাদবাকিরা দিদিমণির কথা শুনছে। দুটি মেয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তারা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে করিডরে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। ওদের একজন একটু লম্বা, মনে হয় তার সাহসটাও একটু বেশি — কোস্তিয়াকে সে জিজ্ঞেস করল: 'ওপরে যেতে পারি?'

'হ্যাঁ, যেতে পার,' কোস্তিয়া অনুমতি দিল। 'এসো, আমি দেখাচ্ছি।'

কোস্তিয়া বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে পাশের হাতল না ধরেই ল্যাডার বয়ে উঠতে থাকে, বকের মতো সরু সরু ঠ্যাঙে আঁটা বড় বড় বুটজুতো খটখট করতে করতে ওর পেছন পেছন কষ্টেসৃষ্টে ওপরে চলে মেয়েদুটো।

'তোমরা কোন্ ক্লাসে পড়?' ডেক-এ উঠে কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল।

'ক্লাস ফাইভে উঠলাম,' যে মেয়েটা লম্বায় একটু বড় সে বলল।

'আর আমি ক্লাস ফোরে,' ছোটজন বলল।

'আ-চ্ছা!' কোস্তিয়া অবজ্ঞাভরে টেনে টেনে বলল। 'যাচ্ছ কোথায় তোমরা?'

মেয়েদুটোর ঠাণ্ডা লাগছে। বাতাসের তাড়নায় ওরা জড়সড় হয়ে, পিঠ ফেরায় বাতাসের

দিকে। গায়ের ফ্রক বাতাসে ফুলে উঠতে ওরা দু'হাত সামান্য ঠেকিয়ে ফ্রক সামলাতে থাকে, তবু ওখান থেকে নড়ে না। দু'জনে মিলে হুড়োহুড়ি করে বলল যে ওরা চলেছে কানেভে তারাস শেভ্‌চেংকো ও আর্কাদি গাইদারের সমাধি দেখতে, ওলগা সেমিওনভ্‌না ভালো মহিলা, তবে তাঁর সব সময় ভয় পাছে কেউ হারিয়ে যায় কিংবা জলে পড়ে যায়, তাই ওদের কোথাও ছাড়েন না, আর ওরা এই প্রথম চলেছে স্টীমারে চেপে, সবেতেই ওদের মজা লাগছে।

'প্রথম যখন তখন ত লাগবেই,' প্রশ্রয়ের সুরে বলল কোস্তিয়া। 'এই যে দেখ...' সে দেখাতে দেখাতে ওদের বলতে থাকে সেই সব কথা যা এক ঘণ্টা আগে সে নিজে শুনেছে মেট-এর কাছে, আর বলতে থাকে এমন ভাবে যেন সে এই ডেক-এর ওপরকার ঘর, নঙ্গরের দড়িদড়া আর ল্যাডারের মাঝখানে জন্মেছে, এগুলির মাঝখানেই বড় হয়ে উঠেছে।

মেয়েদুটো ঠাণ্ডায় নীল হয়ে যায়, তাদের গায়ের চামড়া দেখতে হয় পালক ছাড়ানো হাঁসের ছানার মতো ফুসকুড়ি ওঠা, কিন্তু তারা এত অবাক হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কোস্তিয়ার দিকে তাকায় যে কোস্তিয়া আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে, আরও বেশি করে এই আলোচনায় মেতে ওঠে যে নদীর স্টীমার হল নেহাৎই এলেবেলে ব্যাপার — দুই পাড়ের মাঝখান দিয়ে চলেছে, ঘরের ভেতরে হাঁটার মতো, এতে কোন মজা নেই, তবে হ্যাঁ সমুদ্রে — তার কথা আলাদা, সেখানে চলতে গেলে কম্পাসের দরকার হয়, সূর্যের দিকে খেয়াল রাখতে হয়! তাছাড়া এখানে দেখ না ঝড়টড় কিছু হয় না, নিরাপদ, যেন স্নানঘরে আছি, আর সমুদ্রে — ঝড় উঠল কি অমনি সামাল সামাল!

মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা দু'জন ওর প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাভাবাপন্ন হয়ে পড়ে যে ওকে আর 'তুমি' বলতে ভরসা পায় না।

'আপনি কি নাবিক? ছুটিতে যাচ্ছেন বুঝি?' বড়জন জিজ্ঞেস করে।

'এখনও নই,' খানিকটা থতমত খেয়ে বলল কোস্তিয়া। 'তবে শিগগিরই হব... আমি এখন যাচ্ছি মামার বাড়ি। হ্যাঁ, উনি হলেন গিয়ে... নাবিক,' নিজের অজানতে আচমকা যোগ করল কোস্তিয়া।

ঠিক এই সময় ভয়ার্ত দিদিমণি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ওদের দিকে ছুটে এসে, খপ করে চেপে চেপে ধরলেন কোস্তিয়ার দুই শ্রোতার হাত — ওরা ততক্ষণে ঠাণ্ডায় জমে একেবারে নীলচে হয়ে গেছে।

'বলি মেয়েরা, এসব কী কাণ্ড? বলা নেই কওয়া নেই, এরকম ভাবে চলে যাওয়া কি ঠিক? নিজেদের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি, কী হালটা হয়েছে। আর হ্যাঁ, তুমি খোকা, তোমার লজ্জা করে না! তুমি না ওদের চেয়ে বড়! তোমার বোঝা উচিত...'

'আমি ত আর ওদের ডাকি নি, ওরা নিজেরাই গায়ে পড়ে এসেছে,' কোস্তিয়া আনাড়ীর মতো কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করে।

দিদিমণি ওর কৈফিয়তে কান না দিয়ে মেয়েদুটিকে নিয়ে চলে গেলেন। ওরা দুটিতে তখন ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে গেলেও নতুন আলাপে তাদের খুশি খুশিই দেখাচ্ছিল।

নদীতীরের কুঠি

একা একা কোস্তিয়ার একঘেয়ে লাগছিল, ঠাণ্ডাও লাগছিল। এ ধরনের ঘটনার পর ইস্কুলের মেয়েদের কাছে যাওয়াটা অস্বস্তিকর, তাছাড়া মেয়েদের সঙ্গে তার করারই বা কী আছে? ফেকাসে চুলের মেটকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না, কোস্তিয়া তাই নেমে এলো নিজের কেবিনে। তার কেন যেন সব সময় কেমন-কেমন লাগছে, কিন্তু কেন, তা বুঝে উঠতে পারছে না, সে সাব্যস্ত করল আসলে তার খিদে পেয়েছে। কোস্তিয়া মাংস, ডিমসেদ্ধ আর স্ট্রবেরির পেস্ট্রি বার করল, আনমনে ভাবতে লাগল। তার ইতস্তত ভাব বেশিক্ষণ টিকল না: কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে তাতে কী আসে যায়? প্রথমে মাংস খেতেই হবে এমন কী কথা আছে? প্রথমে খাওয়া যেতে পারে পেস্ট্রি, পরে বাকি সব। সে পেস্ট্রি শেষ করল, মাংসের টুকরো কেটে নিল, কিন্তু আর খাবার ইচ্ছে না থাকায় সব খাবারদাবার ফের ঝোলায় পুরে রেখে দিল।

কোস্তিয়া টেবিলের ওপর উঠে পোর্টহোল দিয়ে দেখতে লাগল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এঁটেল মাটির উঁচু উঁচু খাঁজগুলি, বাঁ তীরের বালির চড়া গোলাপী আভা ধারণ করছে, আর জল ক্রমে কালো হয়ে আসছে, যেন ক্রমেই হয়ে আসছে ঘন আর ভারী।

খিদে আর নেই, কিন্তু অস্বস্তির ভাবটা কোস্তিয়ার কাটতে চায় না। কী এমন সে করেছে? মেয়েদুটোকে কি সে তুলে নিয়ে এসেছে নাকি? সে তাদের তুলে নিয়ে আসে নি, ওরা নিজেরাই গায়ে পড়ে এসেছিল। সাগর সম্পর্কে কোন বেঠিক কথা বলেছে কি? যা যা বলেছে সবই ঠিক। তবে হ্যাঁ, মিথ্যে বলেছে মামার প্রসঙ্গে! মিথ্যে বলতে গেল কেন? মামা যে এখন নাবিক নন, তিনি হলেন বয়া-তদারককারী।

মামাকে সে দেখেছে মোটে দুবার। মামা আসতেন প্রায়ই কিন্তু সে সময় কোস্তিয়া হয় পাইওনীয়র ক্যাম্পে, নয়ত ইস্কুলের বোর্ডিং-এ — ফলে দাঁড়ায় এই যে তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হয়েই ওঠে নি। কোস্তিয়ার মনে আছে মামার থমথমে গলার আওয়াজে তাদের সারা ঘর গমগম করত, যখন তিনি ভারী ভারী পা ফেলতেন তখন খাবার ঘরের কাচের পানপাত্রগুলিতে মৃদু টুংটাং আওয়াজ হত, তার মনে আছে মামার পুরুষ্টু ঝোলা গোঁফ, ঐ একই রকমের ঝোলা ভুরুর নীচে হাসি-হাসি চোখজোড়া আর মামার বেজায় কড়া তামাক। মামা তামাক খেতে শুরু করলে মা গলায় হাত ঠেকিয়ে আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করতেন:

'হা ভগবান, কী করে এই বিষ টানিস?'

'কী হল, খুব কড়া নাকি?' মামা মৃদু হেসে বলেন। 'মশা তাড়ানোর জন্যে ঠিক এই ত চাই।'

'কিন্তু আমরা ত আর মশা নই!' এই বলে মা দুটো জানলাই দরাজ খুলে দেন।

মামা চলে যাবার কয়েক দিন পরে পর্যন্ত ঘরের মধ্যে টের পাওয়া যেত ঘরে তৈরি তামাকের ঘন, কটু গন্ধ। মামা বয়া-তদারককারী, এটা জানার পর কোস্তিয়ার ভারী আনন্দ হল — সে তখন ক্লাস ফোরে পড়ে — সে মামাকে জিজ্ঞেসাবাদ করতে শুরু করল, কেননা তার ধারণা হয়েছিল কাজটা অনেকটা নির্জন দ্বীপে আলোকস্তম্ভের পাহারাদারদের ধরনের, যাদের কথা সে পড়েছে জুলে ভার্নের 'পৃথিবী শেষের আলোকস্তম্ভ' বইতে; কিন্তু মামা হেসে বললেন ওরকম কিছুই নয়: আলোকস্তম্ভ এক জিনিস আর বয়া আরেক জিনিস। বয়া হল স্রেফ ভেলার ওপর ছোট ছোট তিনকোনা গুমটি। সন্ধ্যায় সেগুলির ওপর বাতি জেলে দিতে হয়, আর সকালে নিভিয়ে দিতে হয়। এই হল কাজ। দ্বীপ আছে, সেগুলির একটাতেও জনবসতি নেই। বসবাসের যোগ্যও নয় ঐ সমস্ত দ্বীপ — জোয়ারের জলে ভেসে যায়, বালিমাটিতে উইলোর ঝোপ আর আগাছা ছাড়া কিছুই জন্মায় না ওখানে।

কেবল মনের সুখে স্নান করা আর মাছ ধরা ছাড়া আকর্ষণীয় কোন বস্তু কোস্তিয়া সেখানে আশা করতে পারে না। তাও আবার সেগুলো করতে হবে একা একা, যেটা একেবারেই একঘেয়ে। মামার ছেলেটেলে নেই, আছে একমাত্র মেয়ে নিউরা।

অবশ্যই একঘেয়ে লাগবে... ভাবতেই এমন একঘেয়ে লাগে যে কোস্তিয়ার চোখ আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে আসে, সে ঘুমে ঢুলে পড়ে।

'ওহে বন্ধু, ওঠো ওঠো! আমরা এসে গেছি।'

কে যেন কোস্তিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল, কোস্তিয়া তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, সিলিং-এর উজ্জ্বল আলো চোখে এসে লাগতে সে চোখ কোঁচকাল। ওকে জাগিয়ে দিল সেই ফেকাসে চুলের মেট।

'এখনও রাত যে!'

'ও কিছু নয়, বাড়ি গিয়ে বাকি ঘুমটা ঘুমিয়ে নেবে, 'খন। পলিয়ান্‌স্কায়ার কাছাকাছি চলে এসেছি।'

কোস্তিয়া তার হাতব্যাগ আর ঝোলা তুলে নিয়ে মেটকে অনুসরণ করে চলে এলো নীচের ডেক-এ। স্টীমার জনমানবশূন্য, কোন সাড়াশব্দ নেই, কেবল থেকে থেকে ইঞ্জিন নিশ্বাস ফেলছে আর চাকার বৈঠাগুলো গোঁ-গোঁ শব্দে জলের ওপর আছড়ে পড়ছে। স্টীমারের চারপাশে কালো অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা, তীর চোখে পড়ে না, এমনকি জলও নয়, কেবল নীচে, একপাশে, ডেকের গায়ের সবুজ আলোর ভঙ্গুর রেখা ঝকমক করছে।

'আমাকে কোথায় নিয়ে চলছে?' কোস্তিয়া হতবুদ্ধি হয়ে মনে মনে ভাবল।

স্টীমার দুটো ভোঁ বাজাল — একটা দীর্ঘতর, অন্যটা সংক্ষিপ্ত।

'ভোঁ দেবার কোন দরকার ছিল না,' মেট বলল, 'ঐ ত আসছেন এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ।'

'কোথায় ? কোথায় ?' কোস্তিয়া এদিক-ওদিক মাথা ঘোরায়।

'ঐ যে, সামনে।'

সামনের দিকে ডান পাশ থেকে ঝলকে ওঠে সবুজ আলো। আলোটা মিলিয়ে যায়, তারপর ফের দেখা দেয়, ধীরে ধীরে পাশ থেকে ভেসে আসে 'আশখাবাদ'-এর সামনে। স্টীমার ইঞ্জিন থামিয়ে গতি মন্থর করে দেয়। যে আলোটা এতক্ষণ অনেক দূরের বলে মনে হচ্ছিল সেটা হঠাৎ যেন একেবারে কাছের হয়ে এলো, দুভাগ হয়ে গেল, এবারে কোস্তিয়া স্পষ্ট চিনতে পারল নৌকোর সামনের গলুইয়ের বাতি, জলের ওপরে ছুটন্ত তার সর্পিল প্রতিফলন, আর বাতির ওপাশে — এক বিশাল আঁধার-কালো মূর্তি — মূর্তিটা কখনও ঝুঁকে পড়ছে, কখনও বা সোজা হচ্ছে।

নৌকো 'আশখাবাদ'-এর গায়ে গায়ে এসে লাগল, নৌকোর লোকটা পুরোপুরি উঠে দাঁড়াল, ডেক-এর সমতলে এসে ঠেকল তার মাথা। এবারে কোস্তিয়া তাকে চিনতে পারল, যদিও স্বল্প আলোয় মনে হচ্ছিল গোঁফজোড়ায় তার মুখের অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে আর চোখের বদলে তার আছে দুটো বড় বড় অন্ধকার কোটর।

'এই যে মামা ! আমি, আমি এসে গেছি !' কোস্তিয়া বলল। 'কিন্তু নামব কী করে ?'

'এই যে এভাবে,' মেট বলল।

সে কোস্তিয়ার দুই বগলের তলা চেপে ধরে স্টীমারের ধার দিয়ে তাকে নীচে নামিয়ে দিল সেখানে তাকে খপ করে দু'হাতে চেপে ধরলেন মামা, বসিয়ে দিলেন একটা দোল-খাওয়া বেঞ্চের ওপরে।

'কী, সব ঠিক আছে ত ?'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ,' মামা বললেন।

'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। তোমার ভালো হোক, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ,' মেট জবাব দিল। 'শক্ত করে চেপে ধর।' কোস্তিয়াকে এই কথা বলে মামা সজোরে ধাক্কা মেরে স্টীমার থেকে দূরে সরে যান।

নৌকো দ্রুতগতিতে কালো শূন্যতার মধ্যে চলে যায়। 'আশখাবাদ' অনুচ্চস্বরে সংক্ষিপ্ত ভোঁ দিচ্ছে — যেন পাছে রাত্রি ভীতচকিত হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায়। তার চাকা মন্থর গতিতে ঘুরছে, পরে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয় সেই গতি, স্টীমার নৌকোটার পাশ কাটিয়ে চলে, দেখতে দেখতে তার দেহরেখ ধেবড়ে একাকার হয়ে যায় অন্ধকারের মধ্যে, কেবল জ্বলজ্বল করতে থাকে পাছগলুইয়ের কেবিনের জানলাগুলি। অবশেষে সেগুলিও মিলিয়ে যায়, থাকে শুধু কোনক্রমে চেনার মতো ঢেউ, যার আঘাতে নৌকোটা দুলছে।

'কি রে বাড়ির খবর-টবর কী ? মা কেমন আছে ?' বাতি নিভিয়ে দিয়ে দাঁড় হাতে নিয়ে মামা জিজ্ঞেস করলেন।

'সব ভালো। মাকে কাজের জন্যে যেতে হচ্ছে বাইরে।'

মামা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেন, কোস্তিয়ার জবাবগুলো হয় নিস্তেজ, এলোমেলো।

'তোর ঘুম পেয়েছে তাই না ?'

'না, কেন ?' ইতস্তত স্বরে কোস্তিয়া প্রতিবাদ করে বলল।

ঘুম কিন্তু তার সত্যি সত্যিই পেয়েছে। প্রভাতের পূর্ব মুহূর্তের শিরশিরে তাজা বাতাস কোর্তার ভেতর দিয়ে পর্যন্ত এসে ঢুকছে আর পাতলা ট্রাউজারের ভেতর দিয়ে ত কোন কথাই নেই। বিশেষ করে এসে লাগছে কোস্তিয়ার হাঁটুদুটোতে — তা যতই তাদের চেপে রাখ আর দু'হাতে যতই ঢেকে রাখ না কেন।

অতঃপর কোস্তিয়াকে পেয়ে বসল একটি প্রশ্ন: আচ্ছা, কী করে কম্পাস ছাড়া মামা রাস্তা বার করেন, জানতে পারেন এই অন্ধকারের মধ্যে কোন্ দিকে দাঁড় বাইতে হবে ?

মামা কিন্তু ফিরেও তাকান না, দাঁড়ের একেকটি জোরাল ঘায়ে নৌকোকে সামনে দাবড়ে নিয়ে যান। দাঁড় যখন জল থেকে ওঠে তখন শোনা যায় নৌকোর গায়ে ছোট ছোট তরঙ্গের দ্রুত অথচ খোসামুদে ভঙ্গিতে আছড়ে পড়ার শব্দ।

সামনের অন্ধকার ঘন হয়ে আসে, বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে তাদের ওপর এসে ঠেকে যায়।

'সামাল ! ধরে থাকিস !' ফের সতর্ক করে দিলেন মামা।

কোস্তিয়া নৌকোর গাটা চেপে ধরে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, আরেকটু হলেই হাঁটুর সঙ্গে তার থুতনির ধাক্কা লেগে যেত — এমনই জোরে আর আচমকা নৌকোটা মুখ থুবড়ে তীরে এসে লাগল।

'এসে গেছি ! তোর পুঁজিপাটা ওঠা এবারে।'

কোস্তিয়া নৌকো থেকে নামল, মামা নৌকোটাকে পাড়ের ওপর প্রায় অর্ধেক অবধি টেনে আনল; এরপর ওরা খাড়া পাড় ধরে গুঁড়ি মেরে ওপরে কোথায় যেন চড়ল, প্রবেশ করল একটা ছোট্ট ঘরে। ঘরটার ভেতরে অন্ধকার, কোন সাড়াশব্দ নেই।

মামা লণ্ঠন জ্বালিয়ে কোস্তিয়াকে বিছানা দেখিয়ে দেন। কোস্তিয়া কোন রকমে জামাকাপড় খোলে, কম্বলটা একপাশে সরিয়ে রাখে। মামা যখন কী যেন বলতে বলতে ওকে ঢেকে দেন তখন ও আর কিছুই শুনতে পায় না। এরপর উনি লণ্ঠন নিয়ে চলে যান।

একটা চড়া ও তীক্ষ্ম আওয়াজে কোস্তিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। সবে ধোয়া মেঝেটা শুকিয়ে এসেছে। দরাজ খোলা জানলা ভেদ করে তার ওপরে এসে পড়ছে সূর্যকিরণ। দরজাটা পুরোপুরি খোলা, তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের নির্মল আকাশ। অদ্ভুত আওয়াজটা থামছে না, তার

সঙ্গে এসে মিলছে কেমন যেন দীর্ঘশ্বাস আর ফোঁপানি। কোস্তিয়া ফিরে তাকাতে দেখতে পেল যে টেবিলের ধারে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। মেয়েটার হালকা কটাসে চুলগুলো দুটো বিনুনি করে বাঁধা, বিনুনির সঙ্গে লাল ফিতে। 'মুখে নির্ঘাত ফুটি ফুটি দাগ,' কোস্তিয়া মনে মনে ভাবল। 'যারা কটাচুলো তাদের মুখ ছুলিভরা না হয়ে যায় না।'

মেয়েটির কাঁধজোড়া কখনও নামছে, কখনও উঠছে আর বিলাপের মতো চড়া ও তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

'কাঁদছিস কেন রে?' কনুইয়ে ভর দিয়ে শরীরটা সামান্য উঠিয়ে জিজ্ঞেস করল কোস্তিয়া।

মেয়েটা ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। ওর মুখে একটাও ছুলির দাগ নেই, ছোট ছোট সাদা ধবধবে দাঁত আর স্বচ্ছ নীল চোখ ওর।

'আমি কাঁদছি না, গান গাইছি। আমি ময়দা মাখছি আর গান গাইছি, নইলে একঘেয়ে লাগে যে। কান্নার মতো মনে হচ্ছে বুঝি? অ্যাঁ? তোমার ঘুম এর মধ্যে ভেঙে গেল? অ্যাঁ?'

মেয়েটা এত তড়বড় করে কথা বলে যে কোস্তিয়া কোন জবাব দেবার অবকাশ পায় না, জবাবের প্রত্যাশাও সে করে না।

'আমি জানি, তুমি হলে ভাগ্নে। আমার বাবার বোন — তোমার মা। অ্যাঁ, তাই না? তুমি হলে কোস্তিয়া এলেমদার। কিন্তু এলেমদার কেন? অনেক এলেম আছে বলে? অ্যাঁ? না? নাকি এটা শুধু একটা পদবী? আমাদের ক্লাস ফাইভে একটা মেয়ে আছে, তার পদবী হল গিয়ে নমস্কার। গালিয়া নমস্কার। ক্লাসের মেয়েরা একজন আরেকজনকে নমস্কার জানালে মেয়েটা ওকে ডাকছে ভেবে সাড়া দেয়। হাসির ব্যাপার, তাই না? অ্যাঁ?'

কোস্তিয়ার প্রথমে ইচ্ছে হল রেগে ওঠে, পরে তার ইচ্ছে হল হাসার, কিন্তু সে কোনটারই অবকাশ পায় না।

'আর আমার নাম হল নিউরা। তুমি আমাদের এখানে থাকবে বুঝি, অ্যাঁ? আমি তোমাকে সবকিছু দেখিয়ে দেব। দেখবে আমাদের জায়গাটা কেমন ভালো। চুপ করে আছ যে? তুমি কি বোবা?'

'তুই যে কোন ফাঁক না দিয়ে অনর্গল কথা বলে চলেছিস, আমি কথাটা বলব কখন শুনি?'

'ও মা, সত্যিই ত! আমি এত তাড়াতাড়ি কথা বলি যে কোনমতেই থামতে পারি না। এই ধর না স্কুলে দিদিমণি যখন আমাকে ব্ল্যাকবোর্ডে ডাকেন — বুঝলে ত, অ্যাঁ? — আমি অ্যায়সা উত্তর দিতে শুরু করি যে উনি কেবল শোনেন আর শোনেন, শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন: 'কিচেয়েভা, কথা বলিস না ত, যেন উঁচু ঢিবি থেকে দুদ্দাড় করে ছুটছিস।' তাই মনে হয় বুঝি, অ্যাঁ? এটা একটা সাংঘাতিক বদ অভ্যেস! আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই ভিক্তর পেত্রোভিচ বলেন যে বাড়তি এনার্জিই এর কারণ, উনি আমার নাম দিয়েছেন রকেট। ছেলেরা

আমাকে ডাকে এই নামে। মানে, ডাকে না, খ্যাপায়। আমার অবিশ্যি তাতে কিছু আসে-যায় না। খ্যাপাক গে ! সত্যি কিনা ? তুমি হাসছ কেন ? হাসার মতো কোন কথা বললাম নাকি ? অ্যাঁ ? আমার মনে হয় একটুকুও নয়। আচ্ছা, তোমার বদ অভ্যেসটা কী রকম শুনি ? বাবা বলেন সকলেরই বদ অভ্যেস আছে। আমারও তাই মনে হয়। কী বল, অ্যাঁ ?'

ও তড়বড় করে কথা বলতে বলতে ময়দামাখার কাজ চালিয়ে যায়। জিভের সমান তালে চটপট চলে তার হাত, তার ছোট ছোট হাতের মুঠির চাপে ময়দার ডেলা করুণ স্বরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর্তনাদ করে।

'ব্যস, হয়ে গেল। এবারে আমি এটাকে ঢেকে রাখি — অ্যাঁ ? — কিছুক্ষণ বাদেই মজে উঠবে। তুমি উনুন ধরাতে পার ? না ? সে কী রকম ? এক্ষুনি আমি ধরাচ্ছি, তারপর আমরা ছুটে যাব চান করতে। তুমি সকালবেলা চান করতে ভালোবাস ?'

'কিন্তু জল যে ঠাণ্ডা ! তাই না ?'

'ধুৎ ! সকালেই ত সবচেয়ে ভালো !'

নিউরা কথা বলতে বলতে একটা বাদামী রঙের ছোট্ট শিখার মতো ঘরময় দাবড়িয়ে বেড়ায়। আর ঐ একই রকম দ্রুতগতিতে তার হাতের স্পর্শে এখানে ওখানে সরতে থাকে জিনিসপত্র — যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে, শুয়ে পড়ে। তোয়ালে দিয়ে ঢাকা পড়ে মাখা ময়দার তাল, উনুনের মুখ থেকে ঢাকনাটা ঝটাস করে সরে গিয়ে দেয়ালের গায়ে হেলে পড়ে, পটপট শব্দে কুটো জ্বলে ওঠে আর আগুন লকলক করে দ্রুত নাগাল ধরতে যায় লকড়ির।

'আঁচ ধরবে 'খন, ততক্ষণে একছুটে যাওয়া যাক।'

নিউরার পেছন পেছন কোস্তিয়া বেরিয়ে আসে, কিন্তু ওর পেছন পেছন চলা দায়, দৌড়ানো ছাড়া উপায় নেই। কোস্তিয়া দেউড়ি থেকে নামতে না নামতে মেয়েটা খাড়া পাড়ের ধারে চলে গেছে, বিনুনির ঝলক দিয়ে উধাও হয়ে গেছে ওটার নীচে। কোস্তিয়াও ছুটল, কিন্তু কোন পায়ে-চলা-পথ খুঁজে না পেয়ে সে গোড়ালিতে ভর দিয়ে পা টিপে টিপে কাদামাটির ওপর দিয়ে সোজা নেমে গেল তীরের সরু এক ফালি বালুচরের দিকে। সেখানে বালির ওপর উলটে পড়ে আছে ছোট্ট একটা নৌকো, তার পাশে জলে দাঁড়িয়ে আছে ভাসানো আরেকটি, ওটার চেয়ে একটু বড়। নিউরা ইতিমধ্যে বড় নৌকোটার পাছগলুইতে উঠে পড়েছে, কোস্তিয়াকে ডাকছে, কিন্তু কোস্তিয়া প্রভাতের সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নদীর বুকে একটিও তরঙ্গরেখা নেই, নদী স্বচ্ছ ও মসৃণ — কাচের মতো। তার ওপরে ঘনিয়ে আছে কুয়াসার হালকা ধোঁয়াটে ভাব, কিন্তু কুয়াসা ইতিমধ্যে জল থেকে ঊর্ধ্বে উঠে গেছে, এখন আলগোছে বসে লক্ষ করলে দেখা যাবে জল আর কুয়াসার মাঝখানের খালি জায়গায় সোনালি চড়াভূমি, সবুজ গাছপালা — সেগুলি দ্বীপের হতে পারে আবার দূরবর্তী তীরভূমিরও হতে পারে। সূর্য সবে উঠেছে, ধীরেসুস্থে উঠছে গভীর নীল আকাশ বয়ে।

'কী হল ? শিগগির !' নিউরা চেঁচিয়ে বলল। ও ততক্ষণে গায়ের জামা খুলে ফেলেছে, জাঙ্গিয়া আর গেঞ্জি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'জলে ডুব দিতে পার ত তুমি ?'

সে লাফিয়ে উঠে বড়শীর মতো বেঁকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাচস্বচ্ছ মসৃণ জলের বুকে। সশব্দে ঊর্ধ্বে ছিটকালো ফোয়ারা আর প্রায় তক্ষুনি তার কটা চুলের রাশি দেখা গেল জলের ওপরে।

'ওঃ কী চমৎকার ! তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে !' নিউরা চিৎকার করে বলল।

কোস্তিয়া তার অভ্যাসমতো পরখ করে দেখতে চেয়েছিল জলটা ঠাণ্ডা কিনা, কিন্তু এই কটা বাচালটা পাছে তাকে ভীতু ভেবে বসে এই আশঙ্কায় সে নৌকোর পাছগলুইয়ে গেল। একটু নীচু বটে, তবে ও কিছু নয়। কোস্তিয়া দু'হাত জড় করে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠল; শূন্যে অর্ধবৃত্তাকারে পাক খেয়ে, নিঃশব্দে, জল না ছিটিয়ে প্রায় খাড়াভাবে এসে পড়ল জলে। ও যখন নাক ঝেড়ে দম নিয়ে নৌকোর দিকে সাঁতরে আসতে থাকে নিউরা ততক্ষণে নৌকোর পেছনে উঠে বসেছে. মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে তাকে।

'ওঃ দারুণ ! আমি এমন পারি না। তুমি আমাকে শেখাবে ? অ্যাঁ ? আচ্ছা, আরও একবার — তারপরই ছুটতে হবে রুটি বানাতে, বাবার ফিরে আসার সময় হয়ে এলো বলে।'

নিউরা আরও একবার ডুব দিল, তারপর জামাটা তাড়াতাড়ি গায়ে গলিয়ে ওখান থেকে ছুটে পালাল। কোস্তিয়া অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে নদীটা দেখতে থাকে, শেষকালে দূরে স্রোতের মুখে লক্ষ করে একটা ছোট কালো বিন্দু। বিন্দুটা প্রথমে অচল বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু অল্প অল্প করে সেটা বাড়তে থাকে, তার দুপাশে দেখা যায় আলোর চমক — সূর্যকিরণে দাঁড় ঝলকাচ্ছে।

কোস্তিয়া যখন ফিরে এলো নিউরা ততক্ষণে টেবিলে রাখছে রাশীকৃত রুটির থালা, রুটির স্তূপের ওপর বুদ্বুদ তুলছে টগবগে ঘি। ঝনঝন, ঠনঠন আওয়াজ তুলে টেবিলের ওপর একে একে দেখা দিচ্ছে পাত্র আর ঠাণ্ডায় বিন্দু বিন্দু ঘামঝরা দুধভর্তি পেটমোটা জগ।

'কী খবর তোমাদের ? আলাপ-পরিচয় হল ? বনেছে ত ?' ঘরে প্রবেশ করতে করতে বললেন এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ।

'বনেছে বাবা, বনেছে !' নিউরা বলল। 'তাই না, কোস্তিয়া ? নয় ত কী ! ভাব না হওয়ার কী আছে ? চল, আমি তোমাকে জল ঢেলে দিই।'

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ ধীরেসুস্থে — তাঁর ভাষায়: বুদ্ধি-বিবেচনা আর দরদ দিয়ে — হাতমুখ ধোন। তারা চেয়ার-টেবিলে বসে, খেতে শুরু করে মুচমুচে ফুলকোওয়ালা ফুরফুরে রুটি, তারা পান করে ঘন দুধ, আর সে দুধ এতই ঠাণ্ডা যে দাঁত কন্‌কন্ করে।

'ধন্যবাদ আন্না এফিমভ্‌না,' মামা টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বলেন।

তিনি তাঁর পাইপ ধরালেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে গেল তরল অ্যামোনিয়ার মতো ঝাঁঝাল গন্ধে।

'ফুঃ বাবা! কতবার তোমাকে বলছি!' নিউরা হাত নেড়ে বলল, জানলার খোলা পাল্লা আরও বেশি করে খুলে দেয়ার চেষ্টা করল সে।

'চল্ কোস্তিয়া, খোলা হাওয়ায় যাওয়া যাক, আমার এই ধুনোর গন্ধ আবার মশা আর আমি ছাড়া আর কেউ সইতে পারে না... এই হল আমাদের জীবন,' ওরা যখন তীরের কাছাকাছি চলে এসেছে তখন হাত ঘুরিয়ে অনেকখানি দেখিয়ে বললেন মামা। 'তোর পছন্দ হয়?'

'হয়।'

বাঁ তীরের জলপ্লাবিত বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, দূর বনভূমির নীলাভ রেখা, স্রোতের কিলোমিটার তিনেক নীচে নদীর দিকে এগিয়ে আসা পর্বতশ্রেণীসমাকুল খাড়া পাড় কোস্তিয়ার সত্যি সত্যিই পছন্দ হয়।

কিন্তু এ জায়গাটার নাম 'জাঙ্গাল' কেন? এখানে ত কোন বাঁধ-টাঁধ নেই।'

'কে জানে? হয়ত কোন এক কালে ছিল। এখন শুধু জায়গাটার ঐ নাম রয়ে গেছে। আর ঐ ওখানে খাড়া পাড়গুলোর পেছনে আছে গ্রাম। ওখানে নিউরা পড়াশুনা করে, আর নৌচলাচলের সময় যখন শেষ হয়ে যায় তখন আমিও গ্রামে উঠে আসি।'

'ওখানে সব সময় বাস করেন না কেন?'

'সম্ভব নয়। ওখানে, গাঁয়ের কাছাকাছি জায়গাটা সাধারণ, সহজ, স্রোত শান্ত, কিন্তু এই জায়গাটা কঠিন। ঐ যে ওখানে দ্যাখ,' মামা বাঁ পাশে উজান বরাবর খানিকটা দূর দেখিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুই ভাবছিস ওখানে নদীর পাড় আছে? ওখানে আছে দ্বীপ, আর তার ওপারে — 'মজা খাঁড়ি', মরা নদীখাত আর শাখানদী, আরও উজানে — আবার একটা দ্বীপ, আরও একটা শাখানদী।'

'তাতে কী হয়েছে? ক্যাপ্টেনরা ত জানে কোন্ দিকে বাইতে হবে।'

'ক্যাপ্টেনরা ত — তারা জানে বটে, কিন্তু নদী জানে না কোথায় সে যাবে।'

'কিন্তু নদী ত সব সময় একই ভাবে বয়।'

'না রে ভাই,' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ হেসে বলেন, 'জানে না বলেই ত যত গোলমাল। ঐ যে ওখানে, আরও উজানের দিকে, আগে স্টীমার যাতায়াত করত বাঁয়ের শাখানদী ধরে, 'মজা খাঁড়ির' ওপর দিয়েও যেতে পারত — ওটা ফের জলে ভেসে যায়, কিন্তু হালে চেষ্টা করে দেখা গেছে — একটা ত চড়ায় এসে ঠেকে: বানের জলে গিয়ে পড়েছিল। নদী হল এক ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো — ওর চালচলন টের পাওয়া ভার। এখন জাহাজ চলাচলের পথটা গেছে এখান দিয়ে, পরে দেখবি চড়া ভেসে যাবে, তখন ওটা সরে যাবে বাঁ তীরের দিকে।'

কোস্তিয়া শান্ত নদীবক্ষের দিকে তাকায়, তার মনে সন্দেহ জাগে। দেখে আদৌ মনে হয় না

ক্ষিপ্ত, উদ্দাম ঘোড়ার মতো এপাশে-ওপাশে লম্ফঝম্প করতে পারে। এই ত বয়ে চলেছে ত চলেইছে। এখন বইছে, গতকালও বইত, এক বছর আগে এবং একশ' বছর আগেও। আগে নীপার কসাকদের আমলেও ছিল, আরও অনেক কাল আগে — কিয়েভ রুস্-এর রাজা জ্ঞানী ইয়ারস্লাভ আর ভ্লাদিমিরের কালেও ছিল। এই এত কালের মধ্যে তাকে জানা যায় নি, নামতার মতো লোকে তাকে মুখস্থ করে ফেলতে পারে নি — এটা কী করে সম্ভব ? এ ত আর সাগর নয়...

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বোধ হয় কোস্তিয়ার মনের ভাব আন্দাজ করতে পেরেই মৃদু হাসলেন।

'জায়গাটা অবশ্য তেমন চওড়া নয়, স্বচ্ছন্দে এপাশ-ওপাশ করার উপায় নেই। কিন্তু এতে ব্যাপারটা সহজ হচ্ছে না, বরং আরও কঠিনই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঐ যে দেখছিস একটু দূরের উজানের ঐ জায়গাটার কথা বলছি আমি,' এই বলে তিনি দেখালেন। 'দেখছিস ত ঐ লাল বয়াটা। ওখানে বাঁ তীর ঘেঁষে চলেছে গভীর স্রোত, তারপর চড়ায় ঠেকে ওটা সরে যায় দ্বীপের দিকে, আর সেখান থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো... আসে এই বয়াটায়। বেশ ত ? কিন্তু বেশ আর তেমন বলি কী করে ? বয়াটা দাঁড়িয়ে আছে একটা পাথরের সারির ওপর — আমাদের ভাষায়, 'বেড়া'। ওখানে একটা পাথরের চাঁই আছে যাকে আমরা বলি 'শয়তানের দাঁত'। এমনই পাথর যার গায়ে লেগে যে-কোন জিনিস ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। অথচ স্রোতটা বয়ে গেছে সোজা তার গায়ের ওপর। ঐ যে জল ওখানে কেমন ঝলকাচ্ছে — ওর ওপর খেলা করছে। বানের জল যখন আসে তখন কিছু নয়, কিন্তু জল নেমে গেলেই ক্যাপ্টেনকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে: লাল বয়া দেখেছ কি অমনি বাঁয়ে পথ ধর, নইলে গতিক খারাপ। এমনই হল নদী ! ওর দিকে নজর রাখা চাই। ওর দিকে লোকে নজর রাখেও, ওকে যা খুশি তাই করতে দেয় না।'

'ওর ওপর নজর রাখা কী করে সম্ভব ?'

'বিশেষ ধরনের চাকরী আছে: আছে ক্যাপ্টেন, আছি আমরা, যারা বয়ার তদারক করি। যাত্রীদের কাছে সব সমান — এখানে জল, ওখানে জল। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকে সব দেখতে পায়: কোথাও হয়ত নদী দেখতে বেশ শান্তই, ওপরটা সমান, কিন্তু তার ভেতরটা পুরো পাক খাচ্ছে, তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে — ওখানে আছে চোরাঘূর্ণি; কোথাও নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউ খেলতে শুরু করেছে — সেখানে হয়ত দেখবে স্রোত বয়ে গেছে অল্পজলের ওপর দিয়ে নয়ত বা চড়ারই ওপর দিয়ে। তাই যেখানেই দেখা যায় অল্পজল কিংবা চড়া সেখানে আমরা ওগুলো বোঝাবার জন্য লম্বা লম্বা থাম বসাই, বয়া বসাই — তার মানে হল এই জায়গাটা বিপজ্জনক, এটার পাশ কাটিয়ে যাও।'

'তাহলে ওগুলো বসালে আর কোন বিপদ থাকে না ?'

'হ্যাঁ, তখন ত থাকেই না। দিনের বেলায় থাম আর বয়া, রাতে বয়ার ওপরকার আলো আর এপার-ওপার চলাচলের রাস্তায় থামের ওপরকার আলো পথ দেখায়। একমাত্র তখনই ক্যাপ্টেন সাহস করে স্টীমার চালাতে পারেন। ঠিক ঠিক চালাতে পারলে কিছুই ঘটবে না।'

'অমনিতে কখনও কি কিছু ঘটে না ?'

'কী আর ঘটতে পারে ?'

'এই ধরুন জাহাজডুবি...'

মামা অবাক হয়ে কোস্তিয়ার দিকে তাকালেন, মুখ থেকে পাইপটা বার করে এমন গমগম আওয়াজ তুলে অট্টহাসি হেসে উঠলেন যে ওলটানো ডিঙিটার ওপর বসে থাকা ছাতার পাখিটা ভয়ে ডানা ঝাপটা দিয়ে আকাশে উড়ে গেল, জোরে কিচিরমিচির করতে করতে দূরে উড়ে পালায়।

'জাহাজডুবি ?.. অতদূর গড়াতে দেবে কে শুনি ?'

'বা, হয় না ! এই যেমন রেললাইনে, রেল ভেঙে গেল, কিংবা আরও কোন ঘটনা...'

'আমাদের এখানে রেল-টেল নেই, আর নদী — তার ভাঙার কোন প্রশ্ন ওঠে না,' মামা হাসতে হাসতে বললেন। 'তুই অমন রক্তলোভী কেন রে ? — দুর্ঘটনা বুঝি দরকার তোর ?'

'না না... অমনি... বলছিলাম কি, আপনাদের এখানে মনে লাগার মতো ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটে ?'

'আমাদের এখানে সবই মনে রাখার মতো।'

'হুঁ তা ত ঠিকই ! আচ্ছা, সব ত বসালেন, তারপর ? তারপর কী ?'

'তারপর এগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জলের গভীরতা মাপতে হবে, বয়ার আলো জ্বালাতে হবে, সকালে ফের নেভাতে হবে। সরঞ্জাম ঠিক রাখতে হবে...'

'আচ্ছা, বয়ার ঐ যে বাতি ওগুলো কেরোসিনের কেন ? তার চেয়ে ইলেকট্রিক বাতি ভালো নয় কি ?'

'এর চাইতে ভালো সে ত জানা কথাই। নীপারের বুকে কোন কোন জায়গায় ইতিমধ্যে ইলেকট্রিক এসে গেছে। কালে আমাদের এখানেও ইলেকট্রিক বাতি হবে, তবে আপাতত কেরোসিন বাতিগুলোকেই ঠিকঠাক রাখতে হয়। আর শুধু কি তাই ? কাজের কমতি নেই... এই ত আমরা এখন কাজে লেগে যাব। আচ্ছা, জলে ভেসে আসা ঐ কাঠকুটোর গাদাটা এখানে টেনে নিয়ে আয় দেখি।'

জলের স্রোতে ডালপালা, শিকড়বাকড় আর ভাঙা কাঠের এটা-ওটা টুকরো তীরে ভেসে এসে স্তূপাকার হয়ে জমেছে, জুনমাসের প্রখর রোদে সেগুলি অনেকক্ষণ হল শুকিয়ে গেছে। কোস্তিয়া স্তূপটাকে টেনে টেনে কাছে নিয়ে এলো। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ ধুনি জ্বালালেন, তার ওপর চাপালেন আলকাতরার ডেকচি। কোস্তিয়া কটুগন্ধী কালো আলকাতরা মেশাতে থাকে, এদিকে মামা ফেঁসো দিয়ে তৈরি করতে লেগে যান আলকাতরা লাগানোর ছোট ব্রাশ — তার তুলিটা চওড়া আর হাতলটা খাটো।

'আমি ? আমি ?' গড়ানে ঢাল বয়ে গড়গড় করে ছুটে আসতে আসতে চেঁচিয়ে বলল নিউরা। 'বাবা, তুমি যে কথা দিয়েছিলে আমরা একসঙ্গে করব ! আমি আর কোস্তিয়া ! অ্যাঁ ?

হাসছ কেন তুমি বাবা ? ভাবছ আমরা পারব না, অ্যাঁ ? ঠিক করব দেখে নিও — এর চাইতে ভালো আর হবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা !' বলতে বলতে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ আরও একটা ব্রাশ বানাতে লেগে যান।

শিখে নিবি

আলকাতরা ফুলে ওঠে, বড় বড় বুদ্বুদ তোলে, তারপর ফুটন্ত দুধের মতো টগবগ করে ডেকচিতে উথলে উঠতে থাকে। কোস্তিয়া আর নিউরা ডেকচির আঙটার নীচ দিয়ে একটা মোটা লাঠি গলিয়ে ধূমায়মান ঝোল বয়ে নিয়ে যায় নৌকোর দিকে।

'এই যে এটা তোমার দিক। অ্যাঁ ? আর এটা — আমার। সেখা যাক কে কত তাড়াতাড়ি আর কত ভালো করতে পারে।'

আরে এ আর এমন একটা কী কাজ ! এটা ত কোস্তিয়া পারবেই ! রঙকরা মিস্ত্রীকে সে দেখেছে তেলরঙ দিয়ে তাদের বাড়ির সিঁড়ির দেয়াল রঙ করতে। কাজটা খুবই সহজ।

কোস্তিয়া ফুটন্ত আলকাতরার মধ্যে ব্রাশটা ডুবিয়ে নিয়ে ঐ রঙকরা মিস্ত্রীর কায়দায় লম্বা লম্বা পোঁচ দিতে থাকে। ব্রাশ চলার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা আলকাতরা মৃদু জবজব আওয়াজ তুলে চকচকে বার্ণিশের প্রলেপ দিয়ে চলে। কোস্তিয়া ফের ব্রাশটা ভিজিয়ে নিয়ে আরও লম্বা পোঁচ দেয়। এদিকে নিউরা সমানে একটা জায়গায় খুচখুচ করছে।

'এতে চলবে না !' কোস্তিয়ার কাছে এগিয়ে এসে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বললেন।

'কেন ?' কোস্তিয়া ক্ষুণ্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তুই ওপর ওপর পোঁচ লাগাচ্ছিস, কিন্তু লাগাতে হবে এমন ভাবে যাতে প্রত্যেকটা ফাঁকফোকর আলকাতরায় বন্ধ হয়ে যায়। চেয়ে দ্যাখ।'

কোস্তিয়া পোঁচ মেরে যে সুন্দর জেল্লা তুলেছিল তার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। তলার যে অংশটিতে সে সবে রঙ লাগিয়েছিল তা ফুসকুড়িতে ছেয়ে গেছে, ফুসকুড়িগুলি ফেটে ফেটে যেতে সর্বত্র দেখা দিতে লাগল বসন্তের দাগের মতো কুৎসিত দাগ। কোস্তিয়া পোঁচ লাগিয়ে সেগুলি লেপে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু আলকাতরা এখন আর সমানভাবে এসে লাগে না, এবড়োখেবড়ো, ডোরা ডোরা দাগ পড়ল।

কোস্তিয়া মন দিয়ে লক্ষ করে দেখে নিউরা যেমন করছিল নিজেও তেমনি করতে থাকে: সমস্ত কোটর আর ফাঁকফোকরের মধ্যে ঘসে ঘসে পুরু করে আলকাতরা লাগায়। স্রেফ তুলি বুলিয়ে যাবার চেয়ে এই কাজটা ঢের কঠিন। কোস্তিয়া তাড়াতাড়ি হয়রান হয়ে পড়ে, ফলে তার কাজ হতে থাকে আগের মতোই খারাপ। অথচ নিউরার কোন বিকার নেই। জিভের ডগা দিয়ে ওপরের ঠোঁট

চেপে, চোখের ওপর পড়ন্ত চুলের গোছা অনবরত বাঁ হাতে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে সে আলকাতরা লাগিয়ে চলেছে।

'আমি প্রথমে শেষ করেছি! আমি প্রথমে শেষ করেছি!' হাতের ব্রাশ নাচাতে নাচাতে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বলল সে। কিন্তু কোস্তিয়ার মুখ ভার দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে সুর পালটে ফেলল, ফের চলল তার কথার তোড়: 'এসো একসঙ্গে করি। অ্যাঁ? আমি তোমাকে সাহায্য করব, তুমি — আমাকে। ঠিক আছে? পরে কাজ শেষ হলে বাবাকে বলব এই নৌকোটা আমাদের দিতে। একা আমাকে দেবেন না। দু'জন হলে দেবেন। তুমি নৌকো বাইতে পার ত? পার না? খুবই সোজা। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব...'

ওরা আলকাতরা মাখানো শেষ করল। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ কাজটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন কোন্ কোন্ জায়গায় গলদ আছে। লজ্জায় কোস্তিয়ার মুখ লাল হয়ে ওঠে: গলদগুলো তারই ভাগে।

'অত খুঁতখুঁত করো না, বাবা, আমরা নিজেদের বিবেকবুদ্ধি মতো কাজ করেছি স্তাখানভপন্থীদের* মতো!'

'কিন্তু বিবেকবুদ্ধি দিয়ে ত ফাঁকফোকর জোড়া দেওয়া যায় না, জোড়া দিতে হয় আলকাতরা দিয়ে।'

'আচ্ছা, এক্ষুনি জুড়ে দিচ্ছি! কিন্তু তুমি কী কথা দিয়েছিলে মনে আছে ত? কথা ছিল নৌকো দেবে? দেবে ত? অ্যাঁ?'

'যদি তোমরা ডুবে যাও?'

'আমরা ডুবে যাব? অ্যাঁ?' নিউরা দারুণ খেপে গিয়ে শূন্যে বিনুনি দুলিয়ে এমন এক ঝটকা মারল যে মনে হল বিনুনি বুঝি ছিঁড়েই পড়ে যায়। 'বাঃ আমি যে বুক-সাঁতার দিয়ে 'মজা খাঁড়ি' পেরোলাম! তোমার মনে নেই বুঝি? অ্যাঁ? আর কোস্তিয়া — ওর কথা আর কী বলব! জলে কেমন ঝাঁপ মারে জান? অমন আমিও পারি না... এই যে কোস্তিয়া, দেখাও না! বাবা যেন মনে না করেন...'

'এক্ষুনি, এই মুহূর্তে ওর চান করার দরকার বৈকি! দাগটাগ লেগে যা দশা হয়েছে ওর!' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ হাসতে হাসতে বলেন।

'এই রে!' নিউরা গালে হাত দিয়ে বলল। 'শিগগির, শিগগির এসো, বালি দিয়ে ঘসে ওঠাই, নইলে জমে শক্ত হয়ে যাবে!'

---

* স্তাখানভপন্থী — খনিকর্মী আলেক্সেই স্তাখানভের নাম থেকে এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি। ১৯৩৫ সালে স্তাখানভ কয়লাখনিতে এক অভূতপূর্ব রেকর্ড স্থাপন করেন: তিনি তাঁর বীরত্বপূর্ণ শ্রমের আদর্শে যেমন কলকারখানার, তেমনি কৃষি অর্থনীতিরও বহু কর্মীকে অনুপ্রাণিত করেন। — সম্পাঃ

নিউরা খপ করে কোস্তিয়ার হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল জলের দিকে। ভিজে বালি দিয়ে ঘসে ঘসে আলকাতরার দাগ ওঠাতে গিয়ে শেষকালে কোস্তিয়ার চামড়ায় অসহ্য জ্বলুনি শুরু হতে থাকে, তবু আলকাতরা পুরোপুরি ঘসে তোলা সম্ভব হল না।

'ও কিছু নয়,' নিউরা সান্ত্বনা দিয়ে বলল। 'একবার আমি অসাবধানে আলকাতরার ওপর বসে পড়েছিলাম, আমার ফ্রকটা আলকাতরায় আটকে গিয়েছিল — সে দাগ অবধি কেচে সাফ হয়ে গেছে। আর চামড়া থেকে ত আপনা-আপনিই চলে যাবে।'

দুপুরের খাবারের পর ওরা নৌকোটাকে উলটে ঠিক করে নিয়ে ঠেলে জলে নামাল, কিন্তু নৌকো চড়ে ঘোরার অনুমতি এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ ওদের দিলেন না: বাতাসে জলে বেশ ঢেউ খেলছে, তিনি দেখলেন বাচ্চাদের একা একা ছাড়াটা ঠিক হবে না। ওদের দুঃখ দেখে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন:

'সন্ধ্যাবেলায় আমি আমার কাজের জায়গা তদারক করতে বেরোব, তখন তোমরাও আমাদের সঙ্গে যাবে।'

সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক দেরি। নিউরা তাড়াতাড়ি বাড়িতে ছুটে গিয়ে রাতের খাবারের জন্য আলুর খোসা ছাড়ানোর কাজে লেগে গেল। নদীর ধারে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর কোস্তিয়া নিউরার কাছে এসে তাকে সাহায্য করতে গেল, কিন্তু সে যে-ভাবে খোসা ছাড়াল তাতে বিশাল একটা আলু থেকে এতই ছোট বাদামের সমান টুকরো অবশিষ্ট থাকল যে নিউরা অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে বলল:

'এ আবার কেমনধারা লোক তুমি, কিছুই করতে পার না? কোন দিন খোসা ছাড়াও নি বুঝি, অ্যাঁ? তোমাদের বাড়িতে কে খোসা ছাড়ায়, মা? তুমি ওঁকে সাহায্য কর না বুঝি?'

কোস্তিয়া মুখ ভার করে চলে যায়। হুঁঃ, কী — না আলু! ও তার চাইতে ঢের গুরুত্বপূর্ণ আর কঠিন কঠিন কাজ করতে পারে।

কিন্তু সে সবই রয়ে গেছে কিয়েভে, তাদের বাড়িতে, এখানে কোস্তিয়া নিজেকে নিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না, সে মামার কাছে চলল। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বয়ার জন্য বাড়তি ক্রস বানাচ্ছিলেন। পাড়ে সারি সারি কতকগুলি বয়া রাখা আছে, কিছু দূরে দুটো খুঁটির মাঝখানে কড়িকাঠের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডোরাকাটা কতকগুলি থাম।

'কী রে, মনমেজাজ খারাপ নাকি? করার কিছু নেই বুঝি? এই যে কাজ কর, খুঁটিগুলোর গোঁজ ছুঁচলো করে চাঁছ।'

হ্যাঁ, এই না হলে মরদের কাজ! তা নয় ত — আলু!

কোস্তিয়া সানন্দে কাজে হাত দিল। আর কুড়ুলটাও কী সুবিধের — হালকা, ধারাল, হাতলটা ধনুকের মতো বাঁকানো, মসৃণ, যেন পালিশ করা।

'মাটিতে কোপ মারছিস কেন রে?' মামা জিজ্ঞেস করলেন। 'মাটি যতই কাটিস না কেন

কেটে ফালা ফালা করতে পারবি না, কিন্তু কুড়ুলটা ভোঁতা করে ফেলবি। কুঁদোয় ঘা মার, লেগে যা।'

গাছের মোটা ডালটার ওপর ঘা মারতে গিয়ে কুড়ুলটা বাস্তবিকই বারবার ফসফস করে এসে পড়ছিল মাটিতে। কোস্তিয়া ডালটার নীচে গাছের কাটা গুঁড়ি রাখল। এবারে কিন্তু ডালটা গুঁড়ি থেকে হড়কে যেতে থাকে, বারবার ঠিক জায়গায় এনে রাখতে হয়।

'আরে এই ভাবে কর,' বলে মামা মোটা ডালটাকে খাড়া করে দেন কড়িকাঠের গায়ে, তার নীচে ঠেক দিয়ে রাখেন গাছের কাটা গুঁড়ি। 'এই ত বেশ জুতসই হল।'

অবশ্যই অনেকটা জুতসই হল। কোস্তিয়া এক হাতে খুঁটিটা ধরে রাখে, অন্য হাতে চাঁছে। কিন্তু কুড়ুলটা গোড়ায় যেমন জুতসই মনে হয়েছিল আদৌ তেমন নয়। কখনও পাতলা ছিলকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছলে যায়, গাছের গুঁড়িটার ওপর এসে পড়ে, কখনও বা ডালের গায়ে এমন ভাবে আটকে যায় যে অতিকষ্টে টেনে বার করতে হয়। তাছাড়া ওটা মোটেই তেমন হালকা নয়, প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ভারী হয়ে উঠছে। তার ভারে কোস্তিয়ার কনুই কনকন করতে থাকে, তা সত্ত্বেও সে চেঁছে চলে, গোঁজ চোখা করতে থাকে। আগাটা হয়ে উঠছে কাটা লেজের মতো, ভোঁতা, খাওয়া-খাওয়া, দেখে মনে হয় কুড়ুল দিয়ে চাঁছা ত নয় যেন হাতুড়ি দিয়ে থেঁতানো।

'ও কিছু নয়, শিখে নিবে,' মামা বললেন।

কোস্তিয়ার কাছ থেকে কুড়ুলটা নিয়ে মামা কয়েকটা ঘায়ে লম্বা মোটা ছিলকে ছাড়ান। আগাটা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে ওঠে লম্বা, সরু আর মসৃণ।

'দারুণ!' কোস্তিয়াকে স্বীকার করতে হয়।

'এ আর এমন কী হল! কুড়ুল দিয়ে আমি তেমন পারি না। হ্যাঁ আমার দাদু, মানে তোর দাদুর বাবা — যাকে ওস্তাদ বলে তা-ই ছিলেন তিনি! কত কুটিরই যে বানিয়েছেন তার কোন লেখাজোখা নেই। কুড়ুল দিয়ে কাঠের ওপর এমন নক্সা বানাতেন — ঠিক যেন এম্ব্রয়ডারী! আর তেমন দরকার পড়লে কুড়ুল দিয়ে দাড়িও কামাতে পারতেন...'

মামা বর্ণনা দিলেন কী ভাবে তাঁর দাদু বাজী রেখে শুধু কুড়ুলের সাহায্যে একটা দেরাজ বানান, এদিকে কোস্তিয়া ব্যথা-টনটনে কনুইয়ে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবতে থাকে।

'যাই বলুন না কেন, এটা হল সাবেক আমলের জের,' শেষকালে সে বলল।

'কী?'

'কুড়ুল। পিছিয়ে-পড়া কৌশল। কমিউনিজমের কালে কি আর থাকবে? কমিউনিজমে এমন হবে যে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিরোধ থাকবে না। অথচ এখানে কী দেখা যাচ্ছে? স্রেফ কায়িক।'

'জানি না, কমিউনিজমে কেমন হবে। যে যেমন ভাবে, আমার কিন্তু বেশ লাগে এই সাবেক আমলের জের। কাজের জিনিস! অবশ্য যদি সত্যিকারের হাতে পড়ে। কায়িক শ্রমের

বেলায় মাথা থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। হ্যাঁ তা-ই। সমস্ত শ্রমের ক্ষেত্রেই যেমন হয়ে থাকে।'

এই কথাটার ভেতরে কোস্তিয়া তার আনাড়ীপনার প্রতি ইঙ্গিত ধরতে পেরে চুপ করে যায়, কিন্তু নিজের মত বহাল সে রাখে।

অবশেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। নিউরা ও কোস্তিয়া নৌকোয় লণ্ঠন নিয়ে এলো, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ দাঁড় ধরলেন, ওরা নৌকো ছেড়ে দিল।

'আচ্ছা এসো, এরকম করা যাক,' নিউরা হুকুমের সুরে বলল, 'প্রথমে আমি বাই, তুমি দেখ, তারপর আমরা একসঙ্গে বাইব। অ্যাঁ ? তুমিও শিখে নেবে। তেমন একটা কোন হাতি-ঘোড়া ব্যাপার নয়। এই দেখ না।'

নিউরা জিভের ডগা দিয়ে ওপরের ঠোঁট চেপে নৌকোর হাতল ধরল, মাথাটা অনেকখানি পেছনে হেলিয়ে দিয়ে শুরু করল দাঁড় টানতে। দেখতে দেখতে নিউরার দুপাশের রগের ওপর আর নাকের দুই খাঁজে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম, কিন্তু বকবকানি তার থামে না:

'দেখলে ত, খুবই সোজা। আমি ঝুঁকে পড়লাম। অ্যাঁ ? দাঁড় ওঠালাম। তারপর দাঁড় নামিয়ে বাইতে থাকি, সহজ, সত্যি কিনা ?'

'ঠিক আছে, দে এবারে আমি বাই,' কোস্তিয়া বলল। 'না না, আমি নিজেই বাইব, তুই আমার জায়গায় বোস।'

নৌকোয় কোস্তিয়া এর আগে কয়েকবার চেপেছে বটে, কিন্তু দাঁড় টেনেছে কেবল একবার, তাও আবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্য — প্রথম পরীক্ষাটা তেমন সাফল্যেরও হয় নি: মা'র নতুন পোশাকে জল ছিটিয়ে দেয় বলে তার কাছ থেকে দাঁড় ছিনিয়ে নেওয়া হল। কিন্তু এখন নিউরার হাতে স্বচ্ছন্দে ঝটপট দাঁড় উঠতে, নৌকো তরতর করে এগিয়ে যেতে দেখে সে মনে মনে বিবেচনা করল যে কাজটা বাস্তবিকই তুচ্ছ।

কোস্তিয়া দাঁড় ধরে, পা ফাঁক করে জাঁকিয়ে বসে। হেঁইও ! হাতল অবধি দাঁড়দুটো চলে যায় জলের ভেতরে, কোস্তিয়া অতিকষ্টে দাঁড় টেনে ওঠায়। অত গভীরে চালানোর দরকার নেই। ঝপাং ! দাঁড় ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথার ওপর আছড়ে পড়ে, দড়াম করে এসে ঘা খায় নৌকোর গায়ে। আচ্ছা, এইবারে বোঝা গেল — তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। সে দাঁড় অনেক দূর উঠিয়ে সন্তর্পণে নামায়, কিন্তু একটা দাঁড় কেন যেন ঘুরে যায় ধারালো পাখনা দিয়ে আলতো করে জল কাটে, টানা যায় না, অন্য দাঁড়টা নেমে যায় গভীরে, জলের ভেতরে ঘুরপাক খায়, আর নৌকো সাঁ করে একপাশে সরে যায়।

লজ্জায় আর প্রবল চেষ্টার ফলে কোস্তিয়ার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, সে ভ্রূকুটি করে নিউরা ও মামার দিকে তাকাল। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ পরম নিশ্চিন্তে পাইপ ফুঁকতে থাকেন, এমন কি কোস্তিয়া যখন জল ছিটিয়ে তাঁকে আপাদমস্তক ভিজিয়ে দেয়, তখনও তিনি নির্বিকার, এদিকে

নিউরা উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ করতে থাকে দাঁড়ের গতিবিধি, তার মুখের সজীব রেখায় কোস্তিয়ার প্রতিটি প্রয়াসের ছাপ পড়ছে — দেখে মনে হচ্ছে যেন কোস্তিয়া দাঁড় বাইছে না, বাইছে সে নিজে। ওর সহানুভূতিতে কোস্তিয়ার ভারী বয়ে গেছে! কোস্তিয়া আরও বেশি চেষ্টা করে, কিন্তু চেষ্টা যত বেশি করে অবস্থা ততই শোচনীয় হতে থাকে। গোড়ার দিকে দাঁড়গুলো হালকা মনে হচ্ছিল, এখন কিন্তু সেগুলো ক্রমেই ভারী হয়ে উঠতে লাগল, যেন সীসায় ভরপুর হয়ে আসছে আর থেকে থেকে তাল করছে হয় জলের মধ্যে ঘুরে যাবার নয়ত বা হাত থেকে ফসকানোর। জল হয়ে আসছে ঘন, পঙ্কিল, যেন দাঁড় আঁকড়ে ধরছে: যে নৌকো এতক্ষণ ছোট আর হালকা বলে তার মনে হচ্ছিল সেটা এখন মনে হচ্ছে যেন এক বিশাল গুরুভার গাধাবোট। কোন দাঁড়ের সাধ্য নেই এটাকে নড়ায়, যন্ত্র ছাড়া কোন গতি নেই। এদিকে আবার মার্টিন পাখির দল বিদ্রূপের সুরে কিচিরমিচির করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

'হয়েছে!' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নির্দেশ দিলেন। 'এখানে একার সাধ্যে কুলোবে না: বেশি স্রোতের শুরু। দু'জনে বোস।'

কোস্তিয়া ধীরে ধীরে দম নেয় — ইতিমধ্যে সে একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছে। নিউরা পাশে এসে বসল, ওরা দু'হাতের মুঠোয় যার যার দাঁড়ের হাতল চেপে ধরল।

'আচ্ছা, এইবারে হুকুমমতো: এক — দাঁড় নামাও, দুই — শুকাও, তার মানে জল থেকে ওঠাও। রেডি? এ-এক — দুই! এক — দুই!'

দু'জনে অবশ্যই অনেকটা সহজ। তবে সত্যি বলতে গেলে কি এখনও দাঁড় কোস্তিয়ার তেমন একটা বশ মানছে না — কখনও ঝপাং করে গভীর জলে গিয়ে ডুবছে, কখনও বা জলের ওপর ওপর হড়কাচ্ছে, ফলে নৌকো কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে হেলছে, কিন্তু এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ থেকে থেকে হালের দাঁড় ঠেলেন, তাতে নৌকো তরতর করে সামনে এগিয়ে যায়। এবারে কোস্তিয়া বুঝতে পারে স্রোত মোটেই আগের চেয়ে দ্রুত হয়ে ওঠে নি, আসল কথা হল কোস্তিয়া আর পারছে না দেখে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ স্রোতের কথা বলেন, যাতে ওকে ততটা লজ্জার মধ্যে না পড়তে হয়।

অল্প অল্প করে সে যতটা গভীরে দরকার ততটা গভীরে দাঁড় ফেলা রপ্ত করে ফেলল — এই ভাবে দাঁড় বাওয়া যেমন সহজ, তেমনি এতে নৌকো অনেক দ্রুতও চলে — কিন্তু কোস্তিয়া যখন সত্যিকারের দাঁড় টানার স্বাদ পেতে শুরু করেছে এমন সময় এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ হাত তুলে বললেন:

'আর নয়! এবারে ঘোরাতে হবে ওদিকে, সেখানে তোমরা সামলাতে পারবে না, তাছাড়া তোমরা বোধ হয় হয়রানও হয়ে পড়েছ।'

তিনি এসে দাঁড় ধরলেন, নিউরা ধরল হালের দাঁড় আর কোস্তিয়া নৌকোর সামনের গলুইয়ের ওপর শুয়ে পড়ে জলের গতিবিধি দেখতে লাগল। হ্যাঁ, স্রোত বটে এই জায়গাটায়!

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ জোরে জোরে দাঁড় টানেন, জল ফুঁসে উঠে নৌকোর গায়ে এসে গোঁ গোঁ আওয়াজ করে, ঝটকা মেরে প্রবল বেগে সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে নৌকো এক সময় হঠাৎ যেন একটা নরম অথচ দুর্লঙ্ঘ্য দেয়ালে বাধা পেল, তার গতি মন্থর হয়ে পড়ল; আরেকটু হলেই নৌকোকে পেছনে ঠেলে দেয়।

এদিকে 'শয়তানের দাঁত'-এর ওপরকার লাল বয়াটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। স্রোতের মুখোমুখি ওটা ঝুঁকে পড়ে আর সর্বক্ষণ দুলতে থাকে — যেন মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাচ্ছে! মনে হয় কোন এক শক্তি যেন তাকে নীচে, জলের তলায় টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে প্রাণপণ বাধা দিচ্ছে, হার মানছে না। এবারে ওটা একেবারেই কাছে। কোস্তিয়া জলের তলায় পাথরটা নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু গভীর কালো জলের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া ঝলক মারে, এর বেশি আর কিছু চোখে পড়ে না।

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ দাঁড় টেনে টেনে বয়ার দিকে এগিয়ে এলেন, বাতি জ্বালিয়ে বয়ার মাথার ওপর বসিয়ে দিলেন। নৌকো সঙ্গে সঙ্গে দূরে নীচের দিকে ভেসে গেল। গোধূলির আলোর মধ্যে বয়ার লাল আলো নিষ্প্রভ আর ঘোলাটে দেখাচ্ছিল।

এবারে তারা তীরের একেবারে ধার ঘেঁষে উজান ঠেলে এগিয়ে গেল, আরও সামনে গিয়ে কয়েকটি লাল বয়ার ওপর বাতি জ্বালাল, তারপর অন্য দিকে মোড় নিল, স্রোতের দিকে গিয়ে সাদা বয়াগুলি জ্বালানোর উদ্দেশ্যে।

'আচ্ছা, এবারে কিন্তু — আমরা। অ্যাঁ, বাবা ? এবারে আমরাই পারব। তাই না, কোস্তিয়া ?'

নিউরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দাঁড়ের দিকে হাত বাড়াল, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচকে হার মানতে হয়। স্রোতের দিকে দাঁড় বাওয়া ঢের সহজ। এমন কি মোটে না বাইলেও চলে, নৌকো আপনা-আপনি স্রোতের টানে এগিয়ে চলে, কেবল যেদিকে দরকার সেদিকে মুখ করে ছেড়ে দিলেই হল। তাই বলে দাঁড় টানায় তাদের উৎসাহের কোন অভাব দেখা যায় না, আর কোস্তিয়ার হাত ত ক্রমেই দারুণ ভালো হয়ে আসছে। কখন কখন সে মামার দিকে তাকায় — মামা দেখছেন কি কেমন দিব্যি তার ওতরাচ্ছে ? এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ কোস্তিয়ার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। ফিরতি পথে স্রোতের বিপরীত মুখে দাঁড় টানেন এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নিজে, ওরা দু'জনে তখন পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম করে।

'শয়তানের দাঁত'-এর ওপরকার বয়া এখন আর চোখে পড়ে না, কেবল জলের ওপরে লাল আলোটা দুলতে থাকে, মনে হয় যেন স্রেফ শূন্যে ঝুলছে আর দুলছে। ক্বচিৎ যে দু-একটা শঙ্খচিল দেখা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ হল তারা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে, রাতের মতো গা ঢাকা দিয়েছে কোলাহলপ্রিয় মার্টিন পাখির ঝাঁক। জলের বুকে আর জলের ওপরে কোন সাড়াশব্দ নেই। ছোট ছোট তরঙ্গ শান্ত হয়ে মিলিয়ে যেতে নদী আবার হয়ে গেল স্থির, কাচে বাঁধানো। কেবল বৈঠা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ে টুপটাপ আওয়াজ হচ্ছে আর কদাচিৎ একটা মাছ

ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠতে সেই জায়গাটায় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে লহরী।

ছটফটে নিউরা পর্যন্ত যে শান্ত হয়ে পড়েছে তাতে কোস্তিয়া খুশি হল। নিউরা চোখ বড় বড় করে দেখছে ঘুমে ঢলে পড়া নদী, নদীর বুকের আলোকমালা আর মনে মনে কী যেন ভাবছে। কোস্তিয়ার শ্রমজর্জরিত হাতদুটো টনটন করছে, সেও ভাবছে। কী ভাবছে সে? একই সঙ্গে সবকিছু। মা এখন কোথায়? — এতক্ষণে হয়ত বা কাখোভ্‌কাতেই চলে গেছেন। লিওল্‌কা হয়ত মাত্রাতিরিক্ত দুষ্টুমি করার পর এখন পড়শী মহিলা মারিয়া আফানাসিয়েভনার কাছে বকুনি খাচ্ছে আর তাঁর দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন আদৌ কোন অপরাধ সে করে নি; ফিওদর কত মাছ ধরল কে জানে? — টিনের কৌটটা থেকে নতুন যে ফাতনাটা সে বানিয়েছিল তাতে তার আশা সত্য প্রমাণিত হয়েছে কি? কিয়েভ 'ডিনামো' আর 'শাখ্‌তিওর'-এর খেলার ফলাফল কী হতে পারে? — আজ আবার স্টেডিয়ামে ওদের খেলা আছে কিনা! মাকারভ — গোলকিপার বটে! তার ওপর কোস্তিয়ার ভরসা আছে, কিন্তু ফরওয়ার্ডগুলো...

ওঃ এখানে কী শান্ত! কিয়েভে এমন কখনও হয় না। এসবই ভারী চিত্তাকর্ষক — কিন্তু তাহলে কী হবে, এখানে বাস করতে তার আপত্তি আছে। গতকাল যা ঘটেছিল আজও তাই, আবার আগামীকাল — তাও এই আজকেরই মতন। বয়াগুলোও এই একই। ঘুরে ঘুরে জ্বালাও, ঘুরে ঘুরে নেভাও। মোটের ওপর বয়া — এ আবার একটা জিনিস হল! লাইট হাউস হলে না হয় কথা ছিল! সেখানে সমুদ্রের ঝড় উঠলে আর দেখতে হবে না!

'ওঃ কোস্তিয়া! বাবা চেয়ে দেখ, ওর হাতের কী অবস্থা!'

কোস্তিয়ার হাতের তালুতে ফুলে টসটসে হয়ে উঠেছে সাদা সাদা ফোসকা। ফোসকাগুলোর দুটি অনেক আগেই থেতলে গেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে লাল দগদগে নোংরা ঘা। কেবল এখনই তার খেয়াল হল যে হাত চিড়বিড় করছে, ঘায়ের জায়গাগুলো জ্বলছে।

'ও কিছু নয়, সময়ে সেরে যাবে!' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বললেন।

নৌকো ঘস করে বালিতে এসে ঠেকল। নিউরা প্রথমে লাফিয়ে নামল, কোস্তিয়া ও এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নৌকো টেনে ওঠাল, দাঁড় আর বাড়তি লণ্ঠনগুলো উঠিয়ে নিল। প্রায় পুরো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু আকাশে তারা প্রায় চোখেই পড়ে না।

'বৃষ্টিবাদলা হবে বলে মনে হচ্ছে যেন?' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ আকাশের দিকে মাথা তুলে বলেন।

লণ্ঠনের হাতলগুলি কোস্তিয়ার পরিশ্রম জর্জরিত হাতে কেটে বসছে, সে অধীর হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উশখুশ করতে থাকে, অপেক্ষা করে কখন মামা ওর কাছ থেকে লণ্ঠনগুলো নেবেন। 'শয়তানের দাঁত'-এর ওপরকার লাল আলোটা কোস্তিয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে বিদ্রূপভরে চোখ টেপে।

পরের দিন কোন বৃষ্টিবাদল নেই, সূর্য এমন টাটাতে থাকে যে উত্তাপে আকাশ পর্যন্ত নিষ্প্রভ দেখায়। নিউরা আর কোস্তিয়া ঘনঘন নদীর দিকে ছোটে, কিন্তু জল থেকে ডাঙায় উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই মুহূর্তের মধ্যে গা শুকিয়ে যায়, আবার জলে নামতে ইচ্ছে করে।

'ওহে বেঙাচিরা, আর জলে দাপাদাপি নয়!' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ চেঁচান। 'একেবারে নীল হয়ে গেলি যে তোরা!'

'ওমা, সত্যিই ত কেমন যেন ঠাণ্ডা লাগছে!' দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে বলল নিউরা। সে রাস্তার পাশের একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের নাকের ওপর আটকাল। 'যাতে জ্বলে না যায়,' সে বলল। 'নয়ত ছাল ওঠা নাক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে — বুড়িদের মতো রুমাল দিয়ে মাথা জড়িয়ে রাখে আর মুখে ননী মাখে, যাতে মুখ রোদে তেতে না যায়। একবার বাগানে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল — অ্যাঁ? — একটা বেড়ালছানা এসে সব ননী চেটে খেয়ে ফেলেছিল। হাসির কথা, তাই না? ছেলেমেয়েরা ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে, বলে যে এর পরের বার শুয়োর এসে ওকে খেয়ে ফেলবে স্যাণ্ডউইচ ভেবে... তোমাদের ক্লাসের মেয়েরা কেমন? ভালো?'

'আমাদের ক্লাসে মেয়ে নেই।'

'সে কেমন কথা? তারা তাহলে কোথায়?'

'ওরা আলাদা পড়ে, অন্য ইস্কুলে। ছেলেদের ইস্কুল আর মেয়েদের ইস্কুল। বুঝলি ত?'

কিন্তু নিউরা বোঝে না। ছেলেরা আর মেয়েরা একসঙ্গে পড়বে এতে খারাপের কী আছে? এর কারণ কি এই যে যাতে ওরা মারামারি না করে? কিন্তু কোথায়, ওরা ত মারামারি করে না, যদিও ওদের ক্লাসে সেন্‌কা গুজের মতো ছেলেও আছে, যাকে অনেক আগেই উত্তম-মধ্যম দেওয়া উচিত, আর নিউরা সুযোগ পেলে তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়েও থাকে... তবু মোটের ওপর একসঙ্গে ভালো, অনেক মজা আছে তাতে। হুঁঃ, সে ছেলেদের কাছে কোন ব্যাপারে হার মানার পাত্রী নয়। ওদের ক্লাসে একমাত্র জিপসী মিশা ওর মতন ভালো পড়াশুনা করে। একসঙ্গে পড়াশুনা করার মধ্যে খারাপের কী আছে?

কোস্তিয়া কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না, ও নিজেই জানে না কেন এমন ব্যবস্থা।

' 'গর্জন খাতে' যাই কী বল?' নিউরা বলল।

'চল্। আচ্ছা ওটার নাম 'গর্জন খাত' কেন?' কোস্তিয়া ছুটতে ছুটতেই জিজ্ঞেস করল।

'জানি না। হয়ত এইজন্যে যে ওর ভেতর দিয়ে যখন জল যায় তখন দারুণ গর্জন হয়। বসন্তকালে কিংবা বর্ষার সময় জান কেমন খেপে ওঠে! পারাপারের কোন উপায় থাকে না — কেবলই গরগর আর গরগর!..'

'ওঃ, তোর পা যা লম্বা লম্বা! তোর নাগাল ধরা যায় না কোনমতে...'

'ওহো!' খুশিভরে হাসে নিউরা। 'আমি কেমন দৌড়াই জান? কেউ আমার নাগাল ধরতে

পারে না। আমাদের যখন প্রতিযোগিতা হয় না — অ্যাঁ ? — আমি বরাবর ফার্স্ট হই। এমন কি ক্লাস সেভেনেরও কেউ দৌড়ে আমাকে হারাতে পারে না। আমাদের ব্যায়ামের মাস্টারমশাই সেমিওন সেমিওনিচ বলেন যে আমার পায়ে নাকি দারুণ প্রতিভা। আমার কিন্তু হাসি পায় — পায়ের আবার কী প্রতিভা হতে পারে ? প্রতিভা হয় লোকের। অ্যাঁ ? তোমার কি প্রতিভা আছে ?.. আমি কিন্তু জানি না। আমার ত মনে হয়, আমার ওসব নেই...'

আলাপ করিয়ে দিই !

'গর্জন খাত' কোনমতেই তার নামের সার্থকতা প্রমাণ করে না। গভীর খাত, খাড়া হয়ে নেমে গেছে এঁটেল জমির ঢাল — জায়গাটা নির্জন, গরমে সেখানে টেকা দায়। তলদেশে আঁকাবাঁকা ফাটল, ঢালের গায়ে কেবল ওপরের দিকে জন্মেছে অল্পস্বল্প ঘাস, আর নীচের দিকটা স্রোতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধাপে ধাপে খাড়া হয়ে গেছে।

'এই যে দেখ !' খাতের তলায় দৌড়ে নেমে গিয়ে দু'হাত উঁচিয়ে বলল নিউরা। 'এখানে যখন জল আসে তখন আমার হাত সমান উঁচু হয় !'

'তার মানে তোমাদের তখন দ্বীপে থাকার মতন অবস্থা: তোমাদের কোথাও যাবার উপায় নেই, তোমাদের কাছেও কেউ আসতে পারে না।'

'হ্যাঁ ! না, নৌকোয় চেপে যাওয়া যায় নীপারের ওপর দিয়ে, কেবল অনেক দূর আর কি। তাছাড়া ওখানে, উজানের দিকে কিলোমিটার আণ্টেক দূরে খাতের ওপর ব্রিজ আছে, সেখানে রাস্তা... ওঠা যাক, কেমন ? এই বারে দেখতে পাবে,' খাতের উঁচু চড়াই বয়ে গুঁড়ি মেরে উঠতে উঠতে বলল সে !

কোস্তিয়ার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল, সে হাঁফাতে হাঁফাতে নিউরার পিছু পিছু চলল। উপরে ওঠার পর যে দৃশ্য দেখতে পেল তাতে সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

পাহাড়ের ঢাল বয়ে উপত্যকার দিকে চলেছে অজস্র চেরি বাগিচার সারি, কেবল সেগুলির মাঝখানে কোথাও কোথাও চোখে পড়ে কুটিরের সাদা দেয়াল, মাথা উঁচিয়ে আছে পপলারের গভীর কালো কালো চূড়া। দূরে, নীচের দিকে, তীরের গায়ে বয়া-তদারককারীর খেলঘরের আকারের ছোট্ট বাড়িটা। রোজ উইলোর হলুদ বিনুনি পাকিয়ে, ঘন কেশর ফুলিয়ে দ্বীপ ঢুকে পড়েছে নদীর ভেতরে। 'মজা খাঁড়ির' ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে দীর্ঘশাখা উইলো গাছগুলি, অসহায় ভঙ্গিতে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে তাদের বিনুনি, আর ঐ খাঁড়ির বুক বয়ে একেবারে দিগন্ত অবধি চলে গেছে ফসলের শ্যামল তরঙ্গ, বিলীন হয়েছে প্রখর তাপে বিবর্ণ আকাশের অন্তরালে। বায়ু তেতে উঠেছে, ছুটে চলেছে তপ্ত বায়ুপ্রবাহ, কাঁপন উঠেছে, মনে হচ্ছে ঝিঁঝিঁ পোকা বা ফরিঙের দল নয়, বাতাসই যেন গুঞ্জন তুলছে, গান গাইছে।

'কী হল, চুপ করে রইলে যে?' অসহিষ্ণু হয়ে কোস্তিয়ার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল নিউরা, উঁকি মেরে দেখল তার মুখ। 'চমৎকার, অ্যাঁ? কথা বলতে মন চাইছে না তোমার? আমারও না... আমি যখনই এখানে আসি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর দেখি, কথা বলার কোন ইচ্ছে হয় না...'

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপচাপ সে থাকতে পারে না, খাড়া পাড়টা থেকে যা যা দেখা যায় কোস্তিয়াকে দেখায়, সেগুলির বৃত্তান্ত দেয়। এই সময় নিউরার ভাবভঙ্গি এমন হয়ে ওঠে যেন চারপাশের সমস্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে সে নিজে, তাই এখন নিজের কাজের জন্য গর্বিত হওয়ার পুরো অধিকার তার আছে।

অদূরের গিরিসংকট থেকে ভেসে এলো একটা টানা শিস। নিউরা ঘুরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল:

'আমাকে ডাকছে। ছেলেরা। জিপসী মিশা। ও অবশ্য এখনও ততটা পারে না — ছাড়াছাড়া!'

নিউরা মুখে আঙুল পুরে তীক্ষ্ন শিস দিল।

'তুমি পার? শুনি, একবার... মন্দ নয়!' বোদ্ধার মতো অনুমোদনের সুরে বলল সে। 'বেশ শিস দাও কিন্তু। আমি জানি মেয়েদের শিস দেওয়া ভালো নয়। কিন্তু যদি দরকার হয়? কাজের স্বার্থেই না করা? পারা দরকার, তাই না? আমার ত মনে হয় সবই পারা উচিত! অ্যাঁ?'

গিরিসংকট থেকে আবির্ভাব ঘটে দুটি কিশোরের, তারা দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু নিউরার পাশে একটা অচেনা ছোকরাকে দেখতে পেয়ে পায়ের গতি মন্থর করে দেয়।

'আরে কী হল তোদের?' নিউরা চেঁচিয়ে বলল ওদের। 'এদিকে আয়! এই যে আলাপ করিয়ে দিই!' সসম্ভ্রমে দু'হাত জড় করে সে বলল। 'এই হল আমাদের ছেলেরা। এই যে এ,' বলেই মোটাসোটা ছেলেটাকে দেখিয়ে দিল, তার গোল মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা আর ভরাট মুখটার ভালোমানুষ-ভালোমানুষ, ভাব, 'এ হল তিম্‌কা-তিমোফেই। ও মোটা আর কুঁড়েও বটে।'

অলস তিমোফেই বিন্দুমাত্র রাগ করে না, কৌতূহলভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিউরাকে, অপেক্ষা করে ও আরও কী বলে। কিন্তু নিউরা অন্য ছেলেটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এই ছেলেটা খাটো গড়নের, এর চোখ কালো, চুলও কালো। ঢিমেতাল সাথীটির সঙ্গে তার প্রভেদ এই যে সে সর্বক্ষণ ছটফট করছে। এমন কি যখন দাঁড়িয়ে, তখনও মনে হয় যেন দারুণ ব্যস্ত।

'এ হল জিপসী মিশা। জিপসী ও মোটেই নয়, আসলে দেখতে পাচ্ছ ত কালো, তাই আমরা ওকে বলি জিপসী। আর এ, বন্ধুরা — কোস্তিয়া। আমার আপন পিসতুত ভাই। ওর মা আমার বাবার...'

'...আপন বোন,' চট করে ধরিয়ে দিল মিশা।

'হুঁ!' অকপটে সায় দিয়ে বলল নিউরা। 'কী হল, তোমরা আলাপ করছ না কেন?'

ওর বড় ইচ্ছে হচ্ছিল ওরা যেন আলাপ করে বয়স্কদের মতন: হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে: 'আলাপ করে বড় খুশি হলাম,' কিংবা ঐ রকম কিছু একটা। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দেবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, ওরা চুপচাপ, আড়চোখে মন দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে পরস্পরকে দেখতে লাগল।

'আরে ধুৎ! আলাপের আবার কী আছে!..' তিমোফেই ধীরেসুস্থে টেনে টেনে বলে। 'চল্ রে মিশা।'

'কোথায় চললি তোরা?'

'চান করতে বটে!.. কিছু বলবি?'

'আমরাও যাব। অ্যাঁ, কোস্তিয়া?'

'বটে? চল্,' তিমোফেই বলল।

'কে কত তাড়াতাড়ি যেতে পারে!' চেঁচিয়ে এই কথা বলে নিউরা তীরবেগে ঢাল ধরে ছুটল নীচে, নদীর দিকে।

মিশা আর কোস্তিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ওর পিছু ধাওয়া করে। কোস্তিয়া সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে পড়ে: খালি পায়ে দৌড়ানোর অভ্যেস ওর নেই, ওর পায়ের চামড়া বড় বেশি তুলতুলে। তিমোফেইয়ের কিন্তু তাড়াহুড়োর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে সন্তর্পণে, ওজন করে করে পা ফেলতে ফেলতে কোস্তিয়াকে খানিকটা সান্ত্বনা দিয়ে, খানিকটা বা কৈফিয়তের সুরে বলল:

'আরে রকেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি আর পারা যায়! ও বরাবরই এই রকম। ওর ভেতরটায় যেন কিছু একটা চার্জ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের তাড়া নেই, সময় পাব 'খন...'

ইতিমধ্যে তীরে মিশা আর নিউরা জোর তর্ক লাগিয়ে দিয়েছে ওদের মধ্যে কে প্রথম জলের ধারে ছুটে এসেছে। কিন্তু নিউরাই যে প্রথম হয়েছে এটা স্পষ্ট। কোস্তিয়া আর তিমোফেইও তা স্বীকার করল।

'ঠিক আছে,' রাগে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে পাকিয়ে বলল মিশা, 'সাঁতারে কে কার আগে যেতে পারে দেখা যাবে!'

'বটে? সাঁতারে আমার ওপর টেক্কা দিতে পার, কিন্তু কোস্তিয়ার ওপর...'

'তোর আপন পিসতুত ভাইয়ের কথা বলছিস ত?' বিদ্রূপভরে জিজ্ঞেস করল মিশা। 'ঠিক আছে, এরকম ভাই-টাই আমরা অবশ্য দেখিও নি...'

সে ছুটতে ছুটতে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কোস্তিয়া প্রবল উৎসাহে ঝাঁপ দিল তার পেছন পেছন।

তিমোফেই পা ডুবিয়ে পরখ করে দেখল — জলটা ঠাণ্ডা কিনা, তারপর হাঁটু জলে নেমে আঁজলা করে জল নিয়ে সন্তর্পণে গা ভেজাল।

নিউরা ততক্ষণে গায়ের জামা খুলে ফেলে জলে নেমে পড়েছে, ফোয়ারার মতো জলের ছাঁটে তিমোফেইকে ভিজিয়ে সপসপে করে দিচ্ছে।

'উঁ উঁ, বটে, বটে...' তিমোফেই হাত-পা ছুঁড়ে বলল। 'হয়েছে... হয়েছে!'

নিউরা ওর হাত ধরে ঝটকা টান মারতে ও ধপ্ করে জলের মধ্যে পড়ে গেল।

'বড় পাজী ত তুই!' নাক ঝাড়া দিয়ে সে বলল। 'স্রেফ বেঁধে রাখতে হয়...'

'বাঁধার চেষ্টা করেই দ্যাখ না!' হি হি করে হাসতে হাসতে বলল নিউরা।

মিশা আর কোস্তিয়া পাশাপাশি সাঁতরে চলল। প্রথমে কোস্তিয়া এগিয়ে যায়, কিন্তু শিগগিরই মিশা ওর নাগাল ধরে ফেলে, ওরা চলতে থাকে মাথায় মাথায় সমান হয়ে। না, বুক সাঁতার দিয়ে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। কোস্তিয়া কাত হয়ে সাঁতার কাটে। মিশাও তাই করে। কোস্তিয়া যখন ফিরে জলের মধ্যে মুখ গুঁজে প্রচণ্ডভাবে হাত পা চালাতে থাকে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মাথা সামান্য তুলতে সে দেখতে পেল যে মিশাও ঐ ভাবে সাঁতার কাটছে, আর এবারে সে তার চাইতে এগিয়ে গেছে অন্তত এক মিটার।

কোস্তিয়া জল থেকে উঠে এসে চুপচাপ বালির ওপর শুয়ে পড়ল। নিউরা পাশে এসে বসল। কোস্তিয়ার চেয়ে তার অংশে কম সে মনে ব্যথা পায় নি।

'এসবই সেমিওন সেমিওনিচের কৃপায়,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল নিউরা, 'আমাদের ব্যায়ামের মাস্টারমশাই। উনিই ওকে শিখিয়েছেন!'

তিমোফেইয়ের সামনে নিজের বিজয়ের বড়াই করে মিশা।

'ট্রেনিং, বুঝলি!' সগর্বে সে বলল। 'ট্রেনিং-এর ফলে আমি হয়ত একদিন চ্যাম্পিয়নই হব!'

'নয়ই বা কেন?' বিচক্ষণের মতো বলল তিমোফেই। 'বলা যায় না, হতেও পারিস। আমি চললাম বটে, একটু সাঁতরে আসি গে।'

কিন্তু সাঁতার সে কাটে নিজের ভঙ্গিতে, যাতে শক্তি বেশি ক্ষয় না হয়: তীর ধরে স্রোতের মুখোমুখি এসে সে জলে নামল, চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, জলস্রোত বয়ে নিয়ে চলল তার স্থির দেহটাকে।

'তিমোফেই, ঘুমিয়ে পড়িস নে! কাঁকড়ায় টেনে নিয়ে যাবে!' ওর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল নিউরা।

'বটে? টেনে নিয়ে যাবে না,' শান্তস্বরে জবাব দিয়ে সে তীরের দিকে ঘুরল।

'ওঃ কী কুঁড়েই না তুই হয়েছিস তিম্‌কা!' ওকে গালাগাল দিয়ে বলল মিশা। 'এমন করে কেউ সাঁতার কাটে নাকি? যেন একটা কাঠের গুঁড়ি...'

'বটে? না,' খানিকটা ইতস্তত করে জবাব দিল তিমোফেই, 'গুঁড়ির পক্ষে বরং ভালো,

ওটা ত আরও হালকা...' বলেই সঙ্গীদের হো হো হাসি শুনে আশ্চর্য হয়ে তাদের দিকে তাকাল সে।

কোস্তিয়া হাসল না। তার অহংকারে ঘা লেগেছে, তার একমাত্র চিন্তা, ছটফটে জিপসীটার ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কী ভাবে জাহির করা যায়।

'চল, জলে একটু লাফঝাঁপ দেওয়া যাক,' তাচ্ছিল্যের ভাব করে সে বলল।

একটু দূরেই বাঁধা অবস্থায় দুলছে একটা নৌকো — বিশাল টলমলে নৌকোটার সামনের ও পেছনের দুটো দিকই উঁচু। ওরা সকলে নৌকোয় গিয়ে উঠল। প্রথমে সশব্দে ঝাঁপ দিল নিউরা, তারপর সোজা মুখ থুবড়ে পেটে ভর দিয়ে থপাস করে জলে পড়ল তিমোফেই। এমন কি জলের নীচেও সে যায় না, যেমন পড়ল তেমনি ভাবেই ভেসে রইল জলের বুকে, তৎক্ষণাৎ সাঁতরে গেল নৌকোর দিকে। মিশা অবজ্ঞাভরে ঠোঁট বাঁকাল, দু'পা পেছনে ঠেলা দিয়ে সামনের দিকে লাফ দিল, খাড়া হয়ে এসে পড়ল জলে। ও যতক্ষণ জলে ভেসে না ওঠে ততক্ষণ অপেক্ষা করার পর কোস্তিয়া উবু হয়ে বসে পড়ল, তারপর স্প্রিং-এর মতো শূন্যে পাক খেয়ে জল একটুও না ছিটকে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। তার শরীরটা এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে জলের বুকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল ওখানেও যেন তার পাক খাওয়া শেষ হয় নি।

সকলে চুপ করে থাকে, তিমোফেইয়ের মুখের ওপর যে খোলাখুলি মুগ্ধতার ছাপ পড়েছিল তার চেয়েও বেশি কিছুর আভাস কোস্তিয়া পেল মিশার নীরবতার মধ্যে। কিন্তু কোস্তিয়ার কাছে এটা কম, সে পুরোপুরি বিজয়ের জন্য ব্যাকুল।

'এসো দেখি, এবারে দোল দিয়ে দেখা যাক,' সে বলল।

ওরা নৌকোর সামনের গলুইয়ের ওপর দাঁড়াল, কোস্তিয়া তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়াল পাছগলুইয়ে, অন্যেরা নৌকোটাকে দোলা দিতে লাগল দোলনার মতো। পাছগলুই ক্রমেই ওপরে উঠতে থাকে। উপযুক্ত মুহূর্তে কোস্তিয়া নদীর দিকে পিঠ করে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে, বড় অর্ধবৃত্তের আকারে ডিগবাজী খেয়ে জলে এসে পড়ে, পর মুহূর্তেই পাছগলুইয়ের ঠিক কাছটায় জলের বুকে ভেসে ওঠে।

'কেমন ? বলেছিলাম না, বলেছিলাম না !' আনন্দে তড়বড় করে বলে উঠল নিউরা, সে সকলের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন এই অসাধারণ ডাইভটি কোস্তিয়া দেয় নি, দিয়েছে সে নিজে।

'দারুণ !' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই কথা বলে কোস্তিয়াকে নৌকোর ওপর উঠতে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল জিপসী মিশা। 'শেখাবি, অ্যাঁ ?'

'না শেখানোর কী আছে !' উদারতা দেখিয়ে বলল কোস্তিয়া। 'খুবই সোজা। কী করে করতে হয় বলে পরে সে দেখায় জলে ঝাঁপ দেওয়ার কায়দা।

মিশা সযতনে তাকে অনুসরণ করে, কিন্তু ফল তেমন সুবিধের হল না।

'শিখে নেব !' সে জিদ ধরে বলল।

'অবশ্যই শিখে নিবি!' কোস্তিয়া সায় দিয়ে বলল।

কোস্তিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে গেছে, ওর ওপর টেক্কা মারা অত সহজ নয়, তাই ওর মেজাজ এখন খুশি খুশি, উদার।

ওরা শরীর গরম করার জন্য আর দম ফেলার জন্য বালির ওপর শুয়ে পড়ল।

'তুই বরাবর কিয়েভেই থাকিস বুঝি?' তিমোফেই জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। কেন?'

'না, কিছু না। আমরা কখনও যাই নি কিনা...'

'তাতে কী হয়েছে?' মিশা বাধা দিয়ে বলল। 'আগামী বছর আমরা এক্সকার্শনে যাব।'

'বটে? সে ত আগামী বছর! কিয়েভ দারুণ সুন্দর, তাই না?'

'হুঁ।'

কোস্তিয়া কিয়েভের বর্ণনা দেয়; বাদামগাছের সারিতে দুপাশ ছাওয়া রাস্তাঘাট, আলোর বন্যায় প্লাবিত বিখ্যাত চৌরাস্তার বিশাল এলাকা, নীপারের উঁচু পাড়ের বাগবাগিচা — এসবেরও বর্ণনা দেয় সে, আর বলে ওখানকার স্টেডিয়াম ও ফুটবলপ্রতিযোগিতার কথা — ঐসব ম্যাচের একটাও সে বাদ দেয় না — আর ম্যাচের পর রেড আর্মি ও সাক্সাগানস্কায়া স্ট্রীটে ত এমন জনস্রোত ভেঙে পড়ে যে সমস্ত ট্রাম ও ট্রলিবাসের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, স্রোত না ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয় সেগুলিকে।

ওরা কোস্তিয়ার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, কোস্তিয়া আরও বেশি বেশি বলার চেষ্টা করে। কোস্তিয়া ভ্লাদিমির টিলা ও সবুজ থিয়েটারের কথা বলে; বিবরণ দেয় শেভ্চেঙ্কোর স্মৃতিমূর্তি আর সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দালানের — দালানের ভেতরে অবশ্য সে কখনও যায় নি, তবে বাইরে থেকে দালানটা দেখেছে, আর ভেতরটা যে দেখতে কেমন, লোকের বর্ণনা থেকে তা সে জানে; অপেরা থিয়েটার সম্পর্কেও সে বলে — সেখানে সে নিজের চোখে দেখেছে 'সিণ্ডেরেলা' ব্যালে। ব্যালে তার তেমন ভালো লাগে নি: নাচিয়েরা বাজনার তালে তালে আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে চলে, নয়ত লাফালাফি করে — অবশ্য লাফ দেয় দারুণ! — হাত নাড়িয়ে ভঙ্গি করে, কিন্তু কোন কথা বলে না। তবে মোটের ওপর মন্দ নয়: নানা রকম আজব ব্যাপার-স্যাপার আর সুন্দর সুন্দর সজ্জা বেশ মাথা খাটিয়ে বার করা! তবে হ্যাঁ 'ইভান সুসানিন' অপেরা জিনিস বটে! অপেরা শুনতে শুনতে তার গা পর্যন্ত শিরশির করে ওঠে... ওরা কিয়েভে এলে ও ওদের যে কোন এক্সকার্শনের চাইতে বেশি দেখিয়ে দেবে, ওরা গোটা কিয়েভ শহর ঘুরে ঘুরে দেখতে পাবে।

ভারী মাল চাপানো একটা বোট পাছগলুইয়ের সরু চোঙ থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে চলেছে।

'এটা আবার কী স্টীমার?' কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল।

‘এটা স্টীমার নয়, অটোমেটিক প্রপেলার লাগানো গাধাবোট। ডিজেলে চলে,’ জবাব দিল মিশা।

‘হ্যাঁ। এটা ‘কির্গির্জিয়া’,’ নিউরা সমর্থন করে বলল। ‘একটু দোল খাওয়া যাক কী বলিস ?’

ওরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে, পাশ থেকে সাঁতরে গাধাবোটের সামনে চলে আসে। কোস্তিয়া পেছন পেছন সাঁতার কাটে। ‘ওঃ মা যদি দেখতে পেতেন !’ তার মাথায় এক ঝলক এই ভাবনা খেলে যেতে সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ কোঁচকাল, এমন কি ভাবনাটাকে তাড়ানোর জন্য সে মাথাও ঝাঁকাল: মা দেখতে পেলে কোস্তিয়ার পক্ষে সুখের কিছু হত না।

স্টীমার চলাচলের পথ গেছে প্রায় তীর ঘেঁষে, গাধাবোটটাও তাই আপনা থেকেই মোড় নিয়ে এগিয়ে এলো ওদের মুখোমুখি।

‘এই এদিকে কোথায়, শয়তানের বাচ্চারা ?’ ‘কির্গির্জিয়া’ থেকে হাঁক ওঠে। ‘কুকুরছানার মতো ডুবে মরার সাধ হয়েছে !’

‘না !’ জবাবে নিউরা চেঁচিয়ে বলল। ‘জলে আমরা ডুবি না...’

‘আগুনেও আমরা পুড়ি না !’ ওর পাশে সাঁতার দিতে দিতে খেই ধরে বলল মিশা।

‘কির্গির্জিয়ার’ সামনের গলুই থেকে তীরের দিকে ছুটে চলে ঢেউ, ওদের আলতো করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তিমোফেই আগে থাকতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ে পেটটা সূর্যের দিকে উঁচিয়ে রেখেছিল। বাকীরাও চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, ঢেউয়ের ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ দোল খেতে খেতে সাঁতরে চলল স্রোতের মুখে।

‘কাখোভ্কায় চলল,’ ফের বালির ওপর শুয়ে পড়ার পর অপসৃয়মাণ ‘কির্গির্জিয়ার’ দিকে তাকিয়ে মিশা বলল।

‘তুই কী করে জানলি ? এমনও ত হতে পারে সে মোটেই কাখোভ্কায় নয়, অন্য কোথাও !’ আপত্তি তুলে বলল নিউরা।

‘কাখোভ্কায় !’ মিশা জেদ ধরে ফের বলল।

ঊর্ধ্বস্রোতের দিক থেকে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে ধোঁয়াটে-ছাইরঙা একটা টানাবোট। পেছনে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে আসছে দুটি গাধাবোট — প্রায় ডেক অবধি জলে বসে গেছে। ‘ক্রেমলিন’, — গাধাবোট তাদের পাশাপাশি চলে আসতে চাকার ঢাকনার ওপর লাল অক্ষরের লেখাটা ওরা পড়ল।

‘এখন সবাই যায় কাখোভ্কায়,’ ভারিক্কি চালে বলল মিশা। ‘ওখানে জানিস ত এটা-সেটা কত কিছু দরকার !’

‘ওখানে যদি যাওয়া যেত, কী বলিস তোরা, অ্যাঁ ?’ ভাবালু কণ্ঠে বলল নিউরা।

‘ওখানে এমন লোকের ভারী দরকার পড়েছে !’ মুখ বেঁকিয়ে বলল মিশা। ‘ওখানে দরকার বিশেষজ্ঞদের।’

'আমি কি হতে পারি না নাকি ? অ্যাঁ ? দেখিস পড়াশুনা করে ঠিক বিশেষজ্ঞ হব ! যেমন হতে চাই তেমনই হব।'

'বটে ? তা হবি। তবে কবে ? আরে ততদিনে কমিউনিজমই হয়ে যাবে। তৈরি জায়গা পেয়ে গেলে মজা বৈকি !'

'এটা আবার তুই কী কথা বললি ?' তিমোফেই এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবারে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল। 'কমিউনিজম হলে কি আর করার কিছু থাকবে না ? আমাদেরও করার মতো যথেষ্ট কাজ থাকবে...'

'যাক গে, সেসব হল গিয়ে পরের কথা... এখন যদি যাওয়া যেত !'

'আমার মা কিন্তু চলে গেছেন কাখোভ্কায়,' কোস্তিয়া জানাল।

'তাই নাকি ? কেন ?' সকলে মাথা তুলল।

'পরীক্ষার কাজে। আমার মা স্যানিটারি ডাক্তার, শ্রমিকরা যাতে ভালোভাবে বসবাস করতে পারে তার জন্য পরীক্ষা চালাবেন।'

'ও...' হতাশ সুরে টেনে টেনে বলল মিশা। 'এ আর কী ! বাড়িঘর ত আর বানাচ্ছেন না তিনি ! সবচেয়ে বড় কথা বাড়িঘর বানানো...'

'হয়ত বা কিছু বানাবেনও...' কোস্তিয়া ইতস্তত করে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ে।

'আমার বাবা শিগগিরই কাখোভ্কায় যাবেন,' তিমোফেই বলল। 'উনি ট্র্যাক্টর ড্রাইভার। এখন মাটি খোঁড়ার যন্ত্রের ওপর বই অর্ডার দিয়েছেন। পরে শেখা হয়ে গেলেই ওখানে চলে যাবেন।'

'তোকে নিয়ে যাবেন ?'

'তা মনে হয় না বটে। তাছাড়া আমি নিজেই যাব না। আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও শেষ হয় নি যে।'

'দেখলি ত ?' কোস্তিয়ার দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বলল মিশা। 'কারও বাড়িঘর তৈরি, কারও বা তরমুজ।'

'তরমুজ কী রকম ?'

'আরে, এ আমাদের বড় হয়ে মিচুরিনপন্থী উদ্ভিদবিজ্ঞানী হবে। নিজের তরমুজ দিয়ে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেবার তাল করছে !'

তিমোফেই গোঁয়ারের মতো মাথা বাঁকায়, এঁড়ে বাছুরের ভঙ্গিতে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে ভারিক্কি গলায় বলে:

'কমিউনিজমের আমলেও তরমুজের দরকার বটে।'

'তা ত বটেই ! তোর তরমুজ ছাড়া কি আর কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা হবে ?'

'হবে না কেন ? তা হবে। তবে তরমুজ হলে আরও ভালো হবে ! এই দ্যাখ না, আমাদের এই

দক্ষিণের জাতের তরমুজগুলো পুরো পাকার সুযোগ পায় না, কিন্তু আমি চেষ্টা করছি যাতে পুরো পাকতে পায়। কাজটা শেষ না করে ছাড়ব না। তুই তোর রেডিও ছাড়তে পারবি ?'

'হুঃ, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা ! আরে ওটা যে কারিগরি !'

কথাবার্তায় বোঝা গেল বহুকাল হল এই তর্কের উদ্ভব, আর এর শেষ যে কোথায় কে জানে। মিশা সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে, উঠে দাঁড়ায়।

'আমি চললাম, শিগগিরই ডিউটিতে যেতে হবে,' ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল সে। 'ওরে, তরমুজওয়ালা, যাবি, নাকি থাকবি ?'

'থাকতে যাব কেন ? আমিও যাব... ওর কথা তুই শুনিস নে,' সে কোস্তিয়াকে বলল। 'আমার কাছে আসিস, নিজেই দেখতে পাবি।'

'আচ্ছা !' বলল নিউরা। 'আমরা একসঙ্গে আসব। অ্যাঁ কোস্তিয়া ? নিশ্চয়ই আসব !'

তিমোফেই ও মিশা কয়েক পা ফেলার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'নিউরা, ওরে নিউরা !' মিশা ডাকে। 'তুই তোর বাবার কাছে নৌকোটা চা না, অ্যাঁ ? রাতের মতন পেলে হত... ওঃ যা মাছ ধরতাম !'

'দেবেন না,' মাথা ঝাঁকায় নিউরা। 'আমি বলি কী জান ? এসো একসঙ্গে সবাই গিয়ে চাই ! আমি আগে থেকে ভিত তৈরি করে রাখব — অ্যাঁ ? — আর তোমরা এসে চাইবে। একসঙ্গে হলে দিলেও দিতে পারেন...'

'ঠিক আছে ।'

ছেলেরা গাঁয়ে চলে গেল, কোস্তিয়া আর নিউরা ছুটল বাড়ির দিকে।

দ্বীপে

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর তিমোফেই ও মিশাকে তীরে দেখা গেল। ওদের হাতে বালতি, কিসের যেন কতকগুলি পুঁটলি আর ছিপ। কিন্তু তারা বয়া-তদারককারীর কুঠুরির দিকে না গিয়ে কিছু সময়ের জন্য তীরের একটা ঢিবির খাঁজের আড়ালে গা ঢাকা দিল, পরে ফের এসে দেখা দিল — তবে এবারে খালি হাতে। তারা তীর ধরে চলতে থাকে — যেন অমনি অমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিউরাও এই চাল দেখতে পায়, 'জমি তৈরি করতে' থাকে।

'বাবা, আমরা যে নৌকোটায় আলকাতরা মাখালাম ওটার ভেতরে জল ঢোকে না ত ? আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, এই ধর আমি আর কোস্তিয়া — আমরা কি ওটাকে কায়দা করতে পারতাম ? — ধর না, যদি নদীপার পার হই ? ও কিন্তু এখন রীতিমতো ভালো দাঁড় বায়। অ্যাঁ ? ঠিক দু'জনে

অবশ্য নয়, এ ধর, তিনজনে বা চারজনে। নৌকোটা হালকা যে! তুমি নিজেই ত বলেছিলে যে একটা দুধের শিশুও ওটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

'তোর আসল মতলবটা কী বল্ দেখি নিউরা!' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ চোখ কুঁচকে বললেন। 'লুকোচুরি না করেই খুলেই বলে ফেল্। ঐ তোর সঙ্গীসাথীরাও যেন নদীর ধারে ঘুরঘুর করছে... কী মতলব পাকিয়েছিস তোরা?'

নিউরা ঘাবড়ে গেল এই ভেবে যে 'ভিত তৈরি' করতে গিয়ে সব পণ্ড করে ফেলেছে সে।

'মতলব কিছুই পাকাই নি আমরা!' নিউরা কৈফিয়তের সুরে বলে। 'ঐ ত ওদের জিজ্ঞেস করেই দেখ না। এই এদিকে আয় ত তোরা!'

মিশা আর তিমোফেই নিজেদের মধ্যে কী যেন কথাবার্তা বলে নিল, তারপর মিশা তাদের দিকে ছুটে এলো, কিন্তু তিমোফেই থেকে গেল যথাস্থানে।

'নমস্কার, এফিম কাকা!' মিশা দূর থেকেই উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে বলল। 'হবে তাহলে, অ্যাঁ?' তার সর্বাঙ্গের চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল উল্লাস ও অধীরতা।

'হবে? তার মানে?'

মিশা চুপ মেরে গিয়ে হতভম্ব হয়ে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল নিউরার দিকে: এ আবার কেমন 'ভিত তৈরি?'

'না, মানে আমরা ভেবেছিলাম কি... আমাদের ইচ্ছে ছিল দ্বীপে যাবার। মাছ ধরার জন্যে আর কি।'

'কেন, এখানে বুঝি মাছ ধরা যায় না?'

'এখানে কি আর মাছে টোপ গেলে?' মিশার চোখেমুখে আর তার সর্বাঙ্গ খেলে গেল পরম অবজ্ঞার ভাব। 'এখানে টোপ গেলার কোন নামই নেই। হ্যাঁ জায়গা যদি বলতে হয় ত 'মজা খাঁড়ি'! রাতের বেলায় ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের...'

'রাতের বেলায়?' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ মৃদু শিস পর্যন্ত দিয়ে উঠলেন। 'কে কে যাবে শুনি?'

'এই আমরা,' মিশা নিজেদের দেখিয়ে বলে।

'না, না, এভাবে চলবে না। আর তিমোফেইয়ের কী হল? — ওর কি ইচ্ছে নেই নাকি? ঘাপটি মেরে আছে কেন?'

'ইচ্ছে আছে। তবে ও আসতে চাইল না, বলল, কথাবার্তায় আমি তেমন তুখড় নই, আমি সব কাজ পণ্ড করে ফেলব...'

'তার মানে বলতে চাস, তুই কথাবার্তায় খুব তুখড়?'

মিশা কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে না পেরে সলজ্জ হাসি হাসল, বন্ধুকে হাতছানি দিয়ে কাছে আসতে বলল।

‘শোন তাহলে,’ এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বললেন, ‘নৌকো আমি তোমাদের দেব, তবে একটি শর্তে... আমাকে যদি তোমাদের দলে নাও।’

‘বাঃ নেব না কেন আমরা!.. নেব না আবার! অবশ্যই নেব!’ সমস্বরে চেঁচিয়ে বলল ওরা সবাই।

‘ওঃ বাবা, তুমি কী সেয়ানা! সাবাস বলতে হয় তোমাকে! তাহলে কখন যাওয়া হবে? এক্ষুনি? ওরে তোরা যার যার জিনিস নিয়ে চলে আয়!’

‘বাব্বা, কী হিসেবী তোমরা!’ মৃদু হেসে বললেন এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ। ‘জিনিসপত্র নিয়ে চলে এসো। তবে যাব, যখন বাতি তদারকীর কাজে রওনা দেব তখন। আর তুই, নিউরা, গোটা দলের জন্যে রুটি যোগাড় করে রাখিস, মাছ ধরা পড়ুক আর না-ই পড়ুক, খিদে ত পাবেই।’

‘এক্ষুনি! আলুটালুও নেব, সব নেব!’ নিউরা চটপট বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিবায়ুর গতিতে বাড়ির দিকে ছুট মারল।

সন্ধ্যার অনেক আগেই সমস্ত জিনিসপত্র নৌকোয় রাখা হল। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ সেই সঙ্গে যোগ করলেন একটা বিরাট তেরপল আর নিজের ক্যাম্বিশের বর্ষাতিটা। কড়কড়ে বর্ষাতিটা এমন ঝনঝন করে উঠল যেন ওটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি।

সূর্য যত মন্থর গতিতেই আকাশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলুক না কেন, শেষ অবধি সে ঢলে পড়ে খাড়া ঢালের দিকে, যে ঢালটার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে গ্রাম। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ এবারে নৌকোয় বসার নির্দেশ দিলেন। মিশা ও তিমোফেই দাঁড় ধরল, নিউরা হাল ধরল, কোস্তিয়া ও এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ হল নৌকোর যাত্রী।

‘এই বারে যার যার মালপত্র তুলে নাও!’ খস্‌স আওয়াজ করে নৌকোর সামনের গলুই দ্বীপের বালুতীরে এসে ঠেকলে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বললেন। ‘ছোট মাছ বড় মাছ উঠুক দেদার... তবে একটা শর্ত আছে: জলে নামা চলবে না! যদি ঠকাও আর কখনও বিশ্বাস করব না তোমাদের, নৌকোও চোখে দেখতে পাবে না।’

‘এফিম কাকা, বলেন বটে... আমরা ঠকাব এ কী বলছেন!’ তিমোফেই বিচক্ষণ লোকের মতো বলল।

‘অসম্ভব কিছু নয়...’

‘সে ত কবেকার কথা বটে...’ হকচকিয়ে গিয়ে টেনে টেনে বলল তিমোফেই, আর মিশা — এমন ভাব করে যেন সে জিনিসপত্র নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত — কোন কথাই তার কানে যাচ্ছে না।

‘আরে তারপর ত আর তোমাদের গোঁফ গজায় নি!’ হাসতে হাসতে এই কথা বলে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নৌকো ছেড়ে দেন।

‘গত গরমকালে আমরা চুপে চুপে নৌকোটা নেবার মতলব করেছিলাম বটে, কিন্তু এফিম

কাকার কাছে ধরা পড়ে যাই। আমরা বললাম বটে, যে নৌকো আপনাআপনি বাঁধন খুলে চলে যেতে আমরা ওটাকে ধরি... এফিম কাকা বিশ্বাস করলেন না বটে...'

'হয়েছে, হয়েছে!' বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে বলল মিশা। 'এখন দেখছি সকাল অবধি এই বটে বটে চলবে... থলে নে!'

তিমোফেই, নিউরা আর মিশা ব্যস্তসমস্ত হয়ে রোজ উইলোর ঝোপঝাড় ঠেলে চলল। ওদের একমাত্র চিন্তা — ভালো দেখে জায়গা বেছে নেওয়া — আশেপাশের কোন কিছুর দিকে ওদের আগ্রহ নেই।

এদিকে কোস্তিয়া উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। তার এই দীর্ঘ জীবনে — দীর্ঘ অবশ্য তার মতে — মাত্র একবার সে গিয়েছিল একটা দ্বীপে — ত্রুখানভ দ্বীপে। কিন্তু সেটাকে কি আর দ্বীপ বলা যায়! আগাগোড়া লঞ্চ আর বোটের ঘাটায়, গুমটিতে আর দোকানপাটে ছাওয়া, যত্রতত্র বসানো রয়েছে 'জলে আচরণবিধি' লেখা ফলক। আর সেখানে লোক সব সময় কিয়েভের চৌরাস্তার চেয়েও বেশি।

এখানে দোকানপাট নেই, নিয়মকানুন নেই, বোট আর লঞ্চের স্টেশন নেই, বিশাল বিশাল ছত্রাকার ছাউনিও নেই। নেই কোন জনপ্রাণী। একেবারে খাঁটি নির্জন দ্বীপ। মার্টিন পাখিরা পর্যন্ত তাদের বাসার ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে, কেবল অস্তগামী সূর্যের গোলাপী কিরণের মধ্যে ঝোপঝাড়ের মাথার ওপরে নাচছে পোকামাকড়ের ঝাঁক।

কোস্তিয়া বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে পিছিয়ে পড়ে, বাঁ দিকে মোড় নেয়। অতি ক্ষীণ সড়সড় শব্দে পায়ের চাপে ঝরে পড়ছে ঝুরঝুরে সাদা বালি, আর কোস্তিয়ার মনে হচ্ছে সে যেন কখনও চলেছে জড়ানো লতাগুল্মের ভেতর দিয়ে, কখনও বা গ্রীষ্মমণ্ডলের ঘন ঝোপঝাড় ভেদ করে, তার পায়ের তলায় গড়গড় আওয়াজ তুলছে আগ্নেয়গিরির লাভার ভগ্নাবশেষ কিংবা সড়সড় করে সরে যাচ্ছে মারাত্মক চোরাবালি। কোস্তিয়ার শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে শিরশির করে বয়ে যায় ঠাণ্ডা স্রোত, এমন কি মাথার পেছনের ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল আন্দোলিত হতে থাকে।

কোস্তিয়া মাটি থেকে একটা মোটা বাঁকা ডাল তুলে নিল, লাঠি হাতে ধরে সামান্য ঝুঁকে পড়ল। তার পদক্ষেপ হল যেন স্প্রিংয়ে আঁটা। সে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত। নেকড়ে আর ভালুক অবশ্য এখানে নেই, তবে সাপ ত থাকতে পারে... কোস্তিয়া যেন দেখতে পাচ্ছে হিংস্র হিসহিস শব্দ করতে করতে একটা বিষধর সাপ বিড়েপাকানো শরীরটাকে টানটান করে খুলে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাকে আক্রমণ করছে, কিন্তু সে বিদ্যুৎগতিতে আঘাত হেনে সাপটার মাথা থেঁতলে ফেলল, তারপর ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে, সেখানে পড়ে থেকে খিঁচুনি তুলতে লাগল কিলবিলে শরীরটা... নাকি যেমন...

বুনো গাছপালার ঝোপঝাড় শেষ হয়েছে একটা ছোট খাঁড়ির তীরে এসে। ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে আসা ডালপালা, পাতা আর নানা রকম আবর্জনার স্তূপের ওপর বসে ছিল একটা বিরাট

বেঙ, বেঙটা ভয়ে ড্যাব ড্যাব করে কোস্তিয়ার দিকে তাকাল, তারপর লাফিয়ে উঠে শূন্যে পাক খেয়ে ঝপ করে গিয়ে পড়ল জলে।

'কোস্তিয়া! কোস্তিয়া! কোথায় গেলি? ও-ও!' ভেসে এলো নিউরার গলা।

কোস্তিয়া লাঠিটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মটমট আর সরসর আওয়াজ তুলে রোজ উইলোর ঝোপঝাড় ভেদ করে খাঁড়ির দিকে ছুটে এলো নিউরা। তার চোখেমুখে উদ্বেগের চিহ্ন।

'তুই চলে গেলি কেন? আমি... আমরা যা ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম!' ক্রুদ্ধ হয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলল সে, কিন্তু কোস্তিয়ার মুখের ওপর নজর পড়তে সুর বদল করে ফেলল। 'তুই ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলি? অ্যাঁ? আমিও। আমি যখন একা একা থাকি তখন ভাবতে শুরু করলাম ত হয়ে গেল! এদিকে তিমোফেই একটা পার্চ মাছ ধরে ফেলেছে। এই এত বড়! না, ঠিক অত বড় নয়, এই এতটা হবে... চল্!'

মহা উৎসাহে মাছধরা চলছে। তিমোফেই ছিপ ফেলে চুপচাপ জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। জিপসী মিশাকে দু'জনের ভাবনা ভাবতে হয়। সে থেকে থেকে ছিপ আঁকড়ে ধরছে, সামান্য লাফিয়ে উঠে ফের বসে পড়ছে। তিমোফেইয়ের ফাতনা যখন নড়ে ওঠে তখনও তাকে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দেখে রাগে ফোঁস করে, মুহূর্তে মুহূর্তে টোপ পালটায়, এখান থেকে ওখানে ছিপ ফেলে, বঁড়শীতে টোপ গেঁথে অনেকক্ষণ ধরে প্রবল উৎসাহে তার ওপর থুতু ফেলে আর এত ছটফট করতে থাকে যে মাছ ধরা যদি তার ঐ ছটফটানির ওপর নির্ভর করত, তাহলে এতক্ষণে তার মাছগাঁথার দড়িটা ভর্তি হয়ে যেত। কিন্তু তার মাছ গাঁথার দড়িতে আছে দুটো ছোট ছোট পুঁটিমাছ, এদিকে তিমোফেইয়ের ততক্ষণে জমেছে আধডজনখানেক পুঁটিমাছ আর বেশ ভালো আকারের একটা পার্চ মাছ।

'কী রে, বসে আছিস কেন, ঠুঁটো কোথাকার? টোপ খাচ্ছে... টোপ খাচ্ছে যে! শুনছিস?' মিশা বিরক্ত হয়ে বলল।

'না, এটা হল ওর একটুখানি নষ্টামি আর কি,' কোন তাড়াহুড়োর ভাব না দেখিয়ে তিমোফেই বলল। 'গিলুক আগে... আর তুই চুপচাপ বসে থাক, নইলে কিছুই ধরতে পারবি না...' বলতে বলতে হঠাৎ সে ঝট করে কৌশলে একটা টান মারল, শূন্যে ঝকঝক করে উঠল জ্যান্ত রুপোলি চাকতি।

'এটাকে কি আর মাছধরা বলে?' অবজ্ঞাভরে দাঁতে দাঁত চেপে বলল মিশা। 'এখানে যদি জাল থাকত তাহলে দেখিয়ে দেওয়া যেত!'

কারও বুঝতে বাকি থাকে না যে কথাগুলো সে বলছে স্রেফ হিংসায় আর এই দুঃখে যে তিমোফেইয়ের ভাগ্যে মাছ ধরা পড়ছে অথচ ও কিছুই ধরতে পারছে না। মিশা ছিপ তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসল যাতে তিমোফেইয়ের সাফল্য চোখের সামনে দেখতে না হয়।

কোস্তিয়া আর নিউরা মস্ত এক গাদা রোজ উইলো জড় করে আনে। নিউরা আগে থাকতে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকে, কোস্তিয়া তার ছিপ নিয়ে তিমোফেই ও মিশার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে বসে। মামার মাছ ধরার সরঞ্জাম কায়দা করতে না পারার দরুনই হোক কিংবা জায়গা ঠিকমতো বাছতে না পারার দরুনই হোক, তার ছিপে মাছ তেমন টোপ খায় না। তিনটে পুঁটিমাছ ধরা পড়ার পর আর কোন মাছ টোপ গিলতে এলো না। যে সামান্য কয়েকটা মাছ ধরা পড়েছিল সেগুলি তুলে নিয়ে কোস্তিয়া চলে গেল দ্বীপের অন্য পাশে, প্রধান নদীগর্ভের দিকে। এখানে নদীর প্রবল স্রোতে পাড় খেয়ে গেছে, খাড়া পাড়ের ঠিক গায়েই পাকদহের ওপরে জল কলকল শব্দে ঘুরপাক খাচ্ছে। কোস্তিয়া বঁড়শীতে একটা ছোট পুঁটিমাছ গেঁথে ছিপ ফেলে। আধমিনিটখানেক ফাতনাটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ, ঝট করে জলের তলায় মিলিয়ে যায়। কোস্তিয়া ছিপ ধরে টান মারে ওপরের দিকে — একটা পাইক মাছের পোনা ফসকে বেরিয়ে যেতে সে হতাশ হয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

দ্বিতীয় পুঁটিটাকে সবচেয়ে বড় বঁড়শীতে গেঁথে ছিপ ফেলতে না ফেলতে মাছ টোপ গিলে হেঁচকা টানে কোস্তিয়ার হাতের ছিপ টেনে নিয়ে যায় আর কি! কোস্তিয়া সময় বুঝে টান মারল, মাছটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু মাছ বাগ মানে না, ছিপে প্রচণ্ড টান পড়ে। গলদঘর্ম হয়ে গিয়ে, আতঙ্কে ও পুলকে শিউরে উঠে কোস্তিয়া ছিপের সুতো সামান্য ছেড়ে দিয়ে তীর বরাবর চলতে লাগল — তার কাছে জাল নেই, ফলে মাছটা কোন কিছু দিয়ে তুলে যে নেবে তার উপায় নেই, অথচ খাড়া পাড়ের ওপর টেনে নিয়ে আসাও ঠিক হবে না — ফসকে যাবে। অবশেষে বালুকাময় সংকীর্ণ একটা এলাকার মধ্যে এসে পড়তে কোস্তিয়া লাফিয়ে নীচে নেমে গিয়ে শিকারটাকে পাড়ের দিকে টেনে আনল। কালো পিঠ, বিশাল দাঁতাল মুখবিবর, ক্রুদ্ধ জ্বলজ্বলে চোখ। আশেপাশে কোথাও না আছে লাঠি, না আছে কোন পাথর। কোস্তিয়া এক ঝটকায় মাছের কানকোদুটো চেপে ধরল, তারপর মাছের ধড়ফড়ানিতে তাকে সঙ্গে নিয়ে তীরের ওপর পড়ে গেল।

ছিপের সুতো খুলে, ছিপটা রেখে দিয়ে কোস্তিয়া দু'হাতে কানকো ধরে মাছটাকে সামনে নিয়ে চলতে থাকে, লোকে যেমন বয়ে নিয়ে চলে ফুটন্ত সামোভার। পাইক মাছ তার পেটে আর খালি পায়ের ওপর লেজের ঝাপট মারে, নিঃশব্দে খাবি খেতে থাকে, তার মুখবিবর থেকে বেরিয়ে থাকে ছিপের সুতো।

নিউরার ভীতসন্ত্রস্ত ও সহর্ষ উচ্চ আর্তনাদ আর মিশার ঈর্ষামিশ্রিত নীরবতা কোস্তিয়ার কাছে যে-কোন প্রশংসার চেয়ে মধুর ঠেকল।

'হ্যাঁ জিনিস বটে একটা!' এগিয়ে এসে বলল তিমোফেই। 'ছিপে?'

'ছিপে!' সাফল্যের আনন্দে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে বলল কোস্তিয়া।

'জ্যান্ত মাছের টোপ গেঁথে?'

'হ্যাঁ।'

'দারুণ !'

তিমোফেই ঝুলন্ত মাছটার সাদা পেটে আঙুলের খোঁচা মারল, মাছটা খিঁচুনি দিয়ে ছিটকে সরে গিয়ে তার হাতের ওপর প্রচণ্ড ঝাপটা মারল।

'চিজ বটে !' হাত সরিয়ে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বলল তিমোফেই। সে মাছের মুখের ভেতরে উইলোর ডাল ঢুকিয়ে দেয়, মাছটা ভয়ঙ্কর খেপে গিয়ে চোয়াল নাড়াল, তিমোফেই চিবিয়ে-ভাঙা ডালের টুকরোটা দেখিয়ে বলল: 'দেখলি ত ? যদি আঙুল হত...'

বালির ওপর পাইক মাছটাকে ছুঁড়ে দেওয়া হল, কয়েক বার লাফঝাঁপ দিয়ে সে শান্ত হয়ে গেল। কোস্তিয়া তার ছিপ আনতে গেল। সুতোগাঁথা শেষ যে পুঁটিমাছটা সে জলের মধ্যে জিইয়ে রেখেছিল সেটা সুতোসমেত পালিয়ে গেছে, তবে তার জন্য কোস্তিয়ার কোন আফশোস নেই। তিমোফেই আর মিশা তাদের সুতোগাঁথা চুনোপুঁটি মাছগুলি ছাড়িয়ে আনে মাছের সুপ বানানোর জন্য। সূর্য ইতিমধ্যে অস্ত গেছে, এখন আর মাছ টোপ খাচ্ছে না। জ্যান্ত মাছের টোপ শক্ত করে বঁড়শীতে গেঁথে কোস্তিয়া ও মিশা ছিপ ফেলল। বলা যায় না, ছোটখাটো কোন বোয়ালমাছ ধরা পড়লেও পড়তে পারে।

নিউরা কাপড়ের টুকরো বিছিয়ে তার ওপর পাইকে মাছটা ছাড়াতে থাকে। কোস্তিয়া একটা ছোট মাছ ছাড়াতে লেগে গেল কিন্তু মাছের গাটা এমন পিছলে যে তার কাঁটায় কোস্তিয়ার গোটা হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, পুরোপুরি সাফ করা কোনমতেই যায় না; কোস্তিয়া তাই ঘাবড়ে গিয়ে ওটাকে তিমোফেইয়ের হাতে তুলে দিল। তিমোফেই ধীরেসুস্থে, নিশ্চিন্তভাবে ওটার কাঁটাওয়ালা পাখনাগুলি ভেঙে ফেলে নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেলে দিল, তারপর হাত দিল পরেরটায়, নিউরা যতক্ষণে পাইকটা নিয়ে ব্যস্ত ততক্ষণে তিমোফেই সবগুলি ছোট মাছ কেটেকুটে সাফ করে ফেলল।

ইতিমধ্যে মিশা ধুনি জ্বেলে ফেলেছে। সরু শুকনো ডালপালা ফসফস করে জ্বলছে দেশলাইয়ের কাঠির মতো, তারপর ফ্যাঁসফ্যাঁস আওয়াজ তুলে থেকে থেকে আগুনের কণা ছুঁড়তে ছুঁড়তে জ্বলে ওঠে মোটা মোটা সবুজ ডালপালা। উইলো ঝোপের ঝাঁকড়া মাথাটা কালো হয়ে আসে, মাথার ওপরে নাচতে থাকে আগুনের শিখা; 'মজা খাঁড়ির' সমস্ত খাত বয়ে তার প্রতিফলন কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলেছে বিপরীত তীরে। তীরের ওপরকার ছাইরঙা উইলোগুলিতে আঁধারের কালিমা লেগেছে, মনে হচ্ছে যেন বিশাল এক জন্তু জলের ধারে লুকিয়ে ওত পেতে আছে।

বালতির ভেতরে টগবগ করছে ফুটন্ত জল, সেখান থেকে ভেসে আসছে তেজপাতা আর লঙ্কার গন্ধ। ছেলেরা খিদেয় কাতর হয়ে জিভের জল টানছে, নিউরা জলের মধ্যে যখন নুন, আলু আর মাছ ঢালতে থাকে তখন তারা চেয়ে চেয়ে দেখে।

কোস্তিয়া একটু দূরে বসে তাকিয়ে থাকে নদীর দিকে। আগুনের আভা, উইলোর ঝুপসি কালো ডালপালা, 'মজা খাঁড়ির' জলের বুকের বিষণ্ণ, শীতল প্রকৃতি রূপান্তরিত হতে চলেছে অস্পষ্ট অথচ চাঞ্চল্যকর দৃশ্যে। অলক্ষিতে মিলিয়ে যাচ্ছে আশপাশ, তার বদলে অর্ধজাগর-অর্ধস্বপ্নে

দেখা দিচ্ছে রহস্যময় জগৎ, জীবজন্তু আর পরমাশ্চর্যের ভাসা ভাসা অথচ ভয়ংকর ও মন-মাতাল-করা কল্পমূর্তি — তাদের মাঝখান দিয়ে চলেছে কোস্তিয়া। তার পদে পদে নিদারুণ বিপদের আশংকা, কিন্তু সে নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছে তাদের দিকে। ঐ যে দূরে শোনা যাচ্ছে খসখস আওয়াজ, পদধ্বনি, ডালপালা ভাঙার পটপট শব্দ... বিশাল, কালো রঙের কী যেন একটা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। কোস্তিয়ার হৃৎস্পন্দন থেমে যায়, হৃৎপিণ্ডটা কোথায় যেন তলিয়ে গেল।

'কি গো জেলেরা, মাছ কেমন ধরা পড়ল?' কোস্তিয়া শুনতে পেল এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের কণ্ঠস্বর। 'সূপ রান্না করার মতো ধরা পড়েছে ত? নাকি স্রেফ আলু খেয়ে থাকতে হবে?'

'বেশ ধরা পড়েছে! বেশ ধরা পড়েছে!' চেঁচিয়ে বলল নিউরা। 'ওঃ বাবা, কোস্তিয়া এইসা একটা পাইক মাছ ধরেছে না! এই এত্ত বড়!.. সাংঘাতিক!'

নিউরা আর মিশা এ ওকে থামিয়ে দিয়ে হুড়োহুড়ি করে বিবরণ দিতে থাকে মাছ ধরার, কোস্তিয়ার পাইক মাছের। কোস্তিয়াও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। চুপ করে থাকে কেবল তিমোফেই। সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে মাছের সূপ নেড়েচেড়ে মেশাতে থাকে, চাখার পর জানায়:

'তৈরি হয়ে গেছে!'

অমন সোয়াদের সূপ কোস্তিয়া আর কখনও খায় নি। খেতে খেতে সে অবসন্ন হয়ে পড়ে, গলদঘর্ম হয়ে যায়, তার পেট ঢাক হয়ে ওঠে, আরও খেতে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু পেটে আর জায়গা নেই।

বালি ততক্ষণে জুড়িয়ে এসেছে, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বালির ওপর বর্ষাতি বিছিয়ে দেন, ওরা ধুনির দিকে পা রেখে সারি বেঁধে শুয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুম কারও চোখে ছিল না।

'কি চড়াইপাখিরা, কিচিরমিচির থেমে গেল কেন?' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

ধুনিতে গনগনে আঁচে সাদা ফটফটে হয়ে গিয়ে কাঠকয়লা সজোরে চটাস চটাস আওয়াজ তুলল, পাশে ছিটকে পড়ল, শূন্যে উড়ল ফুলকি। নিউরা চমকে উঠল।

'যাই বল না কেন, যেন গুলির আওয়াজ!' লজ্জা পেয়ে গিয়ে ও বলল।

'আরে রামো!' অবজ্ঞাভরে ঠোঁট উলটিয়ে বলল মিশা। 'যদি সত্যিকারের গুলি হত? তাহলে বোধ হয় ভয়ে মরেই যেতিস?'

'আমি? আমি কোন কিছুতেই ভয় পাই না! বাবা তুমিই বল, অ্যাঁ? আওয়াজটা আচমকা হয়েছে, তাই না আমি চমকে উঠেছিলাম। নইলে একটুকুও না, এক ফোঁট্টাও না — ধুৎ!'

'আচ্ছা, তোকে যদি কোরিয়ায় থাকতে হত?' তিমোফেই বলল।

'হুঁঃ আমি তাহলে দেখিয়ে দিতাম এই ফ্যাসিস্তগুলোকে!' ঘুষি উঁচিয়ে শাসায় নিউরা।

'ওরা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে সমস্ত কোরিয়াটা,' কোস্তিয়া বলল কঠিনস্বরে। 'বোমায় আর নাপামে। এটা এক ধরনের ঘন থলথলে পেট্রোল। শহর গাঁ কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাদের

পাইওনীয়র-লীডার পড়ে শুনিয়েছেন একজন আমেরিকান সাংবাদিকের লেখা — ওখানে গ্রামের বদলে রয়ে গেছে কেবল নীলরঙা ছাই...'

ওরা সকলে চুপ করে গেল। তারা মনে মনে কল্পনা করতে থাকে তাদের অদেখা সেই দেশটিকে। সগর্জনে, হু-হু আর্তনাদ তুলে আকাশে ছুটে চলেছে এরোপ্লেন, অবিরাম বোমাবর্ষণ করে চলছে, সমস্ত দেশ জুড়ে, পাহাড়ে-পর্বতে, উপত্যকায়-উপত্যকায় দাউদাউ আগুনের শিখা, দেখতে দেখতে সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, নীলরঙা ছাই ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

কোস্তিয়ার লজ্জা হতে লাগল নিজের উদ্ভট উদ্ভট কল্পনার জন্য। যে-কোন দৈত্যদানবের চেয়ে ভয়ংকর ভয়ংকর লোকজন থাকতে যত রাজ্যের দৈত্যদানব আর ভয়ংকরের কল্পনা কেন? সে মনে মনে ঠিক করল যদি নাবিকই হতে হয়, তাহলে অবশ্যই সে হবে যুদ্ধজাহাজের নাবিক, আর তা যদি হতে না পারে, তাহলে অন্তত যাবে সামরিক স্কুলে। সম্ভবত বাদবাকিরাও ঐ একই কথা ভাবে, তাই তিমোফেই চোখমুখ বেশ গম্ভীর করে যেন কারও সঙ্গে কথাবার্তার সূত্র ধরে হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বলল:

'আমি ট্যাংকচালক হব বটে। আমার বাবা ট্যাংকচালক কিনা। তাই আমিও...' বলে সে ফের চুপ করে যায়।

'তা ত বটেই!' বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল মিশা। 'ট্যাংক ছাড়া আর কিসে তোর ভার সইবে বল! ওঃ দারুণ ব্যাপার হবে: চারপাশে লোহা আর মাঝখানে কাঠের থাম।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কাঠের থাম ত কাঠের থাম! এ তোর নাট-বলটু ঘোরানোর কাজ নয়।'

'কিন্তু বাপু ঐ নাট-বলটু ছাড়া তোর ট্যাংক স্রেফ একটা কালা আর অন্ধ বাক্স বৈ আর কিছু নয়!'

'ছাড় দেখি ওসব তোরা!' নিউরা বলল। 'আর আমি হব... কী হব ছাই, জানি না। ভূতত্ত্ববিদ, ইঞ্জিনীয়র, বিজ্ঞানী — সবই ত হতে ইচ্ছে করে আমার। তবে সবচাইতে ভালো বোধ হয় পাইলট হওয়া! অ্যাঁ? এমন কি এই এখনই চোখ বুজলেই আমি দেখতে পাই যেন উড়ছি...'

'বিছানা থেকে আর কি,' বিদ্রূপভরে যোগ করল মিশা।

নিউরা তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে বলল:

'তুই কী বলতে চাস শুনি? মেয়েদের নেয় না — এই ত? আমি কিন্তু হবই হব। আমি সোজা মস্কো চলে যাব, চেষ্টা করে ঠিকই হব, দেখে নিস তোরা!' বলতে বলতে তার বড় বড় চোখদুটো থেকে ক্রোধে এমন নীল আগুন ঠিকরে বেরোতে থাকে যে তার সাফল্য অর্জন সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। সে বাবার দিকে ঘুরে বলে: 'ঠিক কিনা বাবা, অ্যাঁ?'

'ঠিকই বলেছিস নিউরা। মনের মতন কাজ বেছে নিতে পারলে অবশ্যই ভালো। তবে সত্যিকারের সৈনিক কোন বাছবিচার করে না, দরকার পড়লে তাকে যখন যেখানে দেবে সেখানেই সে খাড়া হয়ে থাকবে... আর সাহস ও দক্ষতা সব কাজেই দরকার, নইলে নিজেরা ত মারা যাবেই অন্যদেরও মারবে। এই ধর না, আমাদের টর্পেডো-বোটেই একটা ঘটনা ঘটেছিল...'

'এফিম কাকা, আপনি তাহলে নেভীতে ছিলেন?' সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল মিশা।

'ছিলাম। গোটা যুদ্ধের সময়টায় ছিলাম বল্‌টিকে... ঘটনাটা অবশ্য ঘটেছিল যুদ্ধের একেবারে গোড়ার দিকে, যখন জার্মানরা বলটিক অঞ্চলে সবে ঢুকেছে, জাহাজ-টাহাজ তখনও ওরা ডুবে রাখতে শুরু করে নি। আমাদের টর্পেডো-বোটটা ঘুরে ঘুরে চৌকি দিচ্ছে। অল্পস্বল্প কুয়াসা করেছে, এরোপ্লেনের ভয় করার কোন কারণ নেই, কিন্তু জলে সাবধান থাকতে হয় — জার্মান ডুবোজাহাজ উঁকিঝুঁকি মারে, আর মাইন তারা কত যে ছড়িয়ে রেখেছে তার কোন গোনাগুনতি নেই! যত রকমের হতে পারে। নতুন হোক, পুরনো হোক যা হাতের কাছে পেত তা-ই ফেলত। আমরা চলছি চলছি এমন সময় সিগন্যালম্যান চেঁচিয়ে বলল: 'ডাইনে মাইন!' সত্যি সত্যিই ভাসছে একটা পুরনো মাইন, ইলেকট্রোকন্‌ট্যাক্‌ট মাইন। যাকে বলে হর্ণমাইন। এই হল ব্যাপার। বেশ কিছুটা দূরে থাকলেও চৌকির অফিসার কম্যাণ্ডারকে রিপোর্ট দিয়ে গতিপথ বদল করলেন — আমাদের টর্পেডো-বোট মাইনটার গায়ে গুলি করার উদ্দেশ্যে আরও দূরে সরে যেতে থাকে। কিন্তু চৌকির অফিসার কম্যাণ্ড না দিয়ে বাইনোকুলর দিয়ে দেখতে থাকেন। দেখেটেখে তিনি বললেন, 'মাইনটা কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত লাগছে।' তৎক্ষণাৎ সকলেই দেখতে থাকে ওটাকে — কেউ বাইনোকুলর দিয়ে, কেউ হাতের মুঠি পাকিয়ে ফুটো করে তার ভেতর দিয়ে, কেউ বা স্রেফ খালি চোখে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ত দেখছেই, সকলেই কিন্তু লক্ষ করে যে এই মাইনটার মধ্যে অসাধারণ কী যেন একটা আছে, কিন্তু সেটা যে কী, বুঝতে পারে না। এদিকে একজন নাবিক — তার চোখদুটো যে-কোন বাইনোকুলরের চাইতে ভালো কাজ করত — এগিয়ে এসে সিনিয়র লেফটেনাণ্টকে বলল: 'কমরেড সিনিয়র লেফটেনাণ্ট, যদি অনুমতি করেন বলি। মাইনের গায়ে ঝুলছে একটা লোক।' সে কী করে হয়? মাইনের গায়ে মানুষ ঝুলতে পারে কী করে? এ ত আর কিণ্ডারগার্টেনের দোলনা নয়, এমন দোলনায় হুস করে আকাশে উড়ে যাওয়াই সম্ভব। কম্যাণ্ডার লাইফবোট খোলার আদেশ দিলেন — এটা হয়ত বা ফ্যাসিস্তদেরই কোন ইতর কারসাজি হবে, আর তাই যদি হয় তাহলে ওটার রহস্য খুঁজে বার করা দরকার, যাতে অন্যেরা তার খপ্পরে না পড়ে। কিংবা এমনও হতে পারে যে কোন লোক মরিয়া হয়ে মাইন আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু লেফটেনাণ্টকে তিনি আদেশ দেন যেন কাছাকাছি না যান, লোকজনকে বিপদে না ফেলে পরিস্থিতি বুঝে কাজ করেন। লাইফবোট ত ছাড়া হল, লেফটেনাণ্ট দাঁড় টেনে সন্তর্পণে এগোতে থাকেন মাইনের দিকে, খুব বেশি কাছাকাছি নয়, যতটা দূরত্ব থেকে দেখা যায়, ততটা। সত্যি সত্যিই মাইনের গায়ে ঝুলছে একটা লোক, মাইনের আঁকশি ধরে আছে। সব দেখেশুনে

মনে হয় লোকটা আমাদেরই: গায়ে স্ট্রাইপ দেয়া নাবিকের ভেস্ট আর চেহারা পুরোপুরি রুশী। ডাকতে দেখা গেল — বেঁচে আছে, মাথা ঘোরাল, কিন্তু গলায় কোন রা নেই। একজন তাকে হেঁকে বলল: 'ওরে ভাই, ধরলাম না হয় বিয়ের পাত্রীটি খাসা, তবু বলি বিয়ের জন্যে অত তাড়াহুড়ো করে কাজ নেই, বিয়ে করার ঢের সময় পাবে 'খন! এখন চলে এসো দেখি, এদিকে!' লেফটেনাণ্ট বললেন, 'ঠাট্টাতামাসা করার সময় এটা নয়। এই নিয়ে দাঁত বার করে হাসা উচিত নয়। লোকটা মরণকে জড়িয়ে ধরে সাঁতরাচ্ছে।' মেট তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল: 'তোর ঐ শয়তানের ঢিবিটা ছেড়ে এখানে সাঁতরে চলে আয়!' কিন্তু লোকটা কেবল মাথা ঘোরায়, মুখে টুঁ শব্দটি নেই, ওটা ছেড়েও আসে না। স্পষ্টই বোঝা গেল যে তার হাতগুলো সেই যে আঁকড়ে ধরে ছিল ঐ ভাবেই সিঁটিয়ে আটকে গেছে আর হয় ঠাণ্ডায় কিংবা ওখানে আতঙ্কে সে গলার স্বর ও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এক্ষেত্রে কী করা যায়? লাইফবোটে চেপে কাছে এগোনো সম্ভব নয়, দড়ির প্রান্তও ছুঁড়ে দেওয়া যায় না — লোকটা ধরে নাও ফেলতে পারে, আর যদি একবার আঁকশিটার গায়ে লেগে গিয়ে টান পড়ে, তাহলে ত আর কোন কথাই নেই — লোকটা ছাই হয়ে যাবে, লাইফবোটেরও কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এই সময় একজন নাবিক বলল: 'কমরেড লেফটেনাণ্ট, যদি অনুমতি করেন ত এই সমুদ্রযাত্রীটিকে আমি উদ্ধারের চেষ্টা করি।' 'ঠিক আছে,' লেফটেনাণ্ট বললেন, 'তবে খুব সাবধান কিন্তু।' নাবিক গায়ের পোশাক খুলে ফেলল, দড়ির প্রান্ত দিয়ে নিজেকে বেঁধে নিয়ে সাঁতার দিতে লাগল। ও যত এগোয় দড়িটাও সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ছাড়া হয়। নাবিক সাঁতরে কাছে চলে আসার পর দেখতে পেল লোকটার কোন চেতনা নেই, বুঝতে অবশ্য পারছে, কিন্তু নিজের হাতদুটোর কোন গতি সে করতে পারছে না — শক্ত হয়ে আটকে গেছে দু'হাত। গলাও গেছে। নাবিক সাঁতরে এলো বটে, কিন্তু কী ভাবে ছাড়িয়ে আনা যায় লোকটাকে? ঢেউ তেমন না থাকলেও ঝাপটা মারছে, আর শয়তানের ঐ যন্তরটা ঢেউয়ের মাথায় নাচছেও — এগোনোর উপায় নেই। আমাদের নাবিক পিঠের দিক থেকে ঐ লোকটার দিকে সাঁতরে গেল, এক হাতে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল — ভালো বলতে হবে যে চুল তার দস্তুরমতো কোঁকড়া ঘন আর লম্বাও — অন্য হাতে সে লোকটার হাতের আঙুলগুলো আলগা করার চেষ্টায় লেগে গেল। এই নিয়ে যা নাজেহালটা তাকে হতে হল যে কী বলব! জল ঠাণ্ডা অথচ তার গরম লাগতে লাগল। লোকটার আঙুলগুলো আঁকড়ার মতো — একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। একটু একটু করে একটা হাত ছাড়িয়ে আনল, তারপর অন্যটা, শেষ কালে সর্বশক্তিতে দু'পায়ে ঠেলা মেরে দূরে সরে এলো, নৌকোয় লোকজন তার দিকে নজর রাখছিল — তারাও সঙ্গে দড়ির প্রান্ত ধরে হেঁচকা টান মারল। দু'জনকে টেনে আনতে থাকে, নাবিক এক হাতে সাঁতর কাটে, অন্য হাতে তাকে ধরে রাখে। এদিকে ঐ লোকটার হাত এমনই জমে গেছে যে সাধুসন্তদের বিগ্রহের মতো উদ্বাহু হয়ে রইল। এদিকে পাজীর পা ঝাড়া মাইনটাও ধীরে ধীরে হলে কী হবে, চলেছে তাদেরই পিছু পিছু — মানে যে দিকে স্রোত বইছে সেই দিকে। তবে লাইফবোটে যারা ছিল

তারা দড়ির গোড়া ধরে ওদের হিড়হিড় করে টানতে লাগল প্রায় জলের তলা দিয়ে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি করা যায়। কাছে টেনে এনে ওদের তোলা হল... তারপর অবশ্য ওরা গুলি করে মাইনটা ধ্বংস করল। ঐ লোকটা সুস্থ হল। স্পিরিট দিয়ে শরীর দলাইমলাই এবং আরও এটা ওটা করা হল। মোট কথা সুস্থ হয়ে উঠল...'

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নিভন্ত পাইপটা জ্বালালেন।

'সেই নাবিক এখন কোথায় ? বেঁচে আছে ?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'বেঁচে আছে। এখন নীপারে বোট চালায়।'

'আর যে লোকটাকে মাইন থেকে সে ছাড়িয়ে আনে ?'

'সেও বেঁচে আছে... আচ্ছা, এখন সবাই ঘুমোও ত, আমি একটু ঘুরে আসি, আমার বিষয়-আশয় একবার দেখে আসি। খের্সনে একটা এক্সপ্রেস যাবার কথা।'

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ চলে যাবার পর ওরা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, প্রত্যেকেই ভাবতে থাকে একটি কথা: আচ্ছা ঐ দুঃসাহসী নাবিকটা যে কাজ করেছিল তা কি তার পক্ষে করা সম্ভব হত ? তাদের মনে মনে ভাবতে সাধ জাগে — হ্যাঁ তারাও পারত, কিন্তু মুখ ফুটে এই কথাটা উচ্চারণ না কারাই শ্রেয় বলে তারা সিদ্ধান্ত করল, কেননা সেটা হবে শূন্যগর্ভ বড়াই: বলতে ত সবাই পারে, কিন্তু একবার চেষ্টা করেই দেখ না...

তাই এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা না করেই তিমোফেই ও মিশা ঘুমিয়ে পড়ে, কোস্তিয়ার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। সে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পায় কুয়াসার হালকা ধোঁয়ায় জড়ানো তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিষণ্ণ মূর্তি, তরঙ্গের বুকে নৃত্যরত আঁকশিওয়ালা মারাত্মক ধাতব গোলক আর সেই লোকটাকে, মৃত্যুর কবল থেকে যে ছিনিয়ে এনেছে তার বলিকে, নিশ্চিত মৃত্যুমুখী, অসাড় একটি নাবিককে...

'কোস্তিয়া ! এই কোস্তিয়া !' সে শুনতে পেল নিউরার ফিসফিসানি। 'জানিস, বাবা কিন্তু আসলে নিজের কথা বললেন। বাবাই তখন নাবিকটাকে মাইন থেকে ছাড়িয়ে আনেন। আসলে এটা বলে বেড়ানো বাবা পছন্দ করেন না। একবার তাঁর কাছে এক বন্ধু আসেন — সেই লোকটা, যে মাইনের গায়ে ঝুলছিল — ওরা ভাবলেন যে আমি ঘুমোচ্ছি, তখন ওরা পুরনো দিনের সমস্ত ঘটনা মনে করে করে বলতে লাগল, আমি কিন্তু ঘুমোই নি, সব শুনছিলাম...'

কোস্তিয়ার মুখ হাঁ হয়ে গেল, সে চোখ বড় বড় করল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ !' নিউরা বলে চলল। 'ঠিক যেমন যেমন ঘটেছে সব শুনলাম। তুই কিন্তু ওঁকে জিজ্ঞেস করবি না, তাহলে রেগে যাবেন। আমি তখন সকালবেলা ওঁকে জিজ্ঞেস করতে বললেন যে ওসব আমি স্বপ্নে দেখেছি, আর আজেবাজে জিনিস নিয়ে আমি যেন তাঁকে জ্বালাতন না করি।'

'আচ্ছা এই রকম !' দরদভরা কণ্ঠে বলল কোস্তিয়া।

'ওঃ! তুই এখনও জানিসই না আসলে কেমন... আমার বাবা হলেন গিয়ে...' নিউরা ভাষা খুঁজে না পেয়ে একটা অনির্দিষ্ট অথচ অত্যন্ত আবেগচঞ্চল ভঙ্গি করে। 'জানিস ত, বাবা আমাকে খুঁজে খুঁজে বার করে আনেন।'

'সেটা কী রকম ?'

'তাহলে শোন্, বলি। নেভী থেকে ত বাবা ফিরলেন। অ্যাঁ ? ফিরে দেখেন মা নেই, আমিও নেই। খোঁজ খোঁজ, এখানে সেখানে — নেই ত নেইই। আসলে হয়েছে কি, এর মধ্যে যুদ্ধের এলাকা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাকে — কোথায় কে জানে। মিলিটারী ট্রেন গেছে পুবের কোন এলাকায়। অমন ত কত লোককেই সরিয়ে নিয়ে গেছে ! আবার এমনও হতে পারে যে আমরা বোমার কবলে পড়েছি, আমরা আর বেঁচে নেই ? অ্যাঁ ? বাবার কিন্তু বিশ্বাস হল না, খুঁজতে শুরু করে দিলেন। কত যে খোঁজাখুঁজি করলেন ওঃ সে আর বলে শেষ করা যায় না ! শেষ কালে খোঁজ পাওয়া গেল। মানে খোঁজ পেলেন সেই জায়গাটার, যেখানে আমরা আগে ছিলাম — কুস্তানাইয়ে। কিন্তু মা তখন আর নেই... মারা গেছেন...' বলতে বলতে নিউরার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। 'আমিও ছিলাম না। আমাকে ততদিনে ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে অনাথ ভবনে, আর অনাথ ভবন ততদিনে চলে গেছে অন্য জায়গা, সেখান থেকে আরও এক জায়গায়। বাবা এখানে ওখানে কতই না ঘোরাঘুরি করলেন ! এবারেও কিছুতেই খুঁজে পান না। শেষকালে কিন্তু খুঁজে পেলেন। গোটা মধ্য এশিয়া চষে ফেলার পর সন্ধান মিলল। এটা অবশ্য আমার মনে আছে, ছেচল্লিশ কালের কথা। তখন বাবা বললেন: 'ওরে আর নয়। চল্, বাড়ি যাই, একসঙ্গে বাস করব।' আমরা তাই চলে এলাম, বাসও করছি। এই জন্যেই ত বাবা কাজ নিলেন বয়া-তদারককারীর। উনি নাবিক যে, স্টীমারে কাজ নিতে পারতেন, নয়ত সমুদ্রের জাহাজে, কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছে ওঁর ছিল না। বললেন, 'আবার যদি হারিয়ে যাস্ !' '

'বেশ মানুষটি তোর বাবা !'

'হ্যাঁ। কেবলা মা যদি বেঁচে থাকতেন !.. মা থাকাটা যে কী ভালো !.. '

নিউরার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল গভীর বিষাদ। কী বলা যায়, কী ভাবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় বুঝতে না পেরে কোস্তিয়া চুপ করে রইল।

'তোর আর কী ? — তোর ত মা আছেন ! তোর মা'র কথা বল্ না, বল্ না কেমন তোর মা। অ্যাঁ ?'

'কেমন আবার কী ?' হকচকিয়ে গিয়ে কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল। 'সাধারণ। মা'রা যেমন হয়ে থাকে...'

যেন আপনার ইচ্ছায় নয়, এই ভাবে সে দেহের ভঙ্গি বদল করল, যেন তার মুখ এমন কি কান পর্যন্ত আগুনের তাপে জ্বালা করছে বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল ধুনি থেকে। সে আশ্চর্য

হয়ে গেল, লজ্জা বোধ করল এই ভেবে যে নিজের মা'র সম্পর্কে তার বলার কিছুটা নেই, তাঁর সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

হ্যাঁ বাবার কথা — আলাদা। বাবা মারা যান যুদ্ধে, কোস্তিয়া তখন একেবারেই ছোট, কিন্তু ক্যাপ্টেন গলভানভ কোন্ ডিভিশনে কাজ করতেন, কোন্ কোন্ পুরস্কার তিনি পেয়েছেন, কী জন্য পেয়েছেন — এসব তার বেশ জানা আছে।

কিন্তু মা'র কথা সে কখনও ভাবে নি। কোস্তিয়া নিজের কাজে এত ব্যস্ত থাকত যে মা'র কথা ভাবার অবকাশই তার হয় নি। আর ভাবারই বা কী আছে? তার যখন ঘুম ভাঙে তখন উঠে দেখে টেবিলে সকালের খাবার — এটা মা'র কাজ। স্কুল থেকে এসে দেখে তার জন্য দুপুরের খাবার তৈরি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা, কিংবা নতুন জুতো, নয়ত ওভারকোট দরকার — হাজির হয়ে যায়, আর এটাও বলাই বাহুল্য, মা'র কাজ। কোস্তিয়ার যা যা দরকার, সবই তিনি করেন, এর বেশি আর কিছু কোস্তিয়া ভাবতও না। কোস্তিয়া দুষ্টুমি করলে, লিওল্কার পেছনে লাগলে মা রাগ করেন, তাকে খুব বকাবকি করেন। আর কী বলার আছে!

নিউরা অনেকক্ষণ হল গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে, এদিকে কোস্তিয়া ফোঁসফোঁস নিশ্বাস টানতে টানতে এপাশ-ওপাশ করতে করতে মনে করার চেষ্টা করে, ভাবে আর ভাবে। দেখা গেল মনে করার মতো অনেক জিনিসই আছে।

সে অস্পষ্টভাবে মনে করতে পারে তার নিজের কথা, যখন সে খুবই ছোট ছিল। তখন তারা কিয়েভে থাকত না, থাকত বার্নাউলে, যেখানে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে বয়ে চলত তুমুল বরফ-ঝড়। শীতকালে বরফ-ঝড় মানুষকে উলটে ফেলে দিতে পারত, লোকে শীতে জমে যেত, আর গরমকালে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস শহরের ওপর দিয়ে বইয়ে দিত ধুলো আর বালির ঝড়। যতই নিজেকে জড়িয়ে রাখ না কেন, যেখানেই লুকোও না কেন, সর্বত্র বালি আর বালি — জিনিসপত্রের গায়ে, জামাকাপড়ে, দাঁতে কিচকিচ করে।

শীতকালে কোস্তিয়ার পরনের কিছু না থাকায় মা ওকে রাস্তায় যেতে দেন না। কম্বল গায়ে জড়িয়ে সে জানলার পাশে বসে থাকে, বসে বসে সাদা বরফ-ঝড়ের ঘূর্ণি দেখে, মা'র জন্য অপেক্ষা করে। মা আসেন অনেক দেরিতে, নানা রকম কাপড়ে জড়ানো, তাঁকে দেখায় একটা বোঁচকার মতো, পায়ে তাঁর বিশাল একজোড়া ফেল্ট বুট। মাকে তখন দেখলে মনে হয় মোটা, কিন্তু ওপরের জামাকাপড়ের খোলস ছাড়ার পর দেখা যায় ছোট্ট আর রোগা। মা উনুন জ্বালান, কোস্তিয়াকে খাওয়ান, ফের যদি হাসপাতালে যেতে না হয় তাঁকে, তাহলে ওরা গরম উনুনের পাশে বসে, খানিকটা কথাবার্তা বলে।

মা নার্সের কাজ করেন। ডিউটিতে যাবার সময় তিনি কোস্তিয়ার জন্য রেখে যান আলুসেদ্ধ কিংবা কদাচিৎ জাউ আর রুটি। রুটি কম, তাই মা ওকে বলেন একবারে সবটা না খেয়ে যেন একটু একটু করে খায়। কোস্তিয়া কথা দেয়। কিন্তু দিন দীর্ঘ, অপেক্ষা করতে করতে

মনমেজাজ বিগড়ে যায়, তার ফলে খিদে পায় আরও বেশি। কোস্তিয়া একটু একটু করে চিমটি কেটে রুটি খায়, নিজের অজানতেই পুরোটা খেয়ে ফেলে। শেষকালে মা যখন আসেন তখন কোস্তিয়া ক্ষুধার্ত, গেরস্তের কুকুরটার মতো। সে খেয়েই চলে, কেবল পেট ভরে যাবার পরই তার মনে পড়ে যায়:

'মা, তোমার কি রুটি নেই নাকি? শুধু আলু খাচ্ছ যে?'

'খা, খা,' মা মৃদু হাসেন। 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। তাছাড়া তোর যে বাড়ন্ত বয়স, আমি ত বড় হয়েই গেছি, আর বড় হওয়ার নেই...'

কখন কখন রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কোস্তিয়া দেখে মা একটা কুপির ধারে বসে আছেন, তাঁর কাঁধদুটো নিঃশব্দে অল্প অল্প করে কাঁপছে। তার কারণ হল এই যে বহুকাল বাবার কোন চিঠিপত্র নেই, মা তাঁর পুরনো চিঠিগুলো সামনে রেখে কাঁদছেন। কোস্তিয়া ইচ্ছে করে এপাশ-ওপাশ করতে থাকে, মা তখন কুপি নিভিয়ে দিয়ে তার পাশে এসে শুয়ে পড়েন, কোস্তিয়ার গা-হাত-পা গরম হয়, সে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাবা যখন ফ্রন্ট থেকে আসতেন তখন মা'র দিকে কোস্তিয়া ফিরেও তাকাত না। সে বাবার মেডেল আর কাঁধপটিগুলি পরে দেখত, যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করত আর সর্বক্ষণ তাঁর পেছন পেছন ঘুরঘুর করত। ওর মনে আছে যে মা তখন হয়ে উঠতেন আরও সুন্দরী, সবার চাইতে হাসিখুশি। ছুটোছুটি করতেন, হাসতেন একটা ছোট মেয়ের মতন, কোস্তিয়াকে ধরে ঝাঁকুনি দিতেন, সর্বক্ষণ গান গাইতেন। বাবা খুশি ভরা চোখে মাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন, তিনিও হাসতেন...

আর বাবা যখন যুদ্ধে মারা গেলেন তখন মা হয়ে গেলেন আবার তেমনি, যেমন ছিলেন বার্নাউলে থাকতে। তবে তাঁকে দেখাত আরও ফেকাসে, আরও বিষণ্ণ। কোস্তিয়ার বয়স তখন ছয়, আর লিওল্কা তখনও পেরাম্বুলেটারে শুয়ে থাকত। পড়শী মহিলা মারিয়া আফানাসিয়েভনা আসতেন, চৌকাটের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যথাতুর করুণ দৃষ্টিতে লিওল্কা ও কোস্তিয়ার দিকে তাকিয়ে বলতেন: 'অনাথ হলি রে তোরা, অনাথ হলি! কী যে দশা হবে এখন তোদের!'

একদিন মা রেগে গিয়ে বললেন:

'মারিয়া আফানাসিয়েভনা, আপনার কাছে অনুরোধ, আমার বাচ্চাদের জন্যে আক্ষেপ করবেন না — ওদের মা আছে!'

সেই সময় মা ইনস্টিটিউট শেষ করতে চলছিলেন, রোজ তিনি ক্লাসের লেকচার শুনতে যেতেন। বাবার মৃত্যুসংবাদ আসার পর মা ফের নার্সের কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইনস্টিটিউটেও যেতেন। ফিরতেন দেরিতে, এমনও হত যে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর কোস্তিয়া দুপুরের খাবার পেত না, দেখত মা হাতের কাজ ছেড়েছুড়ে দিয়ে চোখ বুজে টেবিলের ধারে

বসে আছেন। কোস্তিয়া রাগ করে তার বইপত্র বোঝাই ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গজগজ করে বলত কেবল পড়, পড়, পড়, কিন্তু খেতে দেবার বেলায় ত সময়ের ঠিক নেই।

'রাগ করিস নে রে কোস্তিয়া,' ক্লান্তস্বরে মা বলতেন। 'এক্ষুনি...'

পেট পুরে খেয়েদেয়ে কোস্তিয়া ছুট দিত বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে। যখন বাড়ি ফিরে আসত তখন মা হয় কোন কিছু সেলাই করছেন, নয়ত কাচছেন। আর কোস্তিয়া অবাক হয়ে ভাবত: মা'দের এ কেমন ধারা — সারা সময় সেলাই আর কাচাকাচি, যেন এর চাইতে আনন্দের কাজ আর নেই !

কখন কখন মা কোস্তিয়াকে বলতেন লিওল্‌কার সঙ্গে একটুখানি খেলতে কিংবা ঘরদোর ঝাঁট দিতে। কোস্তিয়া তাতে বিরক্ত হয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলত:

'আমার হয়ে পড়াটা মুখস্থ কে করবে শুনি ? লিওল্‌কা বুঝি ?'

মা কিছু না বলে নিজেই ঘর ঝাঁট দিতেন।

কোস্তিয়া অনেকক্ষণ ধরে ঝনঝনে বর্ষাতিটার ওপর এপাশ-ওপাশ করতে লাগল, কিন্তু যে পাশেই শোয়, কেমন যেন শক্ত শক্ত আর অস্বস্তিকর ঠেকে তার। সে মনে মনে অনেক রকম প্রতিজ্ঞা করে, কথা দেয়, শেষকালে লজ্জায় আর দেরিতে-আসা-অনুশোচনায় অবসন্ন হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কী তোমার বৃত্তি ?

'কোস্তিয়া ! ওঠ্‌ রে কোস্তিয়া !' ওর ঘুম ভেঙে যায় নিউরার ডাকাডাকিতে। 'ছেলেরা এর মধ্যে মাছ ধরতে শুরু করে দিয়েছে। তুই বুঝি বরাবরই এমন ঘুমোস ? অ্যাঁ ?'

সঙ্গে সঙ্গে গতকালের কথাবার্তা মনে পড়ে যেতে কোস্তিয়ার ওঠার ইচ্ছে, মাছ ধরার ইচ্ছে চলে যায়। সে কোন জবাব না দিয়ে অন্য পাশে ফিরে শোয়।

'চাস না — তাহলে যা খুশি কর্‌ গে,' নিউরা বলল। 'তাহলে আমি নিজেই ধরব।'

কোস্তিয়া শুনতে পেল ছিপ নিয়ে ওর চলে যাবার শব্দ। তখন সে উঠল। যাক গে ! ভারী আমার বয়ে গেছে ! — ফের যদি গতকালের কথাগুলো শুরু করে দেয় ?.. সূর্য এখনও ওঠে নি, কিন্তু এরই মধ্যে প্রায় ফরসা হয়ে এসেছে। নদীর বুকের ওপরে আবার গলে গলে পড়ছে হালকা ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াসা। নদীর দিক থেকে যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল তাতে কোস্তিয়া জড়সড় হয়ে গেল, গুটিগুটি চলতে লাগল দ্বীপের শেষ প্রান্তের উদ্দেশ্যে। 'মজা খাঁড়ির' তীরে বসে আছে মৎস্যশিকারীরা: তিমোফেই স্থির হয়ে বসে আছে, নিউরা আর মিশা বসে বসেও ছটফট করছে।

নীচে নদী তখনও স্থির, অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার বুকের ওপর দিয়ে চলছে একটি নৌকো। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ প্রাতঃকালীন বয়া তদারকের কাজ শেষ করছেন।

‘এফিম মামা!’ কোস্তিয়া চেঁচিয়ে বলল তাঁকে। ‘আমাকে সঙ্গে নিন!’

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নৌকো ভিড়ালেন, কোস্তিয়া লাফিয়ে উঠে বসল নৌকোয়, ওরা এগিয়ে গেল আরও দূরে। মামা কোস্তিয়াকে দাঁড় বাইতে দেন না: ওর ফোসকা এখনও যায় নি; কোস্তিয়া হালের বৈঠা ধরে থাকে, গতিপথ ঠিক করে, ক্বচিৎ দরকার হলে বৈঠা বায়। ওরা দু'জনেই চুপচাপ যে যার কাজ করে চলে।

এই শান্ত পুরুষালী নীরবতা কোস্তিয়ার বেশ লাগছে, বেশ লাগছে নিথর কালো জলের মধ্যে বৈঠা ফেলতে, বৈঠার নীচে তার কলকলধ্বনি শুনতে আর তাদের সামনাসামনি ছড়িয়ে থাকা জলের প্রশস্ত উপরিভাগ দেখতে।

‘শয়তানের দাঁত’-এর কুর্নিশরত লাল বয়াটা পেছনে পড়ে রইল — ওটার আলো ওরা নেভাবে ফিরতি পথে — দ্বীপটা সরে যাচ্ছে পেছনে। ওরা সাদা বয়াগুলোর ওপরকার বাতি নেভায়, তারপর পার হয়ে চলে আসে ডান তীরে, নৌকো স্রোতের টানে ছেড়ে দেয়, একের পর এক লাল বয়াগুলোর আলো নেভাতে থাকে।

মৎস্যশিকারীরা ততক্ষণ তীরে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। নিউরা অধীর হয়ে নাচতে থাকে, সে তার জ্যান্ত চকচকে শিকারের পেটের দিকটা সামনে তুলে ধরে দোলাতে দোলাতে দেখায়। মিশা কী নিয়ে যেন তিমোফেইয়ের সঙ্গে বাদবিতণ্ডা লাগিয়ে দিয়েছে, তিমোফেই ধীরে ধীরে সুতো থেকে মাছ ছাড়িয়ে নিয়ে বালতির ভেতরে ফেলল।

তিমোফেই ও মিশা ফের দাঁড় ধরল, এদিকে শব্দের তোড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দম আটকাতে আটকাতে নিউরা বলে চলেছে কী বিরাট বিরাট সমস্ত মাছ তার বঁড়শী থেকে ফসকে বেরিয়ে গেল। তিমোফেই ভালোমানুষী হাসি হাসল, আর মিশা নিউরাকে ভেঙচি কেটে বলল যে বেঙাচির সঙ্গে মাছের তফাত জানে না আবার মাছ ধরতে বসা চাই।

নৌকো তীরে এসে ভিড়ল, তিমোফেই ও মিশা যার যার বালতি উঠিয়ে নিল।

‘কোস্তিয়া, তুই আসিস!’ মিশা বলল। ‘আমি তোকে রেডিও সেণ্টার দেখিয়ে দেব।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আসিস,’ তিমোফেই সায় দিয়ে বলল, ‘আমরা তোকে সব দেখাব।’

ওরা চলে যায় কিন্তু কয়েক পা ফেলার পর থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল:

‘চলি তাহলে এফিম কাকা! ফের আসব আমরা, কী বলেন?’

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নৌকোটাকে তীরের একটু ওপরের দিকে ঠেলে তুলতে থাকেন। কোস্তিয়া তাঁকে সাহায্য করে। রাতের কথাবার্তার পর তার কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে এমন কাজ করে যাতে মামার ভালো লাগে। ব্যাপারটা ঠিক তোয়াজ করা নয়, কোন প্রশংসার প্রত্যাশা নয় — কোন রকম প্রশংসা ছাড়াই তাঁকে সাহায্য করতে, এমন কি স্রেফ তাঁর পাশে পাশে থাকতে কোস্তিয়ার বেশ লাগছে।

সরঞ্জামাদি তুলে নিয়ে মামা চলে যান বিশ্রাম করতে — রাতে তিনি ঘুমোন নি — নিউরা আবার মেঝে ধোয়, তারপর রান্নাবান্নার আয়োজন করে, কোস্তিয়া একা পড়ে যায়। সে জলে স্নান

করে, ঝাঁপাঝাঁপি, দাপাদাপি করে, কিন্তু একা একা স্নান করতে বিশ্রী লাগে, আর লাফঝাঁপ? — যখন তোমার লাফ দেওয়া কেউ দেখলই না তখন মজার কী রইল?

নদীর তীরে ভিড়ানো নৌকোর পাছগলুইয়ে বসে কোস্তিয়া জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। যাই বল না কেন, কী বিরাট এই নদী! কিয়েভে, বিশেষত ওপর থেকে, ভ্লাদিমির টিলা কিংবা 'পয়লা মে' বাগান থেকে দেখলে তাকে মনে হয় সরু আর চাপা-চাপা। গরমকালের মাঝামাঝি সময় আর শেষের দিকে ত্রুখানভ দ্বীপের বালির রাশি চলে আসে প্রায় ডান তীরের দিকে, আর তার ওপরকার ঘাটাগুলি হয়ে ওঠে লম্বা লম্বা অসমাপ্ত সেতুর মতো — এতই সংকীর্ণ হয়ে যায় নদী, শুকিয়ে যায় তার জল। এক সময়কার শিকলি-সেতুর ভিত্তিস্তম্ভগুলির মাঝখানে মাঝখানে প্যাণ্ট গুটিয়ে ঘুরে বেড়ায় মৎস্যশিকারীরা। মা জানতে পারলে তাকে খুব একচোট দেবেন এই আশংকা যদি কোস্তিয়ার না থাকত তাহলে সে এপার-ওপার সাঁতরে বেড়াত। বলাই বাহুল্য একা নয়, এই ধর না কেন, ফিওদরের সঙ্গে।

এখানে এপার-ওপার করার উপায় নেই। জলের দিকে মাথা নোয়ালে বাঁ তীরটা মনে হয় একেবারেই নীচু, যেন অনেক দূরে। আর সত্যিই অনেক দূরে, দাঁড় টানতে পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে যেতে হয়। স্রোতও দ্রুত। কলকল জলধারা অবিরাম মৃদু লীলায়িত তরঙ্গবিক্ষেপে কোস্তিয়ার পা জলের ওপরে ঠেলে দিচ্ছে; নদীর ঠিক তলদেশে তারের মতো লম্বা টান টান হয়ে চলে গেছে, কাঁপছে জলের গাছগাছড়ার সবুজ সুতো।

কোস্তিয়া মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে জলের উপরিভাগের এই ঝলমলে লহরী থেকে অন্ধকার তলদেশ পর্যন্ত, যেখানে শুঁড় উঁচিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে খোঁড়লের ভেতরে পড়ে আছে বোয়ালমাছেরা, সেখানে, এই বিশাল, পাহাড়ী তীরভূমি থেকে শুরু করে বাঁ দিকের নীচু তলদেশ অবধি, সমগ্র বিস্তার ও গভীরতা জুড়ে ছুটে চলেছে দৃঢ়বদ্ধ, আন্দোলিত, ঘন জলরাশি। চলেছে প্রতি মুহূর্তে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, বছরের পর বছর, কি শীতে, কি গ্রীষ্মে — ক্ষণিকের জন্যও থামে না, শুকিয়ে যায় না।

এর আগে নদী বলতে কোস্তিয়া বুঝত এমন একটা জায়গা যেখানে স্নান করা যায়, উঁচু থেকে ঝাঁপ দেওয়া যায়, রোদে শরীর পোড়ানো যায়, নৌকোয় আর লঞ্চে চেপে ঘোরা যায়। ক্লাসে ভূগোলের মাস্টারমশাই বলেছেন যে নদী হল 'জলপথ', 'সাদা কয়লা', কিন্তু এই কথাগুলির নিজস্ব অর্থ থাকলেও তার কাছে প্রধান ছিল স্নানের ঘাটের জ্বলুনি ধরানো বালি, জলের ওপর চোখ ধাঁধানো আলোর নাচন আর ছিপের সুতোয় পুঁটিমাছের ধড়ফড়ানি।

এখন কিন্তু নদীকে সে দেখছে অন্য রূপে। পরম নিশ্চিন্তে বয়ে নিয়ে চলেছে তার জলরাশি, তরঙ্গমালা তার বক্ষদেশে যত আঁচড়ই দিক না কেন, যত বিদীর্ণই করুক না কেন স্টীমারের চাকা আর প্রপেলার, নদী রয়ে যায় তেমনই নির্বিকার আর গরীয়সী।

এদিকে স্টীমার চলেছে একের পর এক। ছোট বড় নানা আকারের। সাদা আর নানা সাজে

সজ্জিত — যাত্রিবাহী আর ছাইরঙা — টাগবোট। কোন কোনটা চলেছে দ্রুতগতিতে, স্বচ্ছন্দে, একা একা, কোনটা বা গুরুভারে, মন্থরগতিতে, কষ্টেসৃষ্টে টেনে নিয়ে চলেছে সারি সারি গাধাবোট অথবা ভেলা। প্রতিবারই দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ওপরের দিক থেকে তারা রীতিমতো সতর্ক করে দিয়ে ভোঁ মারে: 'সরে যাও, আসছি-ই-ই!' আর সঙ্গে সঙ্গে শৈলশ্রেণীর পেছনে তীরভূমি অবারিত হয়ে যায় — যেন বলে, দেরি না করে এগিয়ে যাও...

নিউরা রান্নাবান্না শেষ করে বাবাকে ডেকে তোলে, কোস্তিয়াকে ডাকে সকালের খাবার খেতে।

'বাবা, আমরা গাঁয়ে দিদার কাছে যাচ্ছি,' নিউরা বলল। 'কেমন? অ্যাঁ? কতকাল যে যাই নি কী বলব! দিদা যে আমাদের কাছে আসতে পারেন না। অ্যাঁ? তাছাড়া পাহাড়েও উঠতে পারেন না। আমরা এক ছুটে যাব আর আসব। বন্ধুদের কাছেও যাব। দুপুরের খাবার আমি তৈরি করে রেখেছি, তুমি গরম করে নিও। অ্যাঁ?'

ওরা তৃণভূমির ওপর দিয়ে চলল 'গর্জন খাতের' দিকে। পায়ের নীচ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে ফড়িংয়ের দল, মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়ছে মশা আর পোকামাকড়ের ঝাঁক। আগাছায় ভর্তি 'মজা খাঁড়ির' ভেতরে কোথায় যেন বেঙেরা গ্যাঙর গ্যাঙর ও আর্ত চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। নিউরা যখন তখন ঝুঁকে পড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে সাদাসিধে ফেকাসে রঙের ফরগেট-মি-নট ফুল, বেগনী-নীল রঙের শুঁটিজাতীয় গাছের ফুল আর সাদা-হলুদ মেশানো বুনো ডেইজী। ফুলগুলি থেকে ভেসে আসছে নদীর স্নিগ্ধ বাতাসের আর খড়ের মৃদু ও কোমল ঘ্রাণ।

ঘন ঘাসে ছাওয়া চওড়া রাস্তাটা নির্জন। কেবল মাঝখানে যেখানে যেখানে চাকায় আর খুরে পথ দেবে গেছে সেখান থেকে দমকে দমকে উড়ছে ধুলোর কুণ্ডলী। সেখানে মুরগীরা ধুলোর মধ্যে দাপাদাপি করছে, গা ঝাড়ছে, ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, ধুলো ছড়াচ্ছে, আবার ধুলোর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কঞ্চির বেড়া আর চেরি বাগানের ছায়ায় গোলাপী জিভ বার করে প্রচণ্ড গরমে শুয়ে শুয়ে ধুঁকছে কুকুরেরা। তারা দৃষ্টি দিয়ে নিউরা ও কোস্তিয়াকে অনুসরণ করে ফের চোখ বোজে। কেবল একটা বড়সড় কুকুর সামান্য উঠে দাঁড়িয়ে অলস ভঙ্গিতে সর্দিলাগা খাদের স্বরে গরগর আওয়াজ তুলল; কোন এক কালে বেঁধা চোরকাঁটার শুকনো চড়চড়ে অবশিষ্টাংশে জর্জরিত লোমশ লেজটা তুলে সে নাড়াল, যেন ঠিক করতে পারছিল না রেগে গিয়ে যথোচিত তর্জন গর্জন করা ঠিক হবে কিনা, নাকি উলটে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাবে। কিন্তু দুটোর যে কোনটা করার পক্ষেই বড় বেশি গরম। নিউরা ও কোস্তিয়া তার দিকে কোন মনোযোগ দেয় না, আর সেও একই জায়গায় একটু পাক দিয়ে ফের এসে শুয়ে পড়ল।

দিদার কুটিরটা আঙ্গিনার অনেকটা ভেতরে। গোলাপের ঝোপঝাড়, বাহারী ফুলগাছ আর ড্রাগনমুখী ফুলের লাল, বেগনী পরাগকেশরের আড়ালে চোখেই পড়ে না।

দিদাকে ওরা খুঁজে পেল সবজি বাগানে। ছোটখাটো চেহারার, বলিরেখা আঁকা বৃদ্ধার চোখদুটি নিষ্প্রভ হলেও এক কালে সম্ভবত নিউরার চোখের মতোই নীল ছিল।

'নাতনি নাকি?' বলতে বলতে তাঁর মুখের বলিরেখা দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল প্রসন্ন হাসিতে, যেন প্রতিটি রেখা হাসছে। 'এসে ভালোই করেছিস! এটা কে রে? ও এফিমের ভাগ্নে বুঝি? কী সুন্দর দেখতে রে!.. বেশ বেশ!.. চল্ চল্ বাড়ির ভেতরে যাই।'

কুটিরের জানলাগুলিতে চেরি গাছের আড়াল থাকায় রাস্তার প্রচণ্ড তাপের পর ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আর অন্ধকার অন্ধকার লাগছিল।

'এই বারে বসে পড়, দুধ খাও... বাপের সঙ্গে গেরস্থালির কাজ কেমন চলছে রে?'

নিউরার মুখে কথার খৈ ফুটতে লাগল, ততক্ষণে দিদা টেবিলের ওপর দুধ আর রুটি রাখলেন।

কোস্তিয়া প্রথমে ভদ্রতা বজায় রেখে দুধ খায়, তারপর দেখতে দেখতে দুধে টৈটুম্বুর হয়ে ওঠে, শেষ পর্যন্ত তার পেটের ভেতরটা ছলাৎ ছলাৎ করতে থাকে। এই স্নিগ্ধ ছোট্ট কুটিরটাকে এবং শান্তপ্রকৃতির স্নেহময়ী দিদিমাটিকেও তার বেশ লাগে।

'আমরা চলি দিদা!' নিউরা চেঁচিয়ে বলল। 'আমাদের যেতে হবে মিশার কাছে, তিমোফেইয়ের কাছেও...'

'যা যা,' দিদা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে বললেন। 'তবে হ্যাঁ, পরে আসিস একবার, তোদের জন্যে আমি ননী তৈরি করে রেখেছি...'

রৌদ্রদগ্ধ রাস্তাটাকে এত দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছিল যে কোস্তিয়ারও শেষ অবধি ইচ্ছে হতে লাগল ধপ করে কঞ্চির বেড়ার আড়ালে শুয়ে পড়ে অবসন্ন কুকুরটার মতো জিভ বার করে ধুঁকতে থাকে।

'এই ত আর দেরি নেই... এই যে এসে গেছি,' নিউরা বলল।

একটা ছোট্ট খোলার বাড়ি, জানলাগুলি খোলা, হাঁ হয়ে আছে; এখানকার আর সব বাড়ির মতো এই বাড়িটাও গাছপালার ছায়ায় লুকিয়ে আছে। দরজায় ঝুলছে কঠোর বিধিনিষেধ লেখা একটা ফলক: 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ'।

'কী করে ঢুকব তাহলে আমরা?' কোস্তিয়া ভেবাচেকা খেয়ে বলল।

'ও কিছু নয়... এক্ষুনি!' এই বলে নিউরা তীক্ষ্ম শিস দিল।

সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জানলার ধারে এসে দেখা দিল এক অল্পবয়সী যুবক। তার গায়ে ফৌজী আঁটো জামা, রোদে সেটার রঙ জ্বলে গেছে, কোন কাঁধপটি নেই; লোকটার মাথার সামনের দিকে যে চুলের ঝুঁটি তাও রোদে পুড়ে ঝলসে গেছে।

'এসব কোন্ সিটিবাজের দল এসে জুটল?' ভুরু কুঁচকে রাগের ভান করে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি, ফিওদর পাভ্লভিচ,' থতমত খেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল নিউরা। 'আমি, মিশাকে ডাকছি। মিশা আছে? আপনাদের রেডিও সেণ্টারটা আমাদের দেখতে দেবেন? আমি

অবশ্য দেখেছি, কিন্তু ও দেখে নি। এ হল আমার পিসতুত ভাই। আমার পিসির ছেলে... বাবার বোন — ওর মা।'

'এও রেডিও অপারেটর নাকি ?'

'না, অপারেটর নয়। আমরা কেবল দেখতে চাই, কিছু ছোঁব না। সত্যি বলছি, পাইওনীয়রের দিব্যি !'

'ছোঁবে না ত ?' ফিওদর পাভ্‌লভিচ চোখ কোঁচকাল। 'মিশা !' হাঁক দিল সে। 'তোর বন্ধুরা এসেছে রে।'

মিশা দেউড়িতে বেরিয়ে এলো, ওদের নিয়ে চলে গেল বাড়ির ভেতরে। সে চেষ্টা করে ধীরে ধীরে চলাফেরা করতে, ধীরেসুস্থে আর গুরুগম্ভীর চালে কথাবার্তা বলতে — স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ফিওদর পাভ্‌লভিচের অনুকরণে, তবে এ ব্যাপারে সে তেমন একটা সফল হচ্ছে না।

'এই দেখ,' সে বলল, 'এটা হল রিসিভিং-এর যন্ত্র, আর এটা অ্যামপ্লিফায়ার। এরিয়ালে ধরা পড়ে রেডিও ওয়েভ যায় এখানে, এখানে তার শক্তি বাড়ে, আর তারপর... নিউরা, হাত সরা !.. তারপর যায় রেডিও পয়েণ্টগুলোতে। পাওয়ার আমাদের নিজেদের, যৌথখামারের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে।'

ঘরটাতে সাজানো আছে লোহার আলমারি, হালকা ছাই-ছাই রঙকরা ছোট ছোট আলমারি। সেগুলির ওপর এটা ওটা অসংখ্য হাতল আর বোতাম। নিউরার মতন কোস্তিয়ারও ইচ্ছে হচ্ছিল সেগুলি একটু ছুঁয়ে দেখে, কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। মিশা একা থাকলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু এখানে আবার বসে আছে এই ফিওদর পাভ্‌লভিচ, বাঁ পাটা সরিয়ে রেখেছে — নকল পা বলেই মনে হচ্ছে — স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে জটিল কী একটা জিনিসের মধ্যে যেন খোঁচাখুঁচি করছে, ওটার ভেতর থেকে এদিক-ওদিক বেরিয়ে আছে নানা রঙের তারের ছেঁড়া টুকরো। তার সামনে টেবিলের ওপরে আছে লাউডস্পীকারের বাক্স, বাক্সটার ভেতরে নানান স্বরের কেমন যেন ফিসফিস শোনা যায়, কলবল করছে গানবাজনার আওয়াজ !

'আগে আমরা কেবল মস্কোর আর কিয়েভের প্রোগ্রামই ব্রডকাস্ট করতাম। এখন স্টুডিওকে সাজানো হয়েছে, আমরা এখন নিজেরাই রিপোর্ট, শৌখিন শিল্পীদের অনুষ্ঠান — সবই প্রচার করতে পারি। যৌথখামারের সভাপতিমশাই বল আর কর্মিবাহিনীর প্রধানই বল — সরাসরি রেডিওর মারফত কাজের বিষয়ে নির্দেশ ঘোষণা করতে পারেন। আগে কী হত ? — ছোটখাটো কিছু একটা জানানো দরকার, অমনি ছোট বাড়িতে বাড়িতে, আর এখন — মাইক্রোফোন তুলে নাও — আর কোন ঝামেলা নেই: 'ইয়াকভ লুকিচ, আপনাদের ওখানে রবিশস্যের ক্ষেতের খবর কী ? উঠে পড়ে লাগুন, উঠে পড়ে লেগে পড়ুন ! কী বললেন ? ফসল কাটার মেশিন ভেঙে গেছে ? এক্ষুনি... কামারের দরকার ? কুজমা স্তেপানিচ ! শিগগির, দেখ ত লুকিচের ওখানে ফসল কাটার যন্ত্রের অবস্থাটা কী...' দারুণ, তাই না ?'

'দারুণ!' কোস্তিয়াকে মানতে হয়। 'তা, তুই এখানে কী করিস?'

'ডিউটি দিই। ফিওদর পাভ্‌লভিচকে সাহায্য করি। দরকার হলে এটা-ওটা মেরামতও করি। আমি সব পারি!'

'বড়াই করিস নে বলছি মিশা!' মাথা না তুলেই বলল ফিওদর পাভ্‌লভিচ।

'আজ্ঞে, তা যা বলেন, ফিওদর পাভ্‌লভিচ!.. এখানে তুই কত দিন থাকবি?.. অল্প কিছুদিন... নইলে আমি তোকে শিখিয়ে দিতে পারতাম। আমাদের এখানে রেডিও ক্লাব আছে, পনেরো জন সভ্য। তা, সব্বাই চর্চা করে, তবে সবার চাইতে ভালো...'

'মিশা...' টেবিল থেকে ওকে সাবধান করে দিয়ে শোনা গেল কণ্ঠস্বর।

'যে আজ্ঞে, ফিওদর পাভ্‌লভিচ!.. মানে, যারা ভালো বোঝেশোনে তাদেরই ডিউটি করতে দেওয়া হয় রেডিও সেণ্টারে। এই রকম আমরা চারজন আছি। আমরাই পালা করে ডিউটি দিই। তুই রেডিও ক্লাবে কাজ করিস?'

'না। আমাদের বাড়িতে 'রেকর্ড' রেডিও।'

'হুঁঃ 'রেকর্ড'! ওটা আবার একটা রেডিওসেট হল নাকি?.. 'রেডিওটেকনিক' যদি বলতিস তাহলে বুঝতাম! রেডিও স্টেশনে গেছিস কখনও?'

'ওখানে কি ঢুকতে দেয়?'

'একা একা ঢুকতে দেয় না, তবে এক্সকার্সনে গেলে দলের সঙ্গে দেয়। সত্যি কিনা, ফিওদর পাভ্‌লভিচ? ইস, তোর জায়গায় আমি হলে!..' মিশার মুখভঙ্গিতে এবং তার সর্বাঙ্গের আন্দোলনে এমন উদগ্র আবেগ প্রকাশ পেল যে কোস্তিয়ার জায়গায় হলে সে যে কত কিছু করতে পারত তা আর বলার অপেক্ষা রইল না।

'কিয়েভের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, মস্কোরটা খোল্,' ফিওদর পাভ্‌লভিচ বলল।

'আজ্ঞে, এই যে!'

মিশা ছুটে যায় প্রথম ধাতব আলমারির বোর্ডটার দিকে, এটা-ওটা কী সব হাতল সরাল, কিনারায় খাঁজকাটা কতকগুলি কালো কালো চাকতি ঘোরাল। টেবিলের ওপরকার লাউড্স্পীকার থেকে গমগম করে বেরিয়ে এলো কর্ণভেদী খাদের কণ্ঠস্বর, তারপর হঠাৎ যেন বিষম খেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তার বদলে বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা — দড়াম দড়াম, ঠুকঠুক আওয়াজ তুলে প্রকাশ করে কী ভাবে দ্রুত, অতি দ্রুত কাঠ চেলানো হচ্ছে।

'আমেরিকান জ্যাজ্,' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল মিশা।

কাঠ চেলানো থেমে গেল, তাকে ঠেলে হটিয়ে দিল মস্কো রেডিওর ঘোষকের শান্ত কণ্ঠস্বর।

'চল্,' নিউরা বলল।

কোস্তিয়ার এখানে বেশ লাগছিল, সবগুলি হাতল, ল্যাম্প আর বোতামের তাৎপর্য না জেনে এখান থেকে ওঠার ইচ্ছে তার ছিল না, কিন্তু ঐ যে স্বল্পভাষী ফিওদর পাভ্‌লভিচ একটা খোলের

ভেতরে খাড়া কতকগুলো তার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে চলেছে, তার সামনে কোস্তিয়ার বাধো বাধো ঠেকছিল। তারা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো। মিশা ওদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

'তুই আমাদের এখানে আসিস,' মিশা বলল। 'আমি তোকে সব শিখিয়ে দেব। যদি চাস, বল্। ফিজিক্সে তুই কেমন? ও, তাহলে ত কোন কথাই নেই। চটপট শিখিয়ে দেব!'

'বড়াই করিস নে বলছি মিশা!' ফিওদর পাভ্লভিচের গলা নকল করে কথাগুলি বলে নিউরা হো হো করে হেসে ওঠে।

'একটুকুও বড়াই করছি না আমি কেবল... নিজে চেষ্টা করেই দ্যাখ না! আর ফিওদর পাভ্লভিচকে ভয় পাস নে কোস্তিয়া, ভালো লোক...'

'তা ঠিক, বড়াই করা পছন্দ করেন না!' নিউরা টিপ্পনি কেটে বলল।

কিন্তু মিশা ওর দিকে আদৌ তাকাল না।

'দেখেছিস ত ওঁর বাঁ পাটা নকল? উনি নিজেই বানিয়ে নিয়েছেন। কোথায় লাগে কারখানার তৈরি জিনিস! উনি কতগুলো মেডেল পেয়েছেন জানিস?.. তোরা কোথায় চললি? তিমোফেইয়ের কাছে? তরমুজ আর শালগম দেখতে বুঝি?'

তিমোফেইয়ের দেখা ওরা পেল স্কুলের দোতলা পাকা দালানের পেছনে বড় ছায়াঘন বাগানের মধ্যে। সে ধীরেসুস্থে একটা গাছের সামনে থেকে আরেকটা গাছের দিকে যাচ্ছে, সন্তর্পণে গাছের ডাল নুইয়ে ধরে নিরীক্ষণ করছে রোঁয়ার মতো আবরণে ঢাকা গোল গোল কচি ফল।

'কী রে তিমোফেই!' নিউরা চেঁচিয়ে বলল। 'আমরা এলাম! কী খবর?'

'আরে এই যে, এসে গেছিস!' তিমোফেই হাসল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের হাবভাব কঠিন হয়ে এলো। 'গাছে চড়বি না কিন্তু বলে দিলাম, কিছু ছিঁড়িস-টিঁড়িস না।'

'ভারী বয়ে গেছে আমাদের!' নিউরা আহতস্বরে বলল।

'বয়ে যাক আর নাই যাক, আমি বাপু সাবধান করে দিলাম। নইলে আর কখ্খনও ঢুকতে দেব না।'

'তোর তরমুজ কোথায় রে?' কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল।

'আমি কেবল তরমুজ নিয়েই কাজ করি না, নাশপাতি নিয়েও করি। নাশপাতির ওপরে আমার তিনসালা।'

'তিনসালা কী রকম?'

'তিনসালা পরিকল্পনা বটে। বুঝলি? যুদ্ধের সময় বাগান-টাগানের কতখানি যতনই বা হয়েছে? একটুকুও হয় নি। জার্মানরা কত বাগানই না ভেঙেচুরে ফেলেছে। তাছাড়া শীত কী রকম ছিল জানিস ত! গাছপালা ত দূরের কথা, লোকজনই জমে গিয়েছিল। আর নাশপাতি — বড় নরম প্রকৃতির গাছ বটে, গরম ভালোবাসে। নানা জাতের নাশপাতিগাছ ঠাণ্ডায় মরে গেছে। নতুন

করে লাগাতে হবে ত? কিন্তু কী? আবার সেই পুরনো জাতের? হিমের চোট লাগলে ফের জমে যাবে। কিন্তু গ্রামে গ্রামে, বিভিন্ন যৌথখামারে, যৌথখামারীদের কাছে স্থানীয় জাতের নাশপাতিগাছ ঠিক রয়ে গেছে, সেগুলো কিন্তু মরে নি। তার মানে সেগুলোকে খুঁজে বার করে চাষ করতে হবে, প্রচার করতে হবে তাদের।'

'তুই কি সারা ইউক্রেন ঘুরবি নাকি?'

'তা কেন? আমি কি একা? আমরা, এই খুদে মিচুরিনপন্থীরা সংখ্যায় কত জানিস? ওহো! আমি তোকে চিঠি দেখাব — প্রায় সব এলাকায়ই আমার চেনাপরিচিত লোক আছে। চেনাপরিচিত মানে, চিঠির মারফত আর কি। আমরা বীজ বিনিময় করি, নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতারও বিনিময় করি বটে... আয় তোকে আমি দেখাব। কিরভগ্রাদ থেকে একজন আমাকে বীজ পাঠিয়েছে, গাছটা এর মধ্যেই হয়ে উঠেছে ইয়া বড়...'

কোস্তিয়াকে তিমোফেই অসংখ্য চারাগাছ দেখায়, কোন্‌টা কোন্‌ জাতের, বীজ কোথা থেকে পাঠানো তা বলে, তিমোফেই নিজে যে কী ভাবে সেগুলির পরিচর্যা করছে, তাদের বড় করে তুলছে তার বৃত্তান্ত দেয়। ব্যাপারটা কোস্তিয়াকে তেমন আকৃষ্ট করে না: তার মতে সব গাছই একরকম, কেবল তফাত এই যে কোনটি বড়, কোনটি বা ছোট। তবু তিমোফেইয়ের কথা সে শুনতে থাকে, শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যায়। তিমোফেই নদীতে যেমন ছিল এখানে আদৌ তেমন নয়। আগের মতোই এখনও সে ধীরস্থির বটে, কিন্তু নিদ্রাজড়িত বা অলস তাকে মোটেই বলা চলে না। কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে, ভারিক্কি চালে সে চারাগাছগুলির সারির মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে দৃঢ় ও শান্তস্বরে এমন সমস্ত জিনিসের কথা বলে চলেছে যা কোস্তিয়ার কাছে পরিচিত নয়, এখন সে তেমন একটা 'বটে-বটেও' বলছে না।

'দাঁড়া ত!' তিমোফেইয়ের হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। 'আরে নিউরা গেল কোথায়? বটে, মজাটা দেখাচ্ছি এখন!'

নিউরাকে অবশ্য তখনই দেখা গেল তাদের সামনাসামনি এগিয়ে আসছে; চলতে চলতে মন দিয়ে, মুগ্ধদৃষ্টিতে গাছপালার মাথা, না তাদের মাথার ওপর ভেসে বেড়ানো রুপোলি মেঘ — কোন্‌টা সে দেখছিল কে জানে!

'কোথায় ছিলি তুই?' সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল তিমোফেই।

'ঘুরছিলাম, দেখছিলাম,' নিউরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'তাও বুঝি বারণ, অ্যাঁ? চল্‌ রে কোস্তিয়া, এখান থেকে চল্‌!'

'না না, দাঁড়া ত! জিভ দ্যাখা।'

'কী কথাই না বললি! জিভ দেখাতে যাব কেন শুনি?'

'দ্যাখা বলছি! বটে!'

'তবে এই দ্যাখ্‌!' নিউরা জিভ বার করতে দেখা গেল জিভ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে

চেরির কষে কালো হয়ে উঠেছে। 'দুটো চেরি খেয়েছি বলে বুঝি দুঃখ হচ্ছে? তোর এখানে চড়াই পাখিই ত কত বেশি ঠুকরে খায়...'

'তারা হল চড়াই পাখি। তুই ত আর চড়াই পাখি নোস, তুই হলি গে পাইওনীয়র।'

'আর তুই একটা লোভী!'

'কী হল কী তোমাদের?' একটা সুরেলা গমগমে গলার আওয়াজ ভেসে হল।

পাশে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এক অল্পবয়সী মহিলা, তাঁর পরনে ছিটের পোশাক। ধূসর চোখে হাসির ঝলক খেলিয়ে তিনি তাকালেন ওদের দিকে।

'ও নিজেই বলুক না,' গজগজ করে বলল তিমোফেই।

'বলবই ত,' মিনমিনে গলায় বলল নিউরা। 'আমার বড় চেখে দেখার সাধ হয়েছিল এলেনা ইভানভ্না... আমি মোটে দুটো ছিঁড়েছি, আর এর মধ্যে তিমোফেই শুরু করে দিয়েছে চেঁচামেচি। দেখুন না, চড়াই পাখি কত ঠুকরে নষ্ট করছে, দুটো ফলের জন্যে কিনা ওর দুঃখ হচ্ছে...'

'দুঃখ ওর অবশ্যই হচ্ছে না। আসল কথা কি জান, সময়ের আগে ছেঁড়া ঠিক নয়। আর ছিঁড়বে না তুমি, তাই না? ব্যস্, এই ত ভালো কথা। তুমি কে?' কোস্তিয়ার দিকে ফিরে শেষ কথাটা বললেন এলেনা ইভানভ্না।

'কোস্তিয়া।'

'তুমিও একজন খুদে মিচুরিনপন্থী নাকি?'

'ন্-না।'

'তাহলে কী? খুদে যন্ত্রবিশারদ নাকি?'

'না। আমি এই অমনি...'

'আচ্ছা...' এলেনা ইভানভ্না হাসলেন, এবারে তিনি মুখ ফেরালেন তিমোফেইয়ের দিকে।

ওরা দু'জনে রেনেট জাতীয় আপেলের একটা অবাড়ন্ত চারাগাছের দিকে ঝুঁকে পড়ে আলোচনা করতে থাকে ওটাকে নিয়ে কী করা যায়। এলেনা ইভানভ্না চারাগাছটা বদল করে অন্য একটা লাগাতে বলেন, কিন্তু তিমোফেই রীতিমতো গোঁ ধরে থেকে জোর দিয়ে বলে যে ওটাকে বদল করার দরকার নেই, সে চারাগাছটাকে বড় করে তোলার দায়িত্ব নেবে, এলেনা ইভানভ্না নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে গাছটা তার এলেম দেখাবে!

'ঠিক আছে,' তিনি বললেন, 'দায়িত্ব কিন্তু তোমার।'

'আচ্ছা,' শান্ত ও দৃঢ় স্বরে সম্মতি প্রকাশ করল তিমোফেই।

'চলি! চলি, 'এই অমনি' খোকাটি!' ফের মুচকি হাসলেন এলেনা ইভানভ্না, চলে গেলেন।

‘চল্,’ তিমোফেই বলল, ‘এখন আমি তোকে আমার তরমুজ দেখাব।’

‘চাই না! আমি বাড়ি যাব!’ হঠাৎ রেগে গিয়ে জবাব দিল কোস্তিয়া।

‘ঠিক আছে, তাহলে আরেক সময় হবে।’

‘আরেক সময়ও চাই না। তোর রেনেট আপেল আর তরমুজ দেখতে ভারী আমার বয়ে গেছে!’

কোস্তিয়া মোড় নিল, রাস্তা ছেড়েই সোজাসুজি বাগান থেকে হনহন করে চলল। নিউরা তার পেছন পেছন ছুটল। তিমোফেই হতবুদ্ধি হয়ে ওদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ফের ঝুঁকে পড়ল দুর্বল চারাগাছটার ওপরে।

কোস্তিয়া পা দিয়ে তন্নতন্ন করে চষে ফেলে রাস্তার তপ্ত মখমলে ধুলো, কোন একটা কিছুর ওপর মনের ঝাল মেটানোর জন্য সে উসখুস করতে থাকে, একটা ঢিলও খুঁজে পেল না যাতে কুকুরের গায়ে ছুঁড়ে মারা যেতে পারে। নিউরা পেছন পেছন চলল, তার মুখেও কোন কথা নেই। কেবল গ্রাম ছাড়িয়ে চলে আসার পর ‘গর্জন খাতের’ খাড়া পাড়ের কাছে কোস্তিয়া একরাশ মাটির ডেলা দেখতে পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সেগুলি ছুঁড়তে থাকে খাদের ভেতরে। তার বিরক্তি একটু একটু করে থিতিয়ে আসে, কিন্তু অপ্রীতিকর ভাবের একটা রেশ তখনও থেকে যায়।

‘হলই না হয়!’ শেষ ডেলাটা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিড়বিড় করে বলল কোস্তিয়া। ‘ভারী আমার!’

‘কী হল তোর কোস্তিয়া? অ্যাঁ?’ উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞেস করল নিউরা। ‘কার ওপর রাগ করেছিস তুই? তিমোফেইয়ের ওপরে, অ্যাঁ?’

‘কারও ওপরে না!.. চল্, বাড়ি যাই।’

তারা এক ছুটে খাদটার ভেতরে নেমে চলে আসে তৃণভূমিতে। আবার পায়ের নীচ থেকে এদিক-ওদিক ছিটকে পালিয়ে যায় ফড়িংয়েরা, মাথার ওপরে চুড়ো হয়ে ঝুলতে থাকে মশার ঝাঁক, কিন্তু ফুর্তির ভাব, প্রফুল্ল মেজাজ আর ফিরে আসে না। ফড়িং, মশা কোস্তিয়ার বিরক্তি উৎপাদন করে, আর বেঙ... পারলে সে এদের সবাইকে পিষে ফেলত যাতে আর কোন চিঁচিঁ আওয়াজ বার করতে না পারে।

‘আমাকে কিছু একটা যে হতেই হবে তা কেন?’ হঠাৎ নিউরার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল। ‘হলে হব, না হলে হব না — আমার খুশি!’

‘আমি কি তোকে সে কথা বলেছি?’ নিউরা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু কোস্তিয়া ওর কথায় কান দেয় না।

কেন তাকে কোন মিচুরিনপন্থী উদ্ভিদবিজ্ঞানী হতেই হবে? কে এমন দিব্যি দিয়েছে? মিচুরিনপন্থী উদ্ভিদবিজ্ঞানী হতে সে চায় না, সে হতে চায় নাবিক!

‘কেউ ত আর তোকে জোর করছে না।’

‘তাহলে হাসি কেন?’

'কে হাসল ?'

'ঐ যে তোদের... তোদের দিদিমণি।'

'উনি আমাদের স্কুলের দিদিমণি আবার পাইওনীয়রদলের সিনিয়র লীডারও।'

'হলই না হয়! আর মিশা, তিমোফেই... ওদের অত বড়াই কিসের ?'

'কিন্তু ওরা ত আর তোকে কিছু বলে নি!'

'বলুক আর না-ই বলুক, ওরা পারে কিন্তু আমি পারি না — এই নিয়ে বড়াইয়ের অন্ত নেই... ভারী আমার! আমি ওদের চেয়ে অনেক বেশি জানি, অনেক বেশি কাজ পারি...'

কোস্তিয়া বাস্তবিকই অনেক রকমের জিনিস জানত, করতেও পারত, আর এই নিয়ে মনে মনে তার গর্বও ছিল। নামজাদা ফিল্মস্টারদের সকলকে সে জানত, নাম ধরে জানত প্রায় সব বড় বড় খেলোয়াড়দের, অনেকের চেহারাও; জানত কিয়েভ 'ডিনামোর' ফুটবল খেলোয়াড়দের, চিনতে পারত তাদের চালচলনে, পিছন থেকেও; লেফট আউট কেন সুযোগ হারাল, কী ক'রে দলের ক্যাপ্টেন প্রতিপক্ষকে জব্দ করে এসব তার চেয়ে ভালো কেউ বোঝে না; দেশি-বিদেশী সমস্ত মোটরগাড়ির মার্কা তার মুখস্থ; সে নিজে অ্যাকোরারিয়াম বানিয়েছে, তবে সেখানে মাছেরা যদি মারা যায় তার জন্য দায়ী কলের জলে ক্লোরিনের মিশ্রণ, সে নয়; আর সে যখন স্ট্যাম্প জমাত তখন তার কাছে এমন সমস্ত স্ট্যাম্প ছিল যে ক্লাস নাইনের ছেলেরা পর্যন্ত তার কাছে আসত স্ট্যাম্প বদল করতে। তার চেয়ে ভালো বুক সাঁতার ক্লাস ফাইভ 'বি'-র আর কেউ দিতে পারে না, আর সোয়ালো-ডাইভ তার চেয়ে ভালো দিতে পারে কেবল তার বন্ধু ফিওদর।

কোস্তিয়া অবশ্যই এত এত জিনিস জানে এবং করতে পারে, যা এই মিশা ও তিমোফেইরা সকলে একসঙ্গে মিলেও জানে না, কিন্তু কেন যেন এতেও কোস্তিয়া বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পায় না। শেষকালে ও ধরতে পারল, কেন: দেখা যাচ্ছে বড়রা যা করে মিশা আর তিমোফেইও তা-ই করে, কিন্তু কোস্তিয়া সে ধরনের কাজ করে না। অবশ্য ওরা একেবারে বড়দের মতন করে বললে ঠিক বলা হবে না, কিন্তু ওদের কাজ ত ঐ একই দাঁড়াচ্ছে...

'আসলে ওদের দিয়ে জোর করে করানো হয়, এই হল ব্যাপার!' কোস্তিয়া বলেই ফেলল কথাটা।

'কাদের, তিমোফেই আর মিশার কথা বলছিস ?' নিউরা ওর মনের কথা ধরে ফেলল। 'ওদের ওপর জোর খাটিয়েই দ্যাখ না! কারও সাধ্যি নেই ওদের ওপর জোর খাটায়, ওদের নিজেদেরই ভালো লাগে — তাই ওরা সাহায্য করছে... তুই রাগ করছিস কেন ? তোকে ত কেউ জোর করছে না।'

না, অবশ্যই না। বহুবার হয় এ ক্লাবে নয়ত ও ক্লাবে যোগ দিতে তাকে বলা হয়েছে, কিন্তু ক্লাবে যোগ দিতে কোস্তিয়ার মন চায় নি — তার মনে হয়েছিল যোগ দেওয়া মানেই পড়া তৈরি করার মতন: সেখানেও রুটিন, নির্দিষ্ট কাজ... তাই দেখা গেল যে প্রায় সব ছেলেমেয়েই কোন

না কোন কাজে ব্যস্ত, তাদের শখের কাজে ডুবে আছে, কিন্তু কোস্তিয়া রয়ে গেল নিজের মনে। চিড়িয়াখানায় কোস্তিয়া দেখেছিল তারই মতন একটা ছেলে ভালুকছানা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে — সম্ভবত খুদে প্রকৃতিবিদ। আর সেগেই কাজানৎসেভ যায় খুদে প্রযুক্তিবিদভবনে, বাষ্পীয় গাড়ি বানায়। পঁচিশ নম্বর স্কুলে আছে খুদে ইতিহাসবিদদের সমিতি, তারা প্রতি গ্রীষ্মকালে কোথাও না কোথাও অভিযানে যায়। কোস্তিয়া একবার ঐ সমিতিতে ভর্তি হবে বলে ভেবেও ছিল — তাহলে অবশ্য অভিযনে যাওয়া যেত, কিন্তু এর জন্য দরকার ইতিহাস সম্পর্কে রচনা লেখা, অথচ লেখার কোন বাসনা কোস্তিয়ার ছিল না।

অনেক বারই তার অনেক জিনিসে শখ জাগে। কোন নতুন আগ্রহজনক বস্তুর কথা জানতে পেলে কোস্তিয়াও প্রবল উৎসাহ বোধ করত, কিন্তু তার সেই উৎসাহ খুবই তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে যেত, নতুন আরেকটা কোন আকর্ষণের খাতিরে ওটাকে ছেড়ে দিত, কিন্তু পরে আবার আরও কোন একটার খাতিরে এই দ্বিতীয়টাকেও ছেড়ে দিতে তার কোন আফশোস হত না। সবই তাকে আকর্ষণ করত, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য, আর কোনটাই তার মনে কোন দাগ কাটত না। 'এটা আমার বৃত্তি নয়,' মনে মনে এই কথা ভেবে কোস্তিয়া সান্ত্বনা পেত।

কিন্তু কী তার বৃত্তি? আর 'বৃত্তি' — তার মানেই বা কী? কে তাকে বৃত্তি দেবে, কোন বৃত্তির সন্ধান সে পাবে? কোথায়? আর কবেই বা সেটা ঘটবে?

কোস্তিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত বিষণ্ণ মনে নদীর তীরে শুয়ে থাকে, নিউরাকে কোন আমল দেয় না, খুঁজে বেড়ায় তার নিজের বৃত্তি। কিন্তু তার কোন খোঁজ না মেলায় শেষ পর্যন্ত রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

কিন্তু ভোরবেলায় স্নিগ্ধ স্বচ্ছ জল, চোখ ধাঁধানো সূর্যের আলো বিষণ্ণ ভাবনাচিন্তাকে ধুয়ে মুছে দেয়, কোস্তিয়া আবার তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে থাকে: রোদে শরীর পোড়ায়, স্নান করে, মার্টলেট পাখির বাসায় ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু খাড়াই বয়ে উঠতে গিয়ে হাঁটুর ছাল ওঠাই সার হল। মিশা ও তিমোফেই এসে হাজির হল, নদীর অল্পজলের বালিভর্তি বাঁকটায় তারা জলে ভাসা কাঠ দিয়ে ভেলা বানাতে লেগে গেল। জলে ফুলে ঢোল ডালপালা, কাঠের ভাঙা টুকরো। নিজেরা ভাসে ঠিকই কিন্তু কোন কিছুর ভার তারা বইতে পারে না, তাই দুঃসাহসী নাবিকদের নিয়ে তারা ভুস করে ডুবে যায়।

দিনগুলি দ্রুত চলে যেতে থাকে। কোস্তিয়া সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে নৌকো চড়ে বেড়ায়, কখনও কখনও আশেপাশে — একা একা। দাঁড় এখন সে ভালোই বায়, একদিন সে আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেল যে তার হাতে নিস্তেজ পেশীর গোছার জায়গায় দেখা দিয়েছে শক্ত বাইসেপ, যদিও ছোট। কখন কখন সে নিউরার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে নিজের চেহারা দেখে — সেখানে রোদে ছাল ওঠা নাক, গতবছরের ঘাসের মতো জ্বলে যাওয়া ভুরু চোখে পড়তে কোস্তিয়া আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারে কার রঙ রোদে বেশি পুড়বে — তার না ফিওদরের।

ওদের চারজনের বন্ধুত্ব এত নিবিড় হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে এই কথা ভাবতে গিয়ে তার মন খারাপ হয়ে যায়। ইস্, ওরা চারজনে সবাই যদি কিয়েভে বাস করত তাহলে কী ভালোই না হত! আর তাদের সঙ্গে যদি তার বিশ্বস্ত বন্ধু ফিওদরকে জোটানো যেত তাহলে ত সোনায় সোহাগা হত।

সবই বেশ চলছিল, কিন্তু সময় সময় খেলা যখন বেশ পুরোদমে চলছে তখন মিশা ছুটে চলে যায় রেডিও সেণ্টারে ডিউটি দিতে, তিমোফেই তার চারাগাছ দেখাশোনা করতে, আর নিউরার হঠাৎ মনে পড়ে যায় কিছু একটা রান্না করার কথা, ঘরদোর পরিষ্কার করার এবং মোটের ওপর ঘরসংসারের টুকিটাকি কাজের কথা। কোস্তিয়া একা থেকে যায়, তখনই তার মেজাজ বিগড়ায়। সকলেরই কোন না কোন কাজ আছে, সকলেই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত, কেবল সে-ই কোন কাজকর্ম না করে আলস্যে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, কেবল স্নান করছে আর রোদে শরীর পোড়াচ্ছে। ফের সে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে এই ভেবে যে সে — 'এই অমনি খোকাটি' আজও খুঁজে পেল না তার নিজের বৃত্তি, কেননা নাকি হতে তার এখনও ঢের দেরি আছে, অথচ এখন সে কোনমতেই নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলতে পারছে না।

বিশেষ দায়িত্ব

সঙ্গীসাথীরা কোস্তিয়াকে ডাকে, কোস্তিয়া সহজে যেতে রাজী হয় না তাদের সঙ্গে, বিমূঢ়তা ও অস্বস্তি আরও বেশি করে তার মনে দাগ কেটে বসে এই কারণে যে সবাই কোন না কোন কাজে লেগে আছে, কেবল সে-ই যেন কেমন একটা ছন্নছাড়া। ধীরে ধীরে এই স্মৃতিচারণের ধার কমে যেতে লাগল, অবশেষে একদিন বিকেলের দিকে সে নিউরার সঙ্গে দিদার কাছে যেতে রাজী হয়ে গেল। তবে সঙ্গে সঙ্গেই দিদার কাছে যাওয়া তাদের হয়ে ওঠে না।

নিউরা আর কোস্তিয়া গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র তাদের পাশ দিয়ে গুলির মতো সাঁ করে বেরিয়ে যায় একটা কটাচুল ছেলে। সে ছুটে অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে তাকাল, তারপর ওদের দিকে হাত নাড়িয়ে চিৎকার করে বলল:

'অমন গুটিগুটি হাঁটছ কেন? জলদি!' বলেই ফের ছুটে চলে গেল আগে।

'কী ব্যাপার?' কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল।

'জানি না। এ হল সেন্কা জুরিলো। কোন কিছু ঘটল নাকি কে জানে? চল্ ছুটি, অ্যাঁ?'

'চল্ ছুটি!'

ধুলোর ঝড় তুলে তারা রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল, মুরগীর দল ভয় পেয়ে গিয়ে বেজায় জোরে কঁক কঁক করে উঠল; শেষকালে মিশা ওদের থামাল:

'দাঁড়া দাঁড়া! এখনও দেরি আছে...'

'কিসের দেরি?'

'স্কুলের। তোরা সেখানে যাচ্ছিস ত?'

'আমরা জানি না। সেন্‌কা চেঁচাল 'জলদি', তাই আমরা দৌড় দিলাম।'

'আরে রামো! কিছুই জানিস না, অথচ দৌড়ুচ্ছিস!' মিশা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল। 'না, দেখছি তোদের ভারও আমাকে নিতে হবে, রেডিওফিকেশন করতে হবে তোদের।'

'বড়াই করবি নে বলছি মিশা!' ফিওদর পাভ্‌লভিচের গলা নকল করে বলল নিউরা।

'বড়াই আমি করছি না, তবে রেডিও শোনা উচিত! আমি নিজে রেডিওতে ঘোষণা করেছি।'

'কী?'

মিশা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, চোখেমুখে কাঠিন্য ফুটিয়ে তুলে নিউরা ও কোস্তিয়ার ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর সাড়ম্বরে খানিকটা গানের মতো সুর টেনে টেনে বলল:

' 'অ্যাটেন্‌শন্‌ প্লীজ! পল্লী রেডিও সেণ্টারের ঘোষণা। সাশা চেকালিন পাইওনীয়র বাহিনীর সদস্যদের আজ বিকেল ছয়টায় স্কুলে জমায়েত হতে বলা হচ্ছে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য।' এই হল ব্যাপার! বুঝলি?'

'না, বোঝা গেল না,' কোস্তিয়া বলল। 'দায়িত্বটা কী, শুনি?'

'ইস্‌, চালাকি দেখ! বিশেষ দায়িত্বের কথা কে জোর গলায় ঘোষণা করে বল্‌ ত? এটা যে সামরিক গোপনীয়তার মতো!'

কোস্তিয়া ভেবাচেকা খেয়ে চুপ করে গেল। তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো নিউরা।

'ওঃ মিশা, আবার সেই তোর চালবাজী! তুই নিজেও হয়ত কিছুই না জেনেশুনে চলেছিস ওখানে... জানিস না বোধ হয়, তাই না, অ্যাঁ?'

'জানি আর না জানি সেটা আমাদের ব্যাপার,' মিশা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে আপত্তি করে বলল, তবে তর্ক সে আর করল না।

স্কুলে যদিও তারা এসে পেঁছিুল ছয়টার তনেক আগে, তবু ইতিমধ্যেই অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে এসে জুটেছে। মিশা সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে যায়, নিউরা 'এক্ষুনি আসছি' বলে সেই যে বান্ধবীদের কাছে গেল, আর ফিরল না, কোস্তিয়া একা পড়ে গেল। অজানা ছেলেমেয়েরা কৌতূহলভরে চুপি চুপি তাকিয়ে দেখে কোস্তিয়াকে, কিন্তু কোস্তিয়া ফিরে তাকানোমাত্রই ওরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, এমন ভাব করে যেন কোস্তিয়াকে নিয়ে আদৌ তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। ছেলেমেয়েদের এই দৃষ্টির সামনে তার বেশ অস্বস্তি লাগছিল, তার মনে হচ্ছিল পিঠটা যেন কাঠের হয়ে গেছে আর হাতপাগুলো যেন তার নয় আর কারও; তাই তিমোফেই আসতে সে এমনই খুশিতে ডগমগ হয়ে তার দিকে ছুটে যায় যে মনে হয় গতকাল কেন, গত কয়েক বছর হল তাদের মধ্যে কোন দেখাসাক্ষাৎই হয় নি।

তিমোফেইয়ের পেছন পেছন আশেপাশে দৃষ্টিপাত করতে করতে ধীরেসুস্থে থপথপ করে আসছে তিমোফেইয়েরই আরেকটি ছোটখাটো সংস্করণ — বছর পাঁচেকের একটা বাচ্চা ছেলে। প্যাণ্টটা তার শার্টের ওপরে গেলিস দিয়ে বাঁধা — একটা সরু কাপড়ের ফিতে কাঁধের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বড় একটা ঝিনুকের বোতামের সঙ্গে এঁটে দেওয়া হয়েছে। গেলিসের ওপর আস্থা না থাকার দরুন হোক কিংবা নিজের অসাধারণ বোতামটি হারানোর ভয়েই হোক ছেলেটা দু'হাতে বোতাম চেপে ধরে চলেছে।

'ছোট ভাই বুঝি?' কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। এমনভাবে চেপে ধরল! ওরে হতচ্ছাড়া! চল্, পিছিয়ে পড়িস নে, নইলে এক্ষুনি বাড়ি পাঠিয়ে দেব কিন্তু!'

ছেলেটা ধীরেসুস্থে তাদের দিকে এগিয়ে আসে চোখ বড় বড় করে কোস্তিয়াকে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

'তোর নাম কী?' কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটা তখনও তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শেষকালে ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখ ড্যাবড্যাব করে চেপে চেপে বলল:

'গোরুকা...'

'কী খবর রে গোরুকা? তুই এসেছিস কেন? পাইওনীয়র হতে চাস বুঝি? অ্যাঁ?' নিউরা সামনে ছুটে আসে, তাকে ধরে সে ঝাঁকাতে শুরু করে।

গোরুকার সুড়সুড়ি লাগে, সে হিহি করে, হাত-পা ছুঁড়ে বলে:

'আঃ! ছাড়! সুড়সুড়ি লাগে যে...'

'বাহিনীর সবাই সার বেঁধে দাঁড়াও!' নির্দেশ দিল একটা ছোটখাটো গড়নের ছেলে। তার কপালটা চওড়া, জামার হাতায় কতকগুলি পটি সেলাই করা।

নিউরা আর তিমোফেই ছুটে গিয়ে লাইনে দাঁড়াল, কোস্তিয়া ও গোরুকা একা পড়ে রইল। বাহিনী সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে বালির রাস্তার ওপরে।

'অ্যাটেন্-শন্!'

স্কুল থেকে এগিয়ে আসছেন এলেনা ইভানভ্না আর রোগা লম্বা এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের দুই চোখের মাঝখানে স্বল্প ব্যবধান, চোখজোড়া ঢাকা পড়ে গেছে ভুরুর আড়ালে। জমকাল গোঁফের জন্য তাঁর বয়স বেশি দেখাচ্ছিল, আসলে কিন্তু তাঁর বয়স কমই। লাইন বাঁধার নির্দেশ কানে যেতে তিনি শরীর টানটান করেন, নিখুঁত পা ফেলেন মিলিটারী কায়দায়। ভিটে-কপালে ছেলেটা তাদের মুখোমুখি কয়েক পা এগিয়ে এসে হাত তুলে স্যালুট করে বলল:

'সাশা চেকালিন বাহিনী পূর্ণসংখ্যায় সার বেঁধেছে! কোন অজ্ঞাত কারণে তিনজন অনুপস্থিত! রিপোর্ট প্রদত্ত হল!'

'রিপোর্ট গৃহীত হল!' জবাবে স্যালুট করে বললেন এলেনা ইভানভ্না। 'তৈয়ার থাক!'

'বরাবর তৈয়ার আছি!' লাইন থেকে গমগম আওয়াজ উঠল।

'অ্যাট ইজ!' অনুচ্চস্বরে নির্দেশ দিলেন এলেনা ইভানভ্না। 'খুবই ভালো কথা যে তোমরা এমন নিখুঁতভাবে জমায়েত হতে পেরেছ। কমরেড মোলতভ যৌথখামার আমাদের সাহায্যপ্রার্থী। আমাদের কাছে এটা সম্মানজনক দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য! আমরা তাই অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করব না, তাই না?'

'বরাবর তৈয়ার! অবশ্যই! পরিষ্কার ব্যাপার!' লাইন থেকে চিৎকার উঠল।

'এবারে যৌথখামারের কর্মিবাহিনীর প্রধান ইভান কুজমিচ তোমাদের বলবেন সাহায্যটা কী ধরনের।'

ইভান কুজমিচ তার রঙচটা ফিল্ড শার্টটা টেনেটুনে ঠিক করে নিয়ে লাইনের ওপর চোখ বুলালেন, বললেন:

'ব্যাপারটা হল গিয়ে এই... তোমরা জান যে এখন সময়টা এমন যে কারও নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই, প্রতিটি জোড়া হাত গোনাগুনতি হিসাব করা, মাঠ থেকে ছাড়িয়ে এনে অন্য কাজে আমরা কাউকেই লাগাতে পারি না। অথচ শুয়োর আর এটা ওটা জীবজন্তু...' গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুচকি হেসে তিনি বললেন, 'নানা ফাঁকফোকরে ঢুকে পড়ছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় মুখরোচক খাবার পাওয়া যায়। যৌথখামারী কমরেডরা রাগারাগি করছেন: তাঁদের কথায়, বেড়া যেখানে যেখানে খারাপ হয়ে গেছে সেই সব জায়গায় মেরামত করা দরকার। রাগারাগি তাঁরা করেন সঙ্গত কারণেই: অবশ্যই মেরামত করা দরকার। তাছাড়া ফসলের গোলা আর মাড়াইয়ের জায়গাও খানিকটা মেরামত করতে হয়। এর জন্যে কী চাই? এই কাজের জন্যে অবশ্যই চাই বেতগাছ। 'মজা খাঁড়িতে', দ্বীপে তা গাদা গাদা আছে, অথচ পাঠানোর মতো লোক আমাদের নেই — পাঠানো মানেই দু'তিনজন লোককে সারা দিনের জন্যে মাঠের কাজ থেকে ছাড়তে হয়। বেতগাছ কাটা — কঠিন কাজ নয়, এটা পুরোপুরি তোমাদের সাধ্যের মধ্যে। আর যৌথখামারে তা পেঁছানোর ব্যাপারটা আমরা নিজেরাই দেখব 'খন। এই হল ব্যাপার। বুঝলে ত?'

লাইনের সবাই সহর্ষে গর্জে বলল:

'বুঝেছি! হুর্‌রে! চল সবাই, দ্বীপে চল!'

কোস্তিয়া সারিবদ্ধ ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে।

ভিটে-কপালে ছেলেটা রেগে ভুরু কুঁচকে হাঁক ছাড়ল:

'চুপ্!'

'তাহলে কথাটা হল এই,' লাইনের সকলের কলকণ্ঠ শান্ত হয়ে এলে এলেনা ইভানভ্না

বললেন, 'আগামীকাল বারোটা নাগাদ এখানে জমায়েত। বাহিনীর পরিষদ থেকে যাবে, কার কী দায়িত্ব, কাকে কী করতে হবে ইত্যাদি আমরা ভাগ করে দেব। কারও কোন প্রশ্ন আছে ?'

'এলেনা ইভানভ্‌না !' বেজে উঠল নিউরার রিনরিনে কণ্ঠস্বর। 'আচ্ছা, আমাদের কোস্তিয়াকে সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে ? কোস্তিয়াও ত একজন পাইওনীয়র, আমাদের বাহিনীর না হয় নাই হল।'

এলেনা ইভানভ্‌না ফিরে তাকান, কোস্তিয়াকে চিনতে পেরে মৃদু হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেন:

'অবশ্যই নেওয়া যেতে পারে ! যে কেউ ইচ্ছে করলে যেতে পারে।'

কোস্তিয়া আনন্দে ডগমগ হয়ে ওঠে। সাবাস নিউরা ! আর এই এলেনা ইভানভ্‌নাও দেখা যাচ্ছে নেহাৎ মন্দ নন... গোর্‌কো মুখ গোমড়া করে তার পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁস-ফোঁস করছিল।

'কী হল তোর ?' কোস্তিয়া তার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু ছেলেটা চোখ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

লাইন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল, মিশা ও তিমোফেই ছুটে এলো কোস্তিয়ার কাছে, এরই মধ্যে এলেনা ইভানভ্‌নার সঙ্গে কিসের যেন কথাবার্তা সেরে এক মিনিট বাদে নিউরাও এসে জুটল। কোস্তিয়া ও নিউরা দিদার কাছে চলল, তারপর বাড়ির দিকে।

নিউরা গ্রামে যাবে না বলে এলেনা ইভানভ্‌নার অনুমতি নিয়ে রাখল — অমনিতেই বাহিনীর সকলকে আসতে হবে বয়া-তদারককারীর বাড়ির কাছে, ঐ জায়গাটা থেকে শুরু হবে তাদের যাত্রা।

সকালে নিউরা দুপুরের খাবার রাঁধে, কোস্তিয়ার তখন কিছু করার নেই। সে তৃণভূমিতে ঘুরে ঘুরে ফড়িং ধরে: সবচেয়ে ভালোগুলিকে সে স্কুলে দেবে সংগ্রহে রাখার জন্য আর বাকিগুলি উপহার দেবে লিওল্‌কাকে — যত রাজ্যের পোকামকড় তার ভারী পছন্দ।

দূর থেকে কোস্তিয়া দেখতে পেল 'গর্জন খাতের' উলটো দিকের ঢালটাতে একটা ছোট মূর্তি, মূর্তিটা দ্রুত হামা দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ছে। মূর্তিটা এ পাশে চোখে পড়বে আশা করে কোস্তিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল — এত সকালে কে তাদের কাছে আসতে পারে ? — কিন্তু কারও দেখা নেই। ফলে কোস্তিয়া খাদের দিকে ছুটে গিয়ে খাড়া পাড় থেকে নীচে উঁকি মেরে দেখল।

ওখানে, তলায় গোর্‌কো হাত-পা ছুঁড়ছে। জলে ক্ষয়ে গিয়ে পাড় খাঁজ কেটে কেটে থরে থরে চলে গেছে নীচের দিকে। ধাপগুলো প্রায় গোর্‌কোর মাথা সমান উঁচু, এরকম একেকটা ধাপে ওঠার জন্য গোর্‌কোকে তাই এনে গাদা করে রাখতে হচ্ছে কাদামাটি, তার ওপর দাঁড়িয়ে সে উপুড় হয়ে ধাপের ওপর শুয়ে পড়ে, পা টেনে তোলে, তারপর ফের কাদামাটি জড় করে পরবর্তী

বাধাকে ডিঙানোর উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে সে ভিজে নেয়ে উঠেছে, কাদায় তার সর্বাঙ্গ মাখামাখি হয়ে গেছে, তবু ওপরে ওঠার জেদ সে ছাড়ে নি।

‘গোর্কা, তুই কোথায় চলেছিস? আয়, আমি তোকে সাহায্য করব!’ কোস্তিয়া চিৎকার করে বলল।

গোর্কা মাথা ওঠায়, হাঁসফাঁস করতে করতে মুখ গোমড়া করে তাকায় কোস্তিয়ার দিকে, কিন্তু অনেকক্ষণ কোন জবাব দেয় না।

‘আমি নিজে উঠব!’ শেষকালে এই কথা উচ্চারণ করে সে আবার যথারীতি তার কাজে লেগে গেল।

কোস্তিয়া মাটিতে শুয়ে, ঝুঁকে পড়ে লক্ষ করতে থাকে তার কার্যকলাপ।

গোর্কা হয়রান হয়ে গেছে, তার পায়ের নীচেকার কাদামাটি ধেবড়ে সরে যাচ্ছে, দলা দলা হয়ে ছিটকে যাচ্ছে, নতুন করে কাদামাটি যোগাড় করতে হচ্ছে তাকে। বিপদের ওপর বিপদ হল এই যে তার ঝকঝকে ঝিনুকের বোতামটা ছিঁড়ে গড়াতে গড়াতে খাদের তলায় গিয়ে পড়ল, আর সবেধন বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে গোর্কার প্যাণ্ট ঢলঢল করে নীচে পড়ে যেতে লাগল।

‘হয়েছে রে বীরপুরুষ! প্যাণ্ট খোয়াবি!’ হো-হো করে হাসতে হাসতে বলল কোস্তিয়া।

গোর্কা জবাব দেয় না। প্যাণ্টের বেল্ট শক্ত মুঠোয় ধরে সে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে যায় বোতাম আনতে। পকেট তার নেই, বোতাম রাখার কোন জায়গা নেই, হাতে রাখলে কাজের অসুবিধা। খানিকক্ষণ ভাবনাচিন্তার পর ওটাকে সে গালের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ফের ওপরে উঠতে লাগল হামা দিয়ে।

‘এভাবে তুই সন্ধের মধ্যে উঠে আসতে পারবি না। দাঁড়া,’ কোস্তিয়া বলল।

সে নীচে নেমে গেল, গোর্কাকে ধরে ধরে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে ওঠাতে লাগল।

ওপরে ওঠার পর গোর্কা তার গালের ভেতর থেকে বোতাম বার করল, তারপর কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে বলল: ‘বোতামটা না থাকলে আমি নিজেই... ভারী ত ব্যাপার!’

‘কিন্তু কোথায় চলেছিস তুই?’

‘দরকার আছে,’ সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে সে রওনা দিল বয়া-তদারককারীর কুঠুরির দিকে।

‘গোর্কা!’ তাকে দেখে গালে হাত দিয়ে বলল নিউরা। ‘তুই এখানে কেন? আরে দেখ কাণ্ড, নোংরায় গড়াগড়ি খেয়ে কী হালটা করেছে! তোর বোতাম কোথায় গেল রে?’

‘এই যে,’ হাতের মুঠো খুলে গোর্কা দেখাল, আরেক হাতে সে ধরে রেখেছে পড়-পড় প্যাণ্টটা।

‘খোল্ দেখি!’ নিউরা হুকুমের সুরে বলল। ‘যা গা-টা ধো গে, আমি বোতাম সেলাই করে দিচ্ছি।’

গোর্কা বিনা প্রতিবাদে জামাকাপড় খুলল — নিউরাকে সে যতটা বিশ্বাস করে কোস্তিয়াকে

ততটা নয় — সে গিয়ে হাত-পা ধোয়, এদিকে নিউরা ওর জামাকাপড় থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে বার করে শুকনো কাদামাটি, বোতাম সেলাই করে।

'ও আমাদের সঙ্গে যেতে চায় আর কি। ওঃ তিমোফেই দেখতে পেলে আছে এক চোট ওর কপালে!.. তুই আমাদের সঙ্গে যেতে চাস বুঝি?' নিউরা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল গোরুকো।

'তোকে নেওয়া হবে না, তুই ছোট!'

'আমি যাবই যাব!' জেদ ধরে এই কথা বলে গোরুকো মুখ ভার করল।

'হয়েছে, হয়েছে, মুখ ভার করতে হবে না। চল্, খেয়ে নিতে হবে এখন, আমাদের আবার তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

গোরুকো বিনা বাক্যব্যয়ে পেছন পেছন চলল, নিউরা তাকে যা যা খাবার দিল খেয়ে নিল। সে ধীরেসুস্থে, মন দিয়ে চারপাশের সবকিছু নজর দিয়ে দেখল, শুনল, সেই সঙ্গে তার ভেতরে ভেতরে অবিরাম চলতে থাকে জটিল ভাবনাচিন্তা। আকর্ষণীয় কোন কিছু ভাবার কিংবা বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে সে খেতে খেতে থেমে গেল, এমন কি তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, মনে হল যেন সে আশঙ্কা করছে ভাবনাটা ভয় পেয়ে পিছলে বেরিয়ে না যায়। এই মুহূর্তে তাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সে চোখ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে, কিছু বুঝতে না পেরে পালটা জিজ্ঞেস করে:

'কী?'

কোস্তিয়া ও নিউরা হাসে, গোরুকোকে ওদের দু'জনেরই ভালো লাগে, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচেরও ভালো লাগে তাকে।

'স্বাবলম্বী পুরুষ,' মৃদু হেসে বলেন তিনি।

'গর্জন খাতের' পাশে বিউগ্‌ল আর ড্রামের বাজনা বেজে ওঠে। নিউরা ও কোস্তিয়া সেই দিক লক্ষ্য করে ছোটে।

বাহিনীর সামনে সামনে কদম ফেলে চলেছে ভিটে-কপালে ছেলেটা। দু'হাত টানটান করে সে ধরে রেখেছে পতাকা।

'এ হল আমাদের বাহিনীর পরিষদের সভাপতি, মিতিয়া দিমকো। ছেলেটার যা বুদ্ধি না — সাংঘাতিক! একবার কথা বলতে শুরু করলে আর কাউকে বলতে দেয় না!' নিউরা জানাল। 'নমস্কার এলেনা ইভানভ্‌না! আমরা লাইনে যেতে পারি কি এলেনা ইভানভ্‌না?'

ওরা লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়ির কাছে সারিটা আসতে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের সঙ্গে দেখা। কোস্তিয়া ও নিউরা বিশেষ দায়িত্বের কথা বলল তাঁকে, কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা তিনি আগে থেকেই জানতেন: আগের দিন তিনি গাঁয়ে গিয়েছিলেন, যৌথখামারের সভাপতি তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে

নেন যেন তিনি বেতঝাড় কাটার কাজটা দেখাশোনা করেন আর ছেলেমেয়েদের পারাপারের ও কাটা বেতগাছ চালানের ব্যবস্থা করেন।

'নমস্কার, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ! আপনি আমাদের পার হতে সাহায্য করবেন?' জিজ্ঞেস করলেন এলেনা ইভানভ্না।

'আমার শ্রদ্ধা জানবেন! সাহায্য করব, অবশ্যই করব। এই দলবল নিয়ে আপনার একার পক্ষে নদীতে সামলানো মুশকিল হবে।'

লাইন ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। তিমোফেইয়ের কাছে ছুটে এসে নিউরা বলল:

'আমাদের কাছে কে এসেছে জানিস? তোদের গোর্কা রে!'

'বটে!' তিমোফেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ। বলে, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব...'

'যাওয়াচ্ছি ওকে আমি!'

'বাবা, গোর্কা কোথায় বলতে পার?'

'এই ত এখানেই সারাক্ষণ ঘুরঘুর করছিল।'

তিমোফেই, নিউরা, পরে ওদের বাহিনীর প্রায় সকলে মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল, কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না — গোর্কা হাওয়া হয়ে গেছে।

'খামোকাই আমরা খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করছি কেন?' যুক্তি দেখিয়ে বলল মিতিয়া দিম্কো। 'ওর হয়ত কপালে জুটবে বলে ভয় হয়েছে, তাই পালিয়ে গেছে।'

'বটে ভয় পাওয়ার পাত্র সে নয়, জেদী ছেলে!' সন্দিগ্ধস্বরে বলল তিমোফেই।

গোর্কাকে কিন্তু পাওয়াই গেল না, এলেনা ইভানভ্না সবাইকে নৌকোয় উঠতে বললেন। দুটো নৌকো। ছোটটাতে দাঁড়ের জায়গায় বসল বয়সে বড় দুটি ছেলে — এলেনা ইভানভ্না যাবেন তাদের সঙ্গে। বড়টা চালাবেন এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ, কলবল করতে করতে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটাতে চেপে বসল মেয়েরা। ওদের মধ্যে একজন নৌকোর সামনের গলুইয়ের ওপর চলে গেল, সবে চওড়া ও লম্বা বেঞ্চিটার ওপর গিয়ে বসে পাদুটো ঝুলিয়ে দিয়েছে নীচে, নেতিয়ে পড়া লতাপাতার শেকড়বাকড়ের গাদার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল:

'পা গেল! পা গেল!'

কী ব্যাপার কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু তিমোফেই সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করতে পারল। মেয়েদের ভিড় ঠেলে সে সামনের গলুইয়ের দিকে ছুটে গেল, বেঞ্চের নীচ থেকে পা ধরে টেনে গোর্কাকে বার করতে লাগল। এদিকে ছেলেটাও গোঁ ছাড়ে না, দু'হাতে দাঁড় আর বেঞ্চি আঁকড়ে ধরে থাকে, কিন্তু তিমোফেই কোন কথা না বলে রেগে গিয়ে তার আঙুলগুলো ছাড়িয়ে আনে, হিড়হিড় করে টানতে টানতে নামিয়ে দেয় তীরে।

গোড়ায় সকলে হাসতে থাকে, কিন্তু গোর্কার চোখেমুখে এমন একটা কাতর ভাব ফুটে ওঠে, সে এমনই অনুনয় ভরা দৃষ্টিতে একবার এর আরেকবার ওর মুখের দিকে তাকায় যে দেখেশুনে স্পষ্টই মনে হচ্ছিল এক্ষুনি ও কান ফাটানো কান্না শুরু করে দেবে আর তাতে সকলেরই ওর জন্য মন খারাপ লাগবে।

'আচ্ছা, ওকে সঙ্গে নিলে কেমন হয় এলেনা ইভানভ্না?' ইতস্তত করে বলল নিউরা। 'আমরা না হয় ওর দিকে নজর রাখব। কী বল মেয়েরা, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা ওকে দেখব!' মেয়েরা ওর কথায় প্রতিধ্বনি করে বলল। 'ওকে সঙ্গে নিন এলেনা ইভানভ্না।'

এলেনা ইভানভ্না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান তিমোফেই ও এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের দিকে।

'নিন্, কী আর করা যাবে!' মৃদু হেসে বললেন এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ। 'বাচ্চাটার বড় আগ্রহ, ওর ভালোই লাগবে।'

'ভালো-লাগা ওর আমি বার করছি, বাড়িতে পাঠাব!' রেগে গরগর করে বলল তিমোফেই।

গোর্কার ঠোঁটজোড়া আসন্ন কান্নায় প্রসারিত হয়ে পড়ল, সে এলেনা ইভানভ্নার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তিতে চেপে চেপে উচ্চারণ করে:

'আপনি নিজেই ত বলবেন 'যে কেউ ইচ্ছে করলে যেতে পারে...' আমার ইচ্ছে আছে যে...'

'ইচ্ছে আছে ত ভালো কথা,' এলেনা ইভানভ্না শেষ পর্যন্ত বলেন, 'উঠে এসে আমার পাশে বসে পড়্, আর দ্বীপে গিয়ে আমার কাছ থেকে এক পাও দূরে নয়! ঠিক আছে?'

'আচ্-ছা...' ফোঁপানোর স্বরে উচ্চারণ করে গোর্কা চটপট উঠে এলো নৌকোয়।

সে সঙ্গে সঙ্গে মনে সান্ত্বনা পেল, চতুর্দিকে মাথা ঘুরিয়ে লক্ষ করতে লাগল নৌকোয় পাইওনীয়রদের বসা, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের নৌকো ছাড়া আর কোস্তিয়ার দাঁড় টানা। দ্বিতীয় দাঁড় নিয়ে কোস্তিয়ার পাশেই বসে ছিল তার দাদা, কিন্তু ওর দিকে সে ফিরেও তাকাল না।

নৌকো তীর থেকে দূরে সরে যায়, সর্বত্র কেবল সূর্যের আলোয় ঝলমলে জলরাশি, গোর্কার কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। সে ধীরে ধীরে পাটাতন থেকে নেমে এসে খোলের ভেতরে গিয়ে বসল — জায়গাটা জল থেকে খানিকটা দূরে, অতটা ভয় সেখানে করে না।

'ভয় পেলি বুঝি?' এলেনা ইভানভ্না জিজ্ঞেস করলেন।

গোর্কা নাক দিয়ে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ করতে করতে নৌকোর খোলের ঝাঁঝরি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে, নিরীক্ষণ করে, কোন উত্তর দেয় না। তারপর কোন কিছু ঘটছে না এবং সবাই দিব্যি স্থির হয়ে বসে আছে দেখে সে ফের পাটাতনের ওপর উঠে আসে কিন্তু সাবধানতার খাতিরে চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব এলেনা ইভানভ্নার কাছাকাছি থাকতে। এই প্রথম সে নদীপার পার হচ্ছে, ভয়ের থেকে বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে কৌতূহল। চারদিকের সবকিছু বেশ লাগছে।

নদীর বুকে ভাসছে ডালপালা, ঘাসপাতা। কোথা থেকে ভেসে আসছে, কোথায় যাচ্ছে? জল মোটেই শান্তভাবে বইছে না, চলেছে পাক খেয়ে খেয়ে, যেন টগবগ করে ফুটছে, আর নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছে ঘোলাটে হলুদ কী যেন।

'এটা কী?' গোরুকো জিজ্ঞেস করল।

'বালি,' উত্তরে সে শুনতে পেল।

গোরুকো কেবলই ভাবে আর ভাবে। বালি পড়ে থাকে তলায়, তাহলে কী ভাবে, কেনই বা তা ওপরে উঠে আসে? ওরা ওকে নিয়ে ঠাট্টা করছে না ত, ধাপ্পা দিচ্ছে না ত ওকে? কিন্তু কেউই হাসছে না, তার পাশে বসে আছেন এলেনা ইভানভ্না, উনি বয়সে বড়, ওর সামনে মিথ্যে কথা বলবে এমন সাহস কার? তবে সে যাই হোক না কেন, বালি ত আর জ্যান্ত নয়, আর জলে ফেললে বালি সব সময়ই ডুবে যায়, এটা গোরুকো বেশ ভালোভাবেই জানে — সে নিজে কতবারই না মুঠো মুঠো বালি নিয়ে নদীতে ছুঁড়েছে, প্রত্যেক বারই তা সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় তলিয়ে গেছে। এই দুর্বোধ্য রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে গোরুকো এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, অতিরিক্ত চিন্তার চাপে তার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে।

'কী হল তোর?' কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল।

গোরুকো সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বুঝতে পারে না, চোখ ছানাবড়া করে জিজ্ঞেস করল:

'কী?'

সকলে হেসে উঠল, কিন্তু গোরুকো তা গ্রাহ্য করল না। বালিতে হলদে হয়ে ওঠা জলের ঘূর্ণির দিকে দেখিয়ে সে বলল:

'এরকম কেন?'

'বালির কথা বলছিস? নদীর তলা থেকে স্রোত তাকে ঠেসে ওপরে উঠিয়ে দিচ্ছে।'

গোরুকো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চোখ টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায়, তারপর আড়চোখে তাকায় এলেনা ইভানভ্নার দিকে — উনি চুপ করে আছেন। তার মানে, সত্যি কথাই বলছে ওরা। এবারে বোঝা গেল গোরুকো নিজে কেন ডুবে যায়। সে স্নান করে গাঁয়ের পুকুরে, সেখানে হাঁসেরা সাঁতার কাটে, স্রোত-ট্রোতের কোন বালাই নেই, অথচ তাকে তলার দিকে এমন টানে যে সে সামলাতে পারে না। বোঝা গেল যাওয়া দরকার কোন গভীর জায়গায়, যেখানে স্রোত দ্রুত। প্রথমে সে যাবে তলিয়ে, পরে স্রোত নিজেই তাকে ঠেলে তুলে দেবে ওপরে। কিন্তু যদি কোন কারণে ঠেলে তুলে না দেয়? সবাই বলে সে মোটা আর ভারী। তাছাড়া অন্য বাচ্চাদের কথাই ধর না — ওরা যে পুকুরেও সাঁতার কাটে... না, এখানে ব্যাপারটা কেমন কেমন যেন ঠেকছে, যাই বল না কেন, ওকে বোধ হয় ওরা ধাপ্পাই দিচ্ছে। গোরুকো তাই ফের কেবলই ভাবে আর ভাবে।

'সাপ! সাপ ভাসছে জলে!' বড় নৌকোর মেয়েরা চিৎকার করে উঠল।

মেয়েরা যে দিকে দেখায় সেই দিকে একসঙ্গে সকলে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লে নৌকো একপাশে কাত হয়ে পড়ে।

'সবাই শান্ত হয়ে বসে থাক!' এলেনা ইভানভ্‌না কঠোর স্বরে বললেন।

সকলে আগের মতো বসে পড়ল, তবে যতদূর পারা যায় ঘাড় বাড়িয়ে জলের দিকে তাকাতে থাকে সূর্যের আলোকবিন্দুর স্তর কেটে বড় নৌকোটার কাছ থেকে ছোট নৌকোর দিকে এগিয়ে আসছে ছোট্ট একটা সাপ, তার মাথাটার কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে গোঁফের মতো সরু সরু তরঙ্গমালা।

'আরে রামো!' সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল তিমোফেই। 'এটা ঢোঁড়া সাপ, কোন বিষসাপ নয়!'

সে আঙটা থেকে দাঁড়টা বার করে নিল, ঢোঁড়া সাপটা কাছাকাছি চলে আসতে দাঁড় দিয়ে সে ওটাকে পাকড়াও করে শূন্যে তুলে ধরল। সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে সাপটা কিলবিল করে পাক খেতে খেতে দাঁড় থেকে খসে পড়ে নৌকোর তলায় চলে গেল। ছেলেমেয়েরা তাদের শিকারপর্ব চালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এলেনা ইভানভ্‌না আপত্তি তুললেন, সাঁতরে চলে যাওয়া ঢোঁড়া সাপটার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কোস্তিয়া ও তিমোফেই ফের দাঁড় ধরল।

অবশেষে নৌকো দ্বীপে এসে ভিড়ল। সকলে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগল, মাতামাতি শুরু করে দিল, ছুটোছুটি করতে লাগল তাপে গনগনে বালির ওপরে। কেবল মিতিয়া দিম্‌কো একাই তার গাম্ভীর্য রক্ষা করে রইল।

সে সাড়ম্বরে বাহিনীর পতাকা নিয়ে আসে, পতাকার ডাণ্ডাটা বালির ভেতরে গেঁথে রেখে চেঁচিয়ে বলল:

'চুপ, কোন কথা নয়!'

'সময় নষ্ট করা চলবে না,' বললেন এলেনা ইভানভ্‌না। 'কাজ অনেক। গতকাল আমরা কথাবার্তা বলে যা ঠিক করেছিলাম সেই রকম করা যাক: ছেলেরা বেতঝাড় কাটবে আর মেয়েরা বয়ে নিয়ে আসবে এখানে, নৌকোর কাছে। যে ভালো দাঁড় বাইতে পারে সে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচকে সাহায্য করবে কাটা বেতঝাড় নৌকোয় করে ওপারে বয়ে নিয়ে যেতে।'

'কাঠুরেরা, কুড়ুল হাতে করে চলে এসো আমার কাছে!' হাঁক দিল মিতিয়া।

'বোঝা বইবার কামিনরা চলে এসো এই দিকে!' রুপোলি চুলের একটা মেয়ে রিনরিনে গলায় চেঁচিয়ে বলল। মেয়েটার বড় বড় চোখজোড়া দেখলে মনে হয় সে অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

কোস্তিয়া এখন জানে যে এরই নাম গালিয়া নমস্কার।

মেয়েরা গালিয়ার চারপাশে এসে জড় হল। কোস্তিয়া এবং আর সব ছেলেরা নৌকো থেকে

কুড়ুল বার করে মিতিয়ার কাছে গেল। তিমোফেই, মিশা আর স্বল্পভাষী লিকলিকে বরিস থেকে গেল নৌকোগুলোর কাছাকাছি — তারা পারানীর কাজ করবে।

'কেবল একটা কথা বলে রাখি কাঠুরেরা,' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ ওদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'নির্বিচারে ঝাড় কাটবে না, ঝাড়ের শেকড়সুদ্ধ ওপড়ানো মোটে চলবে না। আর বেছে বেছে কাটবে সরু ও লম্বা দেখে বেত। কুড়ুল চালাবে সাবধানে, নয়ত নিজেদের পা-টা জখম করে ফেলবে।'

'জো হুকুম, নির্বিচারে ঝাড় কাটা নয়, সরু ও লম্বা দেখে বেত কাটা চাই!' মিতিয়া জোর দিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করে। 'সবাই চলে এসো আমার পেছন পেছন!'

পুরোদস্তুর কাঠুরেদের মতো কুড়ুল কাঁধে ফেলে ছেলের দল ঘন ঝোপঝাড়ের দিকে ছুটল। দেখতে দেখতে দ্বীপের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল সেঁতসেঁতে বেতঝাড়ের গায়ে কুড়ুলের চাপা ঢপঢপ ঘা মারার শব্দ। ছেলেদের পেছন পেছন এলো মেয়েরা, তারা কাটা ডালপালাগুলো জড় করতে থাকে। সরু নমনীয় বেত দিয়ে ডালপালা কী ভাবে গোছা করে বাঁধা যায় এলেনা ইভানভ্না তা দেখিয়ে দিলেন। গোর্কা সর্বক্ষণ এলেনা ইভানভ্নার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সেও সোৎসাহে সরু সরু ডাল কুড়িয়ে এক জায়গায় জড় করে, কিন্তু কুড়ুল হাতে ছেলেদের দিকে ঈর্ষাভরে আড়চোখে তাকায়।

কোস্তিয়া নির্মমভাবে কোপাতে কোপাতে পথ কেটে ঝোপঝাড়ের ভেতরে ঢোকে, অদূরে কর্মরত মিতিয়ার দিকে দৃষ্টি রাখে সে — তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিনা লক্ষ করে। মিতিয়া ধীরেসুস্থে, নিশ্চিন্তে ঝাড়ে কোপ বসায়, কিন্তু দ্রুত এগোতে থাকে সামনের দিকে — তার নাগাল ধরা খুব একটা সহজ কাজ নয়। কোস্তিয়ার বাঁ দিকে কটাচুল সেনিয়া জুরিলো। সে হল বাহিনীর বিউগল বাজিয়ে, তার পিঠের ওপর দুলছে মেজেঘষে চোখ ধাঁধানো জেল্লা তোলা বিউগল।

'মনে হচ্ছে আমরা যেন জঙ্গলের মধ্যে, তাই না?' কোস্তিয়া বলল মিতিয়াকে। 'যেন লতার ঝোপ কেটে পথ বানাচ্ছি।'

'আরে, এ ত হল উইলোর ঝোপ — জঙ্গল আবার কিসের?' বিদ্রূপের সুরে পালটা জিজ্ঞেস করল সে। 'মাথায় যত খেলেও! তুই কাট ত দেখি, সোজা লাইন ধরে কাট!'

মিতিয়ার প্রতি কোস্তিয়ার সহানুভূতি উবে গেল। কী ছেলে রে বাবা, কোন কল্পনার বালাই নেই! ও বুদ্ধিমান হয়ত ঠিকই, তবে রসকষহীন... মিতিয়ার দিকে সে আর মনোযোগ দেয় না, একা-একাও তার নেহাৎ খারাপ লাগছে না। তার মনে পড়ল এখানে আসার আগে আগে সে যে বইটা পড়েছিল — 'দের্সু উসালা', মনে মনে সে নিজেকে কল্পনা করে কখনও সিখোতে আলিনের আদিম অরণ্যে বিচরণকারী দুঃসাহসী আর্সেনিয়েভ রূপে কখনও বা তাঁর

পথপ্রদর্শনকারী রূপে! কোস্তিয়া এখন অবধি কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারে নি কোন্‌টা হওয়া ভালো — একে এবং ওকে, দু'জনকেই তার সমান ভালো লাগে।

'নৌকো বোঝাই হয়ে যাত্রা করেছে!' তীর থেকে ফিরে এসে নিউরা চিৎকার করে বলল।

'সোনিয়া, বিউগল বাজিয়ে বিরতি জানিয়ে দাও,' এলেনা ইভানভ্‌না বললেন।

সোনিয়া বিউগল কাঁধ থেকে খুলে নিয়ে চোঙাটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে মুখে ফুঁ দিল।

'তা-তা-তা-তা...' নদীর ওপর দিয়ে ভেসে চলে তামার বাজনাযন্ত্রের সুরেলা কণ্ঠ।

কোস্তিয়া এখনও মোটে হয়রান হয় নি, সে সবে সত্যিকারের উৎসাহ বোধ করছিল, কিন্তু তাহলেও এই আহ্বানের বিরুদ্ধাচরণ সে করে না, সকলের মতো সেও যায় বনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায়, এলেনা ইভানভ্‌নার কাছে। ছেলেমেয়েরা আলাপ-আলোচনা করে, হিসাব করে দেখে আরও কত বেতঝাড় কাটা দরকার, এদিকে কোস্তিয়া কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে গোর্‌কার কাণ্ডকারখানা দেখতে থাকে।

গোর্‌কা ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ঘুরে গিয়ে ঝোপের নীচে একটা গর্ত দেখতে পেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে গর্তের ভেতরে উঁকি মারার চেষ্টা করল। ভেতরটা অন্ধকার, গোর্‌কা তাই কিছু দেখতে পেল না, সে গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল, তারপর একটা ডাল দিয়ে খোঁচাতে শুরু করল।

গোর্‌কাকে লক্ষ করতে করতে কোস্তিয়া ভাবতে চেষ্টা করল কার সঙ্গে ছেলেটার মিল। আরে, এত ভাবার কী আছে? লিওল্‌কার সঙ্গে — তা আর বলতে! ওরা একেবারেই আলাদা আলাদা, তাহলেও খুবই মিল আছে। লিওল্‌কাও এই রকমই সর্বক্ষণ কোস্তিয়ার পেছন পেছন লেগে থাকে, নাছোড়বান্দার মতো তার সঙ্গে লেগে থাকার চেষ্টা করে, সে যা করে তাই করতে চায়, কোস্তিয়া তাকে তাড়িয়ে দেয়। লিওল্‌কা তাতে মনে দুঃখ পায়, কখনও কখনও কাঁদেও, কিন্তু মনের দুঃখ দেখতে দেখতে চলে যায়, ফের সে কোস্তিয়ার পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে। গোর্‌কার মতন লিওল্‌কারও অবশ্যই বড়রা যা যা করে তাতে মজা লাগে, ইচ্ছে হয় ঐ একই রকম কাজ করতে। তা কী আর করা যাবে, ও যে ছোট — ভাবতে ভাবতে করুণা জাগে কোস্তিয়ার মনে। অথচ কোস্তিয়া কিনা লিওল্‌কার দিকে কোন মনোযোগই দেয় না, যেমন মনোযোগ দেয় না গোর্‌কার দিকে তিমোফেই। না, বিচার-বিবেচনা করে দেখলে অবশ্যই যা-তা ব্যাপার বলতে হয়!

লিওল্‌কা এখন দূরে, কিন্তু বিবেকের দংশন আর উদার অনুভূতির উচ্ছ্বাস কোস্তিয়াকে এখন স্বস্তি দিচ্ছে না। কোস্তিয়া উঠে পড়ে বলল:

'এলেনা ইভানভ্‌না, গোর্‌কাকে আমি একবার দ্বীপটা দেখিয়ে নিয়ে আসি?'

'ভালো। তবে দেখো, জলের কাছাকাছি যেয়ো না!'

'আমি ত আর ছোট ছেলে নই, বুঝি... গোর্‌কা, চল্‌ রে আমার সঙ্গে!'

গোর্‌কা সোৎসাহে লাফিয়ে উঠে কোস্তিয়ার দিকে ছুটে এলো। ঝোপের কাটা জায়গাগুলি

পেরিয়ে তারা চলল দ্বীপের আরও ভেতরের দিকে। ওরা চলতে থাকে ধীরে ধীরে, কেননা গোর্কা যখন তখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অখণ্ড মনোযোগসহকারে কখনও নিরীক্ষণ করতে থাকে ডালের ওপর শুঁয়োপোকার চলাফেরা, কখনও নৌকোর পালের মতো ডানা গুটিয়ে বসে থাকা প্রজাপতি, কখনও বা কোথা থেকে কে জানে দ্বীপে এসে পড়া ছেঁড়া এক পাটি জুতো।

বনের ভেতরের একটা অল্পস্বল্প ফাঁকা জায়গা সূর্যের আলোয় আলোকিত, সেখানে সবজেটে, ছাই-ছাই রঙের কী যেন একটা নড়াচড়া করছিল। কোস্তিয়া সামনের দিকে ছুটে গেল। কচ্ছপ! ছোট্ট, কিন্তু একেবারে সত্যিকারের, জ্যান্ত কচ্ছপ। কিয়েভে জ্যান্ত কচ্ছপ নিয়ে আসতে পারলে — একটা কাজের কাজ হয় বটে! কচ্ছপটা পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু কোস্তিয়া খপ করে তার খোলা চেপে ধরল; কচ্ছপ মাথা আর পা লুকিয়ে স্থির হয়ে পড়ে থাকল। কোস্তিয়ার পাশে উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে ততক্ষণে উটকো হয়ে বসেছে গোর্কা।

'এটা কী?'

'কচ্ছপ! জ্যান্ত। এই দ্যাখ, আমি ওকে এখন চিত করে দেব, তাহলেই আর কোথাও যেতে পারবে না।'

কোস্তিয়া কচ্ছপটাকে উলটে দিল। কিছুক্ষণ সেটা স্থির হয়ে পড়ে রইল, তারপর সন্তর্পণে খোলার ভেতর থেকে মাথা ও পাগুলো বার ক'র মাটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল।

'থাক, দুষ্টুমি করে আর কাজ নেই!' কোস্তিয়া আঙুল দিয়ে খোলে টোকা মারতেই কচ্ছপ ফের হাত-পা গুটিয়ে নিল। 'শিগগির! এদিকে এসে দেখ সবাই!' কোস্তিয়া হাঁক দিল।

মটমট আওয়াজ করে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে জড় হল ছেলেমেয়েরা, সকলে ঘিরে দাঁড়াল কোস্তিয়ার শিকারের চারধারে। মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে যায়, ভয়ও পায়, ছেলেরা কিন্তু মুগ্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখায় না — এর চেয়েও বড় তারা দেখেছে। গোর্কা জড়সড় হয়ে বসে কচ্ছপের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তারপর মাথা তুলে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব নিয়ে বলল:

'সত্যি নয়!'

'কী সত্যি নয়?' সবাই হো হো করে হাসতে হাসতে বলে।

'সাশা আমাকে বলেছিল: 'মেরে তোকে কচ্ছপের মতো কিম্ভূত বানিয়ে দেব।' কিন্তু কিম্ভূত ও মোটেই নয়। সাধারণ। হাত আছে পা আছে...'

এই দীর্ঘ ভাষণের পর এবং হাসাহাসির দিকে দৃকপাত না করে কচ্ছপের দিকে ঝুঁকে, ফের সে বসে রইল জড়সড় হয়।

'যথেষ্ট হয়েছে! কাজে হাত লাগাতে হয়,' মিতিয়া বলল, 'নয়ত এই কচ্ছপ নিয়েই আমাদের মেতে থাকতে হবে, এদিকে নৌকো ঐ ফিরে এলো বলে।'

সোনিয়া জুরিলো আবার বিউগল বাজাল, আবার ঝপাঝপ পড়তে লাগল কুড়ুলের মৃদু ঘা; মেয়েরা আঁটি বাঁধা উইলোর ঝাড় নিয়ে তীরের দিকে ছোটে। কাটতে কাটতে সকলে আরও

দূরে ঝোপঝাড়ের গভীরে প্রবেশ করল, কিন্তু গোর্কার সরার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না, তাকে নড়াতে পারে কেবল কোস্তিয়া — কচ্ছপটাকে সে নতুন জায়গায় উঠিয়ে নিয়ে গেল। চিত করা কচ্ছপ এক সময় তার হাত-পা বার করলে সেই সুযোগে কোস্তিয়া তার পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলল। গোর্কা দড়িটা শক্ত করে দু'হাতে ধরে রাখল, এবারে কচ্ছপ পালিয়ে যাবার ভয় নেই গোর্কার।

সোনিয়া আরও তিনবার বিউগল বাজাল। আরও তিনবার নৌকো যায় আর ফিরে আসে, শেষকালে নিউরার মারফত এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ জানিয়ে দেন যে আর কাটা নয় — দেড় টনী ট্রাকের পক্ষে যথেষ্ট, এখন ফিরতে হয়। সূর্য অনেকক্ষণ হল পশ্চিমে হেলে পড়েছে, ঘণ্টা তিনেক বাদেই অস্ত যাবে। ছেলেমেয়েরা তীরে এসে বসে, তারা বসে বসে লক্ষ করে উইলো ঝাড়ের আঁটিতে চুড়োচুড়ি বোঝাই দুটো নৌকো মন্থরগতিতে শেষবারের মতো তীরের দিকে চলেছে, পরে আবার ফিরে আসছে। কথা বলার ইচ্ছে কারও নেই, সকলেই ক্লান্ত, কেবল মিতিয়া সংক্ষেপে ও পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে সবাই ভালোমতো কাজ করেছে বলেই মনে হচ্ছে, কেউ আলসেমি করে নি, কাজে ফাঁকি দেয় নি, আর কোস্তিয়া তাদের বাহিনীর ছেলে না হলে কী হবে, কাজ সে করেছে তাদের সেরা কাটিয়েদের সমানে সমানে। কোস্তিয়া অবশ্য ইতিমধ্যে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে যে মিতিয়াটা একেবারেই রসকষহীন, তবু প্রশংসাটা শুনতে তার ভালোই লাগল।

আগের মতোই সকলে নৌকোয় গিয়ে উঠে বসল। কোস্তিয়া ও তিমোফেই দাঁড় টানতে লাগল। গোর্কা কচ্ছপ নিয়ে ব্যস্ত। তার ভয় হচ্ছিল যে খিদেয় ওটা মারা যাবে, তাই সে চেষ্টা করে ওর মুখে কখনও ঘাসের গোছা গুঁজে দিতে, কখনও বা গুঁজে দিতে দুটো ফড়িং, যাদের ডানা সে ছিঁড়ে ফেলেছিল যাতে উড়ে না যেতে পারে। কচ্ছপটা নৌকোর খোলের ভেতরে ইতস্তত ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কিছু খাওয়ার ইচ্ছে তার নেই, গোর্কা তাই মন খারাপ করে।

'ঘাবড়াস নে,' কোস্তিয়া বলল, 'কচ্ছপেরা অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারে। এমন কি কিয়েভ পর্যন্তও না খেয়ে চালিয়ে দিতে পারে।'

তীরের কাছাকাছি আসার পরই সকলে দেখতে পেল কী বিপুল পরিমাণ উইলো কেটে তারা স্তূপাকার করেছে। ওখানে ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে দেড় টনী ট্রাক। ইভান কুজমিচ আর ড্রাইভারে মিলে আঁটিগুলো ট্রাকে তুলছিল।

নৌকো থেকে লাফিয়ে প্রথমে তীরে নামে পতাকা হাতে ধরে মিতিয়া, নেমেই হাঁকে নির্দেশ:

'সার বাঁধ!'

এবারে কিন্তু কোস্তিয়াও তিমোফেই ও নিউরার মাঝখানে সারিতে দাঁড়িয়ে পড়ল, এর জন্য তাকে কেউ কিছু বলল না। কেবল মিতিয়া আশ্চর্য হয়ে ভুরু কপালে তুলল, তবে স্পষ্টই বোঝা গেল সেও বুঝতে পেরেছে যে কোস্তিয়া এই অধিকার দাবি করতে পারে।

ইভান কুজ্‌মিচ সারির দিকে এগিয়ে এলেন। মিতিয়া ডানপাশের একজনের হাতে পতাকাটা দিয়ে বিবরণী দান করল:

'কমরেড কর্মিবাহিনীপ্রধান! সাশা চেকালিন বাহিনী বিশেষ দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন করেছে। কোন আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে নি। রিপোর্ট দেওয়া হল।'

কী রীতিতে উত্তর দিতে হয় জানা না থাকায় ইভান কুজ্‌মিচ সাদাসিধে ভাষায়, আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন:

'তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ! তোমরা গৌরবের কাজ করেছ। যৌথখামারের তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই তোমাদের!'

'আমরা বরাবর তৈয়ার আছি!' গমগম করে সমস্বরে বলে উঠল সকলে।

'এসো আমরা গাড়িতে তুলতেও সাহায্য করি, কী বল?' এলেনা ইভানভ্‌না বললেন।

'নিশ্চয়ই!' সকলে চিৎকার করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল উইলোর আঁটির গাদার ওপর।

চারদিক থেকে ঝরে পড়া আঁটিগুলি ইভান কুজ্‌মিচ ও ড্রাইভারে মিলে তুলে তুলে রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রাকের ভেতরে জমা হয়ে গেল কাটা উইলোর উঁচু স্তূপ, যাতে ঝরে পড়ে না যায়, তার জন্য ড্রাইভার সেগুলির চারধারে দড়ির বাঁধন দিল।

'ওদের হয়ত অনেক ধকল গেছে, তাই না?' ইভান কুজ্‌মিচ জিজ্ঞেস করলেন এলেনা ইভানভ্‌নাকে। 'অপেক্ষা করুন, আমরা দ্বিতীয় খেপে আপনাদের নিয়ে যাব।'

'খামোকা গাড়ি চালিয়ে পেট্রোল জ্বালানো কেন?' মিতিয়া বিবেচকের মতো আপত্তি তুলে বলল। 'আপনারা ত ঘুরে যাবেন, আর আমরা যাব সোজা পথে, খাদের ভেতর দিয়ে, আপনাদের চেয়ে আগে বাড়ি পেঁছে যাব।'

'কেবল এই বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে নিন,' এলেনা ইভানভ্‌না বললেন।

'একে? ও, ইয়েগোর তিমোফেয়েচিভ!' হেসে বললেন ইভান কুজ্‌মিচ। 'গাড়ি চড়ে বেড়ানোর ইচ্ছে? প্রথম শ্রেণীর কামরা, গদি মোড়া, খোলা হাওয়া।'

গোর্‌কাকে লুফে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে দেন ড্রাইভারের কাছে, ড্রাইভার তখনও দাঁড়িয়ে ছিল উইলোর স্তূপের ওপরে।

গোর্‌কার মুখ গদগদ হাসিতে বিগলিত হয়ে পড়ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেবাচেকা খেয়ে বিমর্ষ হয়ে গেল: কচ্ছপটা নীচে রয়ে গেছে!

কোস্তিয়া কচ্ছপটাকে ওপরে তুলে ধরল। এটা তার শিকার, তার ইচ্ছে ছিল কিয়েভে নিয়ে যায়, ওটাকে হাতছাড়া করতে তার বড়ই দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু এক মুহূর্তের বেশি ইতস্তত না করে সে কচ্ছপটাকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল:

'এই ধর্‌ তোর চিড়িয়াখানা!'

গোর্কো দু'হাতে দড়িটা চেপে ধরল, ফের তার মুখে ফুটে উঠল একগাল হাসি।

'সার বেঁধে দাঁড়াও সবাই!' এলেনা ইভানভ্না বললেন। 'বাড়ি যেতে হবে এখন।'

ফের বাজে সোনিয়ার বিউগল, বাজে ড্রাম, বাহিনী তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে পা ফেলে খাদের দিকে। ইভান কুজ্মিচ উঠে গেলেন গাড়ির ওপরে, গোর্কোর কাছে। ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল।

'চলি রে গোর্কো!' হাত নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলল নিউরা।

গাড়ি দূরে চলে যায়। নরম উইলো ঝাড়ের পাহাড়ের ওপর বসে দুলতে থাকে গোর্কো, দু'হাতে ধরে থাকে কচ্ছপটা, আর তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে পরম সুখের উপলব্ধি।

সামাল, কোস্তিয়া!

অসহ্য রৌদ্রের তাপ ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠছে। রোজ সকালে তুষারের মতো ঝলমলে মেঘের কুণ্ডলী দেখা যায়। পাছে ঝলসে যায় কিংবা গলে যায় এই আশঙ্কায় যেন মেঘের দল সূর্যের পাশ কাটিয়ে চলে, তবু সন্ধ্যার অনেক আগেই গলে যায়। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ মাথা নাড়িয়ে বলেন যে এই ভাবে অনাবৃষ্টিতে সব খেতি বরবাদ হয়ে যাবে। তিমোফেই তার চারাগাছগুলির জন্য উদ্বেগ বোধ করে, অথচ কোস্তিয়ার লাগছে দিব্যি ভালো। কেবল রাতের বেলায় যদি এমন গুমোট না হত! রাতে গুমসানির ফলে সে জেগে ওঠে, লক্ষ করে দূরে কোথায় যেন বিজলি ঝিলিক দিয়ে উঠল আর তা দেখে অনুমান করে যে কাল বৃষ্টি হবে, কিন্তু পরের দিনও সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। নৌকোর গা থেকে মাখা আলকাতরা দরদর ধারে ঝরে পড়ছে উত্তপ্ত কালো অশ্রুর মতো, উইলোর পাতাগুলি কুঁকড়ে গুটিয়ে যাচ্ছে, খসখস করছে, যেন কাগজের পাতা।

রবিবার দিন নিউরা দুপুরের খাবার তৈরি করে দিয়ে দিদার কাছে চলে যায়। ছেলেরা কেন যেন আসে না, কোস্তিয়া পড়ে যায় একা।

দিনটা অসম্ভব গরম আর গুমোট।

'দেখেশুনে বৃষ্টি আসবে বলে মনে হচ্ছে — খুব ভেপসা গরম,' দুপুরের খাওয়ার সময় এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বললেন।

'না মেঘ কেটে যাবে। দেখবেন!' জোর গলায় বিরোধিতা করে বলল কোস্তিয়া।

'দেখা যাবে। আমাদের কর্ত্রীটি যেহেতু আসে নি, অতএব তোকেই বাসন মাজতে হবে এখন।'

নিউরা যে নেকড়া আর ছোবড়া দিয়ে ঘষে ঘষে বাসন মাজে, সেগুলি নিয়ে কোস্তিয়া অনেকক্ষণ নাকানি-চুবানি খায়, কিন্তু প্লেটগুলো কেন যেন আগের মতোই তেলতেলে আর

চটচটে হয়ে থাকে। এই ভাবে কোন সুবিধা করে উঠতে না পেরে সে হাঁড়িকুঁড়ি আর থালাবাসনের স্তূপ নিয়ে নদীর ধারে চলে যায়, চেষ্টা করে বালি দিয়ে ঘষে মাজার। দেখা গেল কাজটা অনেকক্ষণের আর বহু সময় সাপেক্ষ। যাই হোক না কেন কোস্তিয়া যখন কাজ সেরে উঠল ততক্ষণে দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠে মেঘের রাশি সূর্যকে ঢেকে দিল। সূর্য কখনও এ ফাঁক কখনও বা ও ফাঁক দিয়ে ফুঁড়ে বের হয়, কিন্তু শিগগিরই মেঘ একসঙ্গে মিলে জুড়ে দেয় সেই ফাঁক। পশ্চিমের দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে ভয়ংকর কালো মেঘ। সে মেঘের তাড়া খেয়েই যেন আগে আগে ধেয়ে আসছে সাদা মেঘের পাতলা গোছা, কিন্তু অপ্রতিহত কালো মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে, গুরুগুরু আওয়াজ তুলে মন্থরগতিতে চলেছে তার পিছু পিছু।

নদী হতে থাকে কাচের মতো, কোস্তিয়ার মনে হয় যেন থমকে গেছে। উইলোর আনত, অস্থির শাখাগুলি, রোজ উইলোর পাতার মর্মরধ্বনি স্তব্ধ। কালো মেঘ শীতল আমেজ না এনে নিয়ে আসছে আরও বেশি গুমসানি। আকাশ ছেয়ে গেছে নীলচে রঙের ঝাঁকড়া ঘন স্তরে, তারই মাথার ওপরে কোথায় যেন অনুচ্চ ছাড়া ছাড়া গুরুগুরু আওয়াজ উঠছে।

'আমাকে এবারে যেতে হয়। তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে আসবে,' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বললেন। 'তুই এখানে থাক, গেরস্থালি দেখাশোনা কর।'

মামা নৌকো ছেড়ে দিলেন। কোস্তিয়া বাসনপত্র উঠিয়ে রেখে চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে মেঘের খেলা দেখে। মেঘ একের পর এক স্তূপাকার হয়ে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে গোটা আকাশ জুড়ে। অন্ধকার হতে হতে শেষকালে ঘুটঘুটে হয়ে যায়। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের ফেরার নাম নেই, নিউরারও না। হয়ত মেঘের ঘনঘটা দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে দিদা তাকে রেখে দিয়েছেন, রাতটা ওখানেই কাটাবে। মুখোমুখি হাওয়া বাতাস খেলিয়ে ঘরের ভেতরের গুমোট ভাব কাটানোর উদ্দেশ্যে দরজা জানলা খুলে দিয়ে কোস্তিয়া বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ঝনঝন, গমগম আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। কোস্তিয়া ভীতচকিত হয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে অন্ধকারের ভেতরে তাকাল। ঘরের ভেতর দিয়ে হুহু শন্‌শন্‌ আওয়াজ তুলে ছুটছে বায়ু, জানলার পাল্লা দড়াম দড়াম শব্দে খোলাবন্ধ হচ্ছে, ঝনঝন করে ছিটকে পড়ছে শার্সী, দরজা দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ছে আবার ছিটকে যাচ্ছে। হুহু বাতাসের প্রচণ্ড বেগের বিরুদ্ধে অনেক কষ্টে সামনে এগিয়ে গিয়ে কোস্তিয়া দরজা বন্ধ করল, ছুটে গেল জানলার দিকে। ভাঙা কাচ আর খোলামকুচি পায়ের নীচে খচমচ করে, কী যেন একটা বিঁধে গেল তার পায়ের গোড়ালিতে। জানলার ফ্রেমটা সে দড়াম করে আটকে দিল, ভাঙা পাল্লাটার ভেতরে কম্বলই গুঁজে দিল, তারপর খুঁজে পেতে দেশলাই বার করে কাঁপা কাঁপা হাতে বাতি জ্বালাল।

ঘরের ভেতরে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। টেবিলের ওপর রাখা ছিল এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের জন্য রাতের খাবার। খাবারদাবার সমেত টেবিলক্লথটা ঝেঁটিয়ে টেবিল থেকে উড়ে গেছে, ঘরময় ম্যাকারনি ছড়িয়ে পড়েছে, দুধ পড়ে গিয়ে যে জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভাসছে কাটলেট।

দরজার ঠিক পাশের হ্যাঙ্গারটা একটা কাঁটার ওপর ঝুলঝুল করছে, সেখান থেকে জামাকাপড় খসে এলোমেলো গাদা হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। আর জানলার নীচে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে ভাঙাচোরা খোলামকুচি, কাচ, মাটি আর দলামোচড়া পাকানো, চূর্ণবিচূর্ণ গাছগাছড়া — জানলার তাকে নিউরার যে সমস্ত ফুলগাছ ছিল সেগুলির ধ্বংসাবশেষ। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নেই। রান্নাঘরের চিমনির ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ম হুহু গর্জন করে চলেছে ক্রুদ্ধ বাতাস।

কোস্তিয়া দরজার পাল্লা সামান্য খুলল, খুলতে প্রথমে আঁটো আঁটো লাগছিল, পরে সম্পূর্ণটা হাঁ হয়ে খুলে গেল, আর বাইরে বেরিয়ে এসে কোস্তিয়া যখন ওটাকে ভেজাতে গেল তখন দড়াম করে এসে পিঠে ধাক্কা মেরে তাকে ঠেলে দিল উঠানে। দমকা বাতাস কোস্তিয়াকে ঠেলতে থাকে বাড়ির দিকে, সে অনেক কষ্টে বাধা ঠেলে এগোয়, চলতে থাকে হুহু গর্জনরত কালো শূন্যতার গর্ভে, নদীর দিকে, যেখানে ক্রুদ্ধ হয়ে কী যেন একটা আছড়ে পড়ছে, ঝাপটা মারছে। মাথার ঠিক ওপরে যেন অবিরাম গড়াতে গড়াতে আসছে লোহার পিপেগুলো। চুড়ো-উলটে-পড়া চোখ ধাঁধানো জ্বলন্ত একটা গাছ যেন কড়কড় শব্দে পড়ে অন্ধকারের বুক ছিঁড়েফুঁড়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে সব হয়ে গেল সাদাটে নীল-নীল, যেমন মুভির ফিল্ম ছিঁড়ে গেলে সিনেমার পর্দার ওপর দেখা যায়। রোজ উইলোর ঝাড় সাদা ফেকাসে হয়ে মাটির গায়ে লেপটে আছে, উইলো ঝোপ তাদের ডালপালার হাত নেড়ে চাবুক আছড়ায়, কালো সফেন জল তীরে এসে ছিটকে পড়ে, ক্ষিপ্ত হয়ে টগবগ করতে থাকে, ফের আছাড় খেয়ে পড়ে।

কোস্তিয়ার মাথার ওপরকার আকাশ বিদীর্ণ হয়ে এমন কড়কড় শব্দে ভেঙে পড়ে যে কোস্তিয়া খাড়া পাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে ঢালের গায়ে ঘেঁষে দাঁড়ায়। বাজ পড়ার আওয়াজে কোস্তিয়া ভয় পায় না। কিন্তু শহরে হলে এক কথা, সেখানে আছে পাকা দেয়াল, ছাদে বজ্র নিবারণের দণ্ড, আর ঘরের ভেতরে শান্ত ও স্নিগ্ধ ভাবে জ্বলছে বিজলি বাতি, কিন্তু অন্য ব্যাপার এখানে, নিশুতি রাতে, নির্জন নদীতীরে, যেখানে কোন জনপ্রাণী নেই, কিছুই নেই, আছে কেবল ঠাণ্ডা বাতাস, ক্ষিপ্ত জলরাশি আর গুমগুম শব্দ, যে শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম।

সবচেয়ে খারাপ হল এই যে কারও দেখা নেই। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ ফিরছেন না, তিনি ছাড়া এখানে আর কারও আবির্ভাব ঘটতে পারে না। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কোস্তিয়ার নিজেকে বিশাল ফাঁকা তীরে মনে হতে লাগল বড় ছোট, অসহায় আর নিঃসঙ্গ বলে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল কোথাও ছুটে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে, মাথা গোঁজে, যাতে কিছু দেখতে না হয়, শুনতে না হয়। কিন্তু তক্ষুনি কোস্তিয়ার লজ্জাও হতে লাগল। এমনই ভীতু কিনা সে! এও ত হতে পারে মামার কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে, সাহায্য দরকার তার?

হাত উঠিয়ে বাতাস থেকে মুখ আড়াল করে, সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে, যেখানে বাড়তি বয়া আর খুঁটিগুলি ছিল সেদিকে এগিয়ে যায় কোস্তিয়া। মামা সেখানে নেই। কতগুলি

খুঁটি হাওয়ায় মাটিতে পড়ে গেছে। কোস্তিয়া তীর ধরে চলতে থাকে ওপরের দিকে, তারপর স্রোতের নীচের দিকে — না দেখা যাচ্ছে মামাকে, না তার নৌকো। কোস্তিয়া ফের জলের দিকে নেমে যায়, চিৎকার করে, কিন্তু তার ঝনঝনে গলার আওয়াজটা মুখের ঠিক সামনে এসে নীরব হয়ে গেল, যেন ওখানে তুলো গোঁজা আছে।

চারদিক থেকে ঝুপঝাপ উপড়ে হয়ে পড়ছে শাখাপ্রশাখাযুক্ত জ্বলন্ত গাছ — বিদ্যুতের শিখা, আর প্রতিটি ঝলকের পর পরই ওপরে শুরু হয়ে যাচ্ছে ধস, যেন কালো মেঘের বিশাল পুঞ্জ জমাট পাথর হয়ে গিয়ে অবিরাম ভেঙে পড়ছে আতঙ্ক-স্তব্ধ পৃথিবীর বুকে।

বিদ্যুৎশিখার আলোয় কোস্তিয়া দেখতে পেল কালো, লম্বা আর মোটামতন কী যেন একটা দ্রুত এগিয়ে আসছে তীরের দিকে, অবশেষে সেটা তার ভারী মুখ ঘষটে এক গাদা ভিজে বালি তুলে আছড়ে পড়ল তীরের ওপর। কোস্তিয়া আতঙ্কে শিউরে উঠে লাফিয়ে সরে গেল একপাশে। সে বেশ ভালোভাবেই জানে যে নীপারে কোন দৈত্যিদানো নেই, কিন্তু কে জানে বাপু?.. এই মুহূর্তে স্কুলের সমস্ত বিদ্যা তার মাথা থেকে বেরিয়ে গেল, সে আড়ষ্ট হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন এই ভয়ঙ্কর জীবটা তার হাঁ খুলবে। কিন্তু হাঁ আর খোলে না, দানোটা বালির ভেতরে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে, কেবল তার লেজটা একটু আধটু লাফাতে থাকে, আছাড় খায় জলের বুকে। তারপর লেজ ডান দিকে ঘোরে, দানোটা বালি থেকে সরাৎ করে নেমে একটু দূরে ভেসে যায়, এই সময় ফের বিদ্যুৎ চমকে উঠতে তার আলোয় কোস্তিয়া ওটাকে নিছক একটা কাঠের গুঁড়ি বলে চিনতে পেরে পুলকিত হয়ে উঠল, স্বস্তি বোধ করল।

কোস্তিয়া চোখ কোঁচকাল, মাথা ঝাড়া দিল — ভয় পাওয়ার জন্য তার বড়ই লজ্জা লাগছিল — সঙ্গে সঙ্গে সে সান্ত্বনাও পেল। শুধু মেঘের ডাক হলে না হয় কথা ছিল! কিন্তু বজ্র, বিদ্যুৎ, বাতাস... ভয় পাওয়ার কথা বৈকি!

সে বাড়িতে ফিরে এসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘর সাফ করতে লেগে গেল। যেসব জামাকাপড় পড়ে গিয়েছিল সেগুলি সে যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখল। টেবিলক্লথ বিছাল। ম্যাকারনি ঝাঁট দিয়ে গাদা করে চৌকাঠের দিকে নিয়ে, ফুলের টবের খোলামকুচি আর ভাঙা কাচের টুকরোগুলো বালতির ভেতরে ফেলল। বিদ্যুৎ আগের মতোই গর্জনরত আকাশের গায়ে আঁচড় কেটে যাচ্ছে, বাতাস তীক্ষ্ণ শিস দিচ্ছে হুহু ধ্বনি করে, কিন্তু কোস্তিয়া এখন আর ডরায় না।

ঘর সাফ করা শেষ হলে সে তার খাটের ওপর গিয়ে বসল, বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের, থেকে থেকে তাকাতে লাগল বড় দেয়াল ঘড়িটার দিকে। দমকা বাতাসে দোলকটা কোন এক সময় জড়াপাল্টা খেয়ে গেছে শেকলের গায়ে, ঘড়ি থেমে গেছে, তার পর থেকে যে কত সময় চলে গেছে কে জানে! এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ এখনও ফিরছেন না। আর এখন নদীতে কীই বা করা যেতে পারে? মাথার ভেতরে এমন সমস্ত চিন্তা উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে

যে কোস্তিয়ার যেন কেমন-কেমন লাগতে শুরু করল, সে চেষ্টা করল ওসব কথা না ভাবতে, কিন্তু যত বেশি না ভাবার চেষ্টা করে ততই বেশি করে সেই সব চিন্তা মনে আসতে থাকে।

গোড়ার দিকে ক্বচিৎ, পরে ক্রমেই ঘনঘন শোনা যেতে লাগল ছাদের ওপর টাকাপিটুনি, বৃষ্টির জোর আওয়াজে ঘর ভরে গেল। কাচের ওপর জলের ফোঁটা এসে আঘাত করে, ফোঁটাগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে অতি দ্রুত নীচের দিকে বয়ে চলে। কোস্তিয়া সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, তার আফশোস হয় এই ভেবে যে এখন রাত। দিনের বেলা হলে এক ছুটে 'গর্জন খাতে' গিয়ে শোনা যেত ওটা সত্যিসত্যিই গমগম করে কিনা, নাকি অমনি অমনি, লোকের মুখের কথা।

দরজা খুলে গেল, চৌকাটের ওপাশে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ধারা, তেরছা ধারাবর্ষণের মধ্যে আবির্ভাব ঘটল এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন টেবিলের দিকে। পোর্টম্যান্টোর আকারে উঁচিয়ে থাকা বর্ষাতি থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ কেন যেন বর্ষাতি না খুলেই টুলের ওপর বসে পড়েন, সন্তর্পণে হাতদুটো রাখেন টেবিলের ওপরে।

'জেগে আছিস ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ,' কোস্তিয়া মাথা নাড়িয়ে বলল।

সে সাগ্রহে খাট থেকে নেমে পড়ল, তার ইচ্ছে ছিল কী ভাবে সে জেগে ওঠে, বাতাসে কী করে জানলার কাচ আর ফুলদানি ভেঙে পড়ে এসবের বর্ণনা দেয়, কিন্তু হঠাৎ সে চুপ করে গেল, আঁতকে উঠে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মামার হাতের দিকে। ডান হাতের কব্জির তুলনায় তাঁর বাঁ হাতের কব্জিটা বিশাল মনে হচ্ছে। ছড়ে, ফুলে লাল দগদগে হয়ে কব্জিটা টেবিলক্লথের ওপর এমনভাবে পড়ে আছে যে দেখলে ভয় করে। মামার মুখ ফেকাসে হয়ে গেছে, তিনি অতি কষ্টে ছাড়া ছাড়া দম ফেলছেন, মনে হয় যেন অনেকক্ষণ ছুটে ছুটে পাহাড়ে উঠেছেন।

'কাঠের গুঁড়ির ঘায়ে থেঁতলে গেছে,' কোস্তিয়ার ভয়ার্ত দৃষ্টি লক্ষ করে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বললেন। 'স্রোতের ওপরের দিকে কোথাও ভেলা-টেলা ভেঙে গেছে কিনা কে জানে — গুঁড়িগুলো জাহাজ চলাচলের সমস্ত পথ জুড়ে ছুটে চলছিল ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো। মনে হচ্ছে এতক্ষণে সব ধুয়ে চলে গেছে... হাতটা বাঁধতে পারলে হত।'

কোস্তিয়া তোয়ালে তুলে নেয়।

'জলে ভেজা।'

মোটা করে জড়িয়ে তোয়ালেটা বাঁধা হল কব্জির চারপাশে। ব্যাণ্ডেজ যাতে খুলে না যায় তার জন্য কোস্তিয়া দড়ি দিয়ে সেটাকে বেঁধে দিল।

'গতিক সুবিধের নয় রে ভাই,' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ জড়ানো হাতটার দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন।

'ও কিছু না, সেরে যাবে!' কোস্তিয়া যতটা সম্ভব দৃঢ়তা ও উৎফুল্ল ভাব কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল।

'আমি হাতের কথা বলছি না, হাত সেরে যাবে... বয়ার আলো নিভে গেছে। 'শয়তানের দাঁতের' কাছাকাছি, ডুবো পাহাড়ের ওপরকার... বাতাস হতে পারে, কিংবা ঐ গুঁড়িগুলোই হবে... বয়া দাঁড়িয়ে আছে গভীর স্রোতের ওপর — গুঁড়িগুলো খুব সম্ভব তার গায়ে মোক্ষম ঘা মেরেছে। এমনও হতে পারে যে বয়া জায়গা থেকে আলগা হয়ে ছুটে গেছে...'

'তাহলে ত দরকার...' কোস্তিয়া তার মুখের কথা শেষ করার অবকাশ পেল না।

অবশ্যই দরকার আলো জ্বালানোর, কিন্তু কী করে? এমন ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে লগি পর্যন্ত চোখে পড়ে না, বয়া ত দূরের কথা! আর বয়া যদি একেবারেই না থেকে থাকে তাহলে? তাহলে কী উপায়? বয়ার জায়গাটা পর্যন্ত পেঁাছুনোরই বা উপায় কী? মামা এক হাতে দাঁড় বাইতে পারবেন না, আর কোস্তিয়া... তার মনে পড়ে গেল জল টগবগ করে ফেনিয়ে উঠছে, তীরের ওপর আছড়ে পড়ছে ক্ষিপ্ত তরঙ্গরাশি — একথা মনে হতেই তার ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, যেন তরঙ্গরাশির ভেতরে পড়ার অভিজ্ঞতা তার ইতিমধ্যেই আছে।

'আর যদি ছুটে গাঁয়ে গিয়ে কাউকে ডেকে আনা যায়?'

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ জানলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন — জানলার গায়ে তখন ঘা মেরে চলেছে বৃষ্টির ধারা — কখনও ঘোলাটে সাদা সাদা, কখনও বা বিদ্যুতের ঝলকে নীল নীল।

'না,' তিনি বললেন, 'এখন খাদের ভেতর দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর পাশ কাটিয়ে যেতে গেলে অনেক দূর পড়ে যাবে, সময় নেই...' তিনি পকেট থেকে ঘড়ি বার করলেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সশব্দে খুট করে ডালা বন্ধ করে বললেন, 'তিন ঘণ্টা বাদে খের্সনে একটা এক্সপ্রেস স্টীমার যাবার কথা।'

'কিন্তু এমন আবহাওয়ায় কি আর...'

'যাবে কি না যাবে সে ক্যাপ্টেনই জানে। ক্যাপ্টেন ত আর আমাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে না। আমার কাজ হল বয়ার ওপরে যাতে বাতি থাকে তা দেখা... কিন্তু বাতি ছাই গেছে নিভে!..' বলতে বলতে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের গালের মাংসপেশী তিরতির করে কাঁপতে থাকে, ক্রোধে উত্তেজনায় তার গালের দু'পাশে ফুটে ওঠে ঢিবি।

এই ভাবে একজন ছোট আরেকজন বড় বসে থাকে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বারিধারার প্রবল আছড়ানি আর মনে মনে ভাবে একটাই কথা। জলের রাশি ছিটিয়ে ছুটে চলেছে ধারা, আর তারই মধ্যে কোস্তিয়া দেখতে পাচ্ছে এক বিশাল সাদা স্টীমার সন্তর্পণে যেন হাতড়াতে হাতড়াতে চলেছে বিক্ষুব্ধ নদীর ওপর দিয়ে। যাত্রীরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, এদিকে জাহাজীদের গোটা দলটি এক দৃষ্টিতে বৃষ্টির একসা করে দেওয়া সাদাটে অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে বয়া। আলো দেখা যাচ্ছে না, তার মানে স্টীমার ইতিমধ্যে অজানতেই বয়ার জায়গাটা পার হয়ে গেছে। সকলে

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, চৌকির অফিসার তামার নলের ভেতর দিয়ে কম্যান্ড দেন ইঞ্জিনের বেগ বাড়াতে। স্টীমার সামান্য ঝাঁকুনি খেয়ে গতিবেগ বৃদ্ধি করে, এমন সময় ঝনঝন গমগম শব্দে সবকিছু চুরমার হয়ে উড়ে আসে ডেক-এর ওপর, তলা ছেঁদা হয়ে গিয়ে তার ভেতরে ঢুকে পড়ে সবুজরঙধরা পিছলেটে পাথরের চাঁইটা, গলগল করে জল ঢুকে পড়ছে, থামানোর কোন উপায় নেই, সেঁচে বার করাও যায় না। আলো নিভে যায়, খাট থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয় যাত্রীরা, তারপর শুরু হয়ে যায় এমনই ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে মনে হতেই কোস্তিয়া আর একটু হলেই জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠে ছুটে যায় কোথাও গিয়ে সাহায্যের জন্য লোকজন ডাকার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু দৌড়ে যাবে কোথায় ? চিৎকার কেউ শুনতে পাবে না। কোস্তিয়া যত বেশি করে তা বুঝতে পারে ততই ভয়ঙ্কর লাগতে থাকে তার, সে আরও ঘন ঘন তাকাতে থাকে মামার দিকে। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ একই ভাবে তাকিয়ে থাকেন জানলার দিকে। তাঁর কপালের এবং ঠোঁটের কাছের কুঞ্চন হতে থাকে আরও গভীর, আরও তীক্ষ্ণ। তিনি সামান্য উঠে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে টেবিল থেকে বাঁ হাত ওঠালেন।

'তোর সাহায্য নিতে হবে কোস্তিয়া,' এই বলে তিনি ভয়ে তাকালেন কোস্তিয়ার মুখের দিকে।

'তা আর বলতে! অবশ্যই!' কোস্তিয়া বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে লাফিয়ে উঠল।

ভাঁড়ার ঘর থেকে তারা নিয়ে এলো দুটো লাল বাতি, তেল ভরে জ্বালালো।

'একটু গরম দেখে জামাকাপড় পড়ে নে।'

'আরে, হিমে জমে যাব না আমি...' কোস্তিয়া আপত্তি করে বলতে যায়, কিন্তু মামার কঠিন দৃষ্টির সামনে পড়ে গিয়ে চুপ করে যায়, বিনা বাক্যব্যয়ে প্যাণ্ট আর কোর্তা পরে।

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ কোস্তিয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন ক্যাম্বিশের কাপড় মুড়ে সেলাই করা কর্ক বেল্ট, কোস্তিয়া সেটা তার বুকের ওপর বেঁধে নিল। বেল্টটা তার পক্ষে বড়, কর্কের ধারগুলো উঁচু হয়ে কোস্তিয়ার বগলে লাগছে, ফলে তাকে দু'হাত অনেকখানি তফাত করে রাখতে হচ্ছে। মামা এক বাণ্ডিল মোটা দড়ি নিলেন, দড়িটার শেষে আছে ফাঁস, আর নিলেন একটু সরু দেখে দড়ি। কোস্তিয়া লণ্ঠনদুটো তুলে নিল, তারা দু'জনে মুষলধার দমকা বর্ষণের শন্‌শন্‌ চাবুক অগ্রাহ্য করে চলল নদীর দিকে।

নৌকোর এক-তৃতীয়াংশ জলে ভরে গেছে, তা সত্ত্বেও নৌকোটা পাক খাচ্ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠছে। কোস্তিয়া সেঁউতি দিয়ে জল সেঁচে সেঁচে বাইরে ফেলতে লাগল, মামা নৌকোর গলুইয়ের ওপর লণ্ঠন বসিয়ে বেঁধে দিলেন, দাঁড়ীর বসার আসনের তক্তার নীচে আঁকশি রাখলেন।

'আমি গুণ টানব, আর তুই হাল ধরে থাকবি। পাড় থেকে মিটার দেড়েক দূরে দূরে চালাতে হবে, পাড়ের গায়ে ধাক্কা না খেলেই হল! পারবি ত?'

'খুব পারব।'

'ভয় পাচ্ছিস না ত?'

'ভয় পাবার কী আছে?'

কোস্তিয়াকে মামা সরু দড়িটা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলেন, দড়ির প্রান্ত নিজের কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকে নিলেন। মোটা দড়িটা তিনি কোস্তিয়ার সাহায্যে নৌকোর সামনের গলুইয়ের কড়ার সঙ্গে বাঁধলেন, ফাঁসটা কাঁধ দিয়ে গলিয়ে নিজে পড়লেন।

'তাহলে কোস্তিয়া, এবারে সামাল!' উদ্বিগ্ন হয়ে কঠিন স্বরে বললেন এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ।

'ঠিক আছে, এ আর এমন কি...'

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নৌকোর মাথাটা ছেড়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা হিড়হিড় করে টানতে টানতে এনে ফেলল ঢেউ আর ধারাবর্ষণের কোলাহলপূর্ণ ঠেলাঠেলির মধ্যে। কোস্তিয়ার এতক্ষণের সমস্ত সাহস এক নিমেষে উড়ে গেল। দাঁড়ীর আসন আঁকড়ে ধরে সে আতঙ্কিত হয়ে দেখতে থাকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তার মামা, নদীর তীর, এখন থাকার মধ্যে থাকছে কেবল ভিজে, পিছলে নৌকোটা, আর তাকে ঘা মারছে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে তরঙ্গরাশি। সে বুঝতে পারছে যে মামা ধারেকাছেই কোথাও আছেন, এও বুঝতে পারছে যে দাঁড় হাতে নিয়ে যাওয়া দরকার, অথচ কোনমতেই আসনের তক্তা থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে পারছে না — তার মনে হচ্ছে এক্ষুনি বুঝি তাকে এক ফুঁয়ে ঝাড়া দিয়ে টলমল পাছগলুই থেকে ঝপাং করে ফেলে দেবে ঠাণ্ডা কালো জলের মধ্যে।

'তৈরি?' বর্ষণমুখর অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো কণ্ঠস্বর।

কোস্তিয়া তক্তা থেকে হাত উঠিয়ে নিয়ে দাঁড় ধরে বলল:

'তৈরি!'

নৌকো নড়েচড়ে উঠল, তার নাকটা এদিক ওদিক নাড়াতে শুরু করল, ওঁচানো নাকটার নীচে ঢেউ যেমন প্রবল ঘা মারতে শুরু করেছে তা থেকে কোস্তিয়া আন্দাজ করতে পারল যে নৌকো চলেছে স্রোতের বিপরীত মুখে।

কড়কড় আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ফুটে উঠছে বিদ্যুল্লেখা আর বৃষ্টির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে মামার নুয়ে পড়া মূর্তিটা। মামা খুবই কাছাকাছি আছেন, বিশ মিটার খানেক দূরে, একথা মনে হতে কোস্তিয়া পুরোপুরি ধাতস্থ হয়ে আসে। বিপদ-আপদ কিছু ঘটলে যে কোন মুহূর্তে নৌকোর মোড় তিনি ঘুরিয়ে দিতে পারেন, নৌকো তখন মুখ থুবড়ে পড়বে নদীতীরে। তাছাড়া যে দড়ি দিয়ে কোস্তিয়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে তার একটা প্রান্ত আছে মামার বেল্টের সঙ্গে আটকানো। অবশ্য দড়ি না থাকলেও হত — লাইফ বেল্ট তায় আবার

দড়ি... এটা স্রেফ অতিরিক্ত নিরাপত্তা। কিন্তু দমকা বাতাসে নৌকো যেই অস্বাভাবিক রকম টলমল করতে থাকে তক্ষুনি কোস্তিয়া দাঁড় হাতে নিয়েই কনুইটা শরীরের পাশে ঠেকায়, তার কোমরে বাঁধা দড়িটা ঠিক আছে কিনা স্পর্শ করে দেখে। এই ভাবে বেশ কিছু সময় কেটে যায়। কোস্তিয়া জানে না কতটা সময়, তা ভাবার মতো অবকাশও তার নেই। দেখা যাচ্ছে গুণ টেনে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। ইতিমধ্যে নৌকো দু'বার তীরের কাছাকাছি চলে এসেছিল, মামা এসে কোন কথা না বলে ঠেলে সরিয়ে দেন। বৃষ্টির বেগ কমে এসেছে, ধারাবর্ষণের ঝিরিঝিরি পর্দার ভেতর দিয়ে এখন অস্পষ্টভাবে তীরভূমি চেনা যায়। কোস্তিয়া এখন এমন নিবিষ্ট মনে তীরের ওপরে দৃষ্টি রেখে দাঁড় টানতে থাকে যে ভয়ডরের কথা বেমালুম ভুলে যায়, ভয় উধাও হয়ে যায় তার মন থেকে।

নৌকো আচমকা মোড় নিয়ে তীরে এসে ঠেকে।

'ব্যস, নেমে পড়!' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বললেন।

'কিন্তু আপনি? আপনি একা কী করে...' কোস্তিয়া অনুনয়-বিনয় করে, প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু মামা কোন কথা বলেন না, ফলে তাকে তীরে নেমে পড়তে হয়।

মামা কোস্তিয়াকে নিজের বর্ষাতি আর দড়ি দিলেন, আঁকশিটা নিজের কাছাকাছি রেখে দাঁড় ধরলেন। বললেন:

'ঠেলে দে। এবারে বাড়ি চলে যা।'

ভিজে এঁটেল মাটিতে পা হড়কাতে হড়কাতে কোস্তিয়া নৌকো ঠেলে দিল। সে দেখতে পেল হালের বৈঠার হাতলের ওপর বাঁ হাতের কনুই ভর দিয়ে মামা পূর্ণোদ্যমে ডান হাতে দাঁড় টানতে লাগলেন, নৌকো মোড় নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল, দেখতে দেখতে না মামা, না নৌকো কাউকেই আর চোখে পড়ল না, কেবল অন্ধকারের মধ্যে নৌকোয় বাঁধা লণ্ঠনদুটোর লাল আলো বিপজ্জনকভাবে নাচছে।

ভিজে কোর্তার ভেতর দিয়ে বাতাস ঢুকে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে, প্যাণ্ট পায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে, কোস্তিয়ার ঠাণ্ডা লাগলেও সে কিন্তু চলে যায় না, আলোর দিকে লক্ষ রাখে আর মনে মনে ভাবতে থাকে বয়াটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা কে জানে। মামা সেই দিকে চলেছেন স্রোতের ওপর ভরসা করে, যে স্রোত নৌকো বয়ে নিয়ে যাবে ডুবো পাহাড়ের দিকে। কিন্তু ঐ জায়গাটা মামা ঠিক ধরতে পারবেন কি? দিনের বেলা হলে না হয় কথা ছিল, তখন তীরভূমি চোখে পড়ে, চোখে পড়ে বয়াগুলি, আর তা থেকে দিক ঠিক করা যায়। এখন ওখানে বিক্ষুব্ধ ফেনায়িত জলরাশি ছাড়া আর কিছুই নেই।

আলো দ্রুত দূরে সরে যায়, দেখতে দেখতে দুটো আলো একসঙ্গে মিশে যায়, পরে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কোস্তিয়া একছুটে গিয়ে উঠে পড়ে একটা ঢিবির উপরে — আলো ফের দেখা যায়, দুলতে থাকে, সম্ভবত বাতাসের ফুঁয়ে, তারপর দ্রুত চলতে থাকে ডান দিকে, স্রোতের

মুখে। কোস্তিয়া হোঁচট খেতে খেতে তীর ধরে ছুটতে থাকে, এঁটেল মাটিতে তার পা পিছলে যায়, সে পড়ে আছাড় খায় কিন্তু কোন ব্যথাযন্ত্রণা অনুভব করে না, তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, ছুটতে থাকে সামনের দিকে, তার ভয় হয় পাছে ঢেউয়ের মাথায় নৃত্যরত আলোটা হারিয়ে ফেলে। আলোটা ক্রমেই তীরের কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসতে থাকে, দেখতে দেখতে হঠাৎই নৌকোটা এসে পড়ল একেবারে কাছে, তীরে এসে লাগল। কোস্তিয়া নৌকোর সামনের গলুইয়ে বাঁধা দড়িটা ধরে টেনে নৌকো টেনে রাখে যাতে ঢেউয়ে ভেসে না যায়।

মাঝখানের তক্তাটার ওপর এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বসে আছেন মাথায় হাত দিয়ে। ঢেউয়ের কল্লোল ভেদ করেও কোস্তিয়া যেন শুনতে পেল তার ভারী, ভাঙা ভাঙা দীর্ঘশ্বাস। নিশ্বাস নিয়ে মামা উঠে দাঁড়ালেন, কোস্তিয়াকে দেখতে পেয়ে বললেন:

'না, বয়া নেই, কিংবা এমনও হতে পারে যে আমি খুঁজে পেলাম না — কী জানি ছাই... তুই থেকে গিয়ে ভালোই করছিস। ফের উজান ঠেলে নৌকো চালাতে হবে।'

কোস্তিয়া আবার দাঁড় উঠিয়ে নিয়ে নৌকোর পাছগলুইয়ে গিয়ে বসল, মামা গুণ টানতে লাগলেন, ফের তারা নৌকো তীর বরাবর চালিয়ে নিয়ে গেল সেই জায়গাটার দিকে, যেখান থেকে, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের হিসাবমতো, স্রোতে নৌকো টেনে নিয়ে যাবে 'শয়তানের দাঁতের' বয়ার ওপরে। বৃষ্টি নেই, বাতাস খানিকটা পড়ে এসেছে, কেবল ঢেউ আগের মতোই নৌকো নাড়া দিচ্ছে, ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে দিচ্ছে, কিন্তু কোস্তিয়া এখন আর ভয় পায় না। আসলে কালো বিক্ষুব্ধ জলরাশির কথা, গভীরতা ও বিপদের কথা ভাবারই অবকাশ নেই তার — সে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলে এমন ভাবে নৌকো চালাতে যাতে মামার পক্ষে কাজ সহজ হয়, থেমে থেমে চলতে হয় না তাঁকে। আগের মতোই কড়কড় শব্দে বাজ পড়ে, আকাশের প্রান্ত ঘিরে ফুটে উঠছে বিদ্যুৎশিখা, আলোকিত করে তুলছে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচকে। তিনি চলেছেন শ্রান্ত পদক্ষেপে।

অবশেষে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নৌকোটাকে তীরের দিকে টেনে আনেন, তার মাথার ওপরটায় বসে পড়ে হাঁপ ছাড়তে থাকেন। কোস্তিয়া এগিয়ে এলো, নিবিড় হয়ে তাঁর গা ঘেঁষে বসল, মনে মনে কোন আশাভরসা না থাকলেও সে মরিয়া হয়ে উত্তেজিত স্বরে মামাকে বোঝাতে শুরু করল:

'মামা, আমাকে সঙ্গে নিন... আপনার যে অসুবিধে হচ্ছে! এক হাতে কি আর পারা যায়?.. আমি সাহায্য করব... একটু হলেও সাহায্য ত করতে পারব। ভাবছেন আমি ভয় পাচ্ছি? আমি কিন্তু এতটুকুও ভয় পাই না! আপনাকে যে দাঁড় বাইতে হবে আবার নজরও রাখতে হবে... আমরা একসঙ্গে মিলে খুঁজে বার করব! কী বলেন এফিম মামা?.. আমাকে নিন, অ্যাঁ?'

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ জবাবে কিছু না বলে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানান। কোস্তিয়া আরও উত্তেজিত হয়ে তাঁকে রাজী করানোর চেষ্টা করে:

'আপনি ভাবছেন আমি ভয় পাব? কিন্তু এখানে একা একা আমার যে আরও বেশি ভয় করে! আপনার সঙ্গে থাকলে আমার কোন ভয় নেই... তাছাড়া এক হাতে আপনি পারবেনই

বা কী করে ? আবার খুঁজে পাবেন না, অথচ স্টীমার আসার সময় হয়ে এলো বলে... অ্যাঁ, মামা ? আমার যে এখন গায়ে অনেক জোর হয়েছে, আমি এখন বেশ বাইতে পারি...'

'কিন্তু তোর মা আমাদের কী বলবেন ?'

মা ? কথাটা মনে হতে কোস্তিয়া চোখমুখ পর্যন্ত কোঁচকাল। তা বটে, মা যদি জানতে পারেন !.. এ তোমার লিওল্‌কার মাথার ফিতে ধরে টানা নয়, হাত না ধুয়ে টেবিলে খেতে বসা নয়...

'কিন্তু মা আর জানছেন কোত্থেকে ?' কোস্তিয়া উপায় খুঁজে বার করে।

'না, মিছে আমি বলতে যাব না,' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ জবাবে বললেন। তারপর অনেকক্ষণ ভাবনাচিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে... সময় কম, তাছাড়া এক হাত নিয়ে আমি ফের ভুলভাল করে ফেলতে পারি।'

কোস্তিয়া দাঁড়ের জায়গায় গিয়ে বসল, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ হালের বৈঠা দিয়ে নৌকো ঠেলে দিল। নৌকো স্রোতের মুখে পড়ে এপাশ-ওপাশ, এমুড়ো ওমুড়ো থরথর করে ঝাঁকুনি গেল।

একমাত্র তখনই কোস্তিয়া বুঝতে পারল কী কাজের দায়িত্ব সে যেচে নিয়েছে। এ মোটেই স্থির, নির্মল আবহাওয়ার সময় শান্ত নদীর বুকে দাঁড় বাওয়া নয়। দাঁড়ে টান পড়ছে, ঢেউ এসে ঘা মারছে, কখনও এলোপাতাড়ি দাঁড় পড়ছে, কখনও বা গভীর জলে গিয়ে পড়ছে, হাতল পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে, আর ভিজে হাতলগুলো হাতের মুঠোয় পিছলে যাচ্ছে, ছটফট করছে জ্যান্ত প্রাণীর মতো, কোস্তিয়ার বুকে, হাঁটুতে এসে ঘা মারার চেষ্টা করছে, কোস্তিয়াকে তক্তার আসন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুক্তিলাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কোস্তিয়া দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলল, কিন্তু দেখতে দেখতে শক্তি তার কমে আসে, সে হাঁপাতে শুরু করল, এদিকে তরঙ্গমালা ক্রমেই বিশাল আকার ধারণ করতে থাকে, দাঁড় হাত থেকে ফসকে পড়ার জন্য আরও জেদ ধরে।

এদিকে নীচের কোথা থেকে যেন এসে কোস্তিয়ার সর্বাঙ্গ বয়ে চলল এক নিদারুণ, অপ্রতিরোধ্য আতঙ্কের হিমশীতল ঢেউ, যার ফলে কোস্তিয়ার নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, আড়ষ্ট হয়ে আসে তার সর্ব শরীর। এমন হলে ত তারা কিছুই খুঁজে পাবে না, কিছু করতেও পারবে না ! ঢেউয়ের শক্তি অনেক বেশি, হাত থেকে দাঁড় ছিনিয়ে নেবে এই ঢেউ, তাদের নৌকো জলে প্লাবিত করে দেবে, উলটে দেবে, তাদের — কোস্তিয়াকে আর তার মামাকে এদিক-ওদিক ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, জলধারার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে 'শয়তানের দাঁতের' দিকে, প্রবল ঝাপটায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে ডুবো পাহাড়ের গায়ে, জলপ্লাবনে ঠুকে মারবে পাকদহের ভেতরে... সময় থাকতে থাকতে তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এই ক্রূর জলরাশির ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসা উচিত। কোস্তিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জলের গায়ে আরও ঘনঘন, দ্রুত ঘা মারতে থাকে।

'একটু আস্তে কোস্তিয়া! সামলে!' ছলছল ও সোঁসোঁ আওয়াজ ভেদ করে ভেসে এলো এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের কণ্ঠস্বর।

একটা প্রচণ্ড ক্রোধ ও জ্বালাধরানো লজ্জা কোস্তিয়ার ওপর এসে ভর করল। সত্যিকারের নাবিকরা তাহলে ঝড়ের সময় কী করে? কেমন নাবিক সে হবে...

'ভীতু! ভীতু!' সে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেই বলে নিজেকে, ক্রোধে তার দু'গাল বয়ে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে বয়ে চলল অশ্রুর ধারা।

এই অশ্রুবর্ষণের ফলে আড়ষ্টতা কেটে গেল, কোস্তিয়া দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে ঝপাঝপ দাঁড় ফেলতে শুরু করল; দাঁড় আর তেমন দ্রুত ও এলোপাতাড়ি জলের ওপর এসে পড়ে না, হাত থেকে এখন আর সেরকম ছিটকেও পড়ছে না। নিজের কাজে সে এতখানি ডুবে গিয়েছিল যে কোথায় এবং কতটা তারা চলে এসেছে তাও সে দেখতে পায় নি, দেরিতে সে লক্ষ করতে পারল যে পাশের দুলুনি বন্ধ হয়ে গেছে, ঢেউ এসে এখন আঘাত করছে নৌকোর মুখে। কোস্তিয়া অনুমান করতে পারল যে মামা নৌকো ঘুরিয়ে নিয়েছেন স্রোতের বিপরীত দিকে।

'জোরে জোরে দাঁড় টান!' শোনা গেল এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের গলা।

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ কোস্তিয়ার দিকে পিছন ফিরে পাছগলুইয়ে সামান্য উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষণিক বিদ্যুতের আলোয় নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকেন ভয়ংকর, বিক্ষুব্ধ নদী। কোস্তিয়া সর্বশক্তিতে দাঁড় ধরে ঝুলে পড়ে ঝপাঝপ দাঁড় ফেলতে থাকে। যেখানে যাওয়া দরকার সেখানে নিয়ে গেলেই হল, বয়াটা ছাড়িয়ে না গেলেই হল! দ্বিতীয়বার নৌকো চালিয়ে আসার মতো সাধ্য কোস্তিয়ার আর হবে না।

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন:

'চালা! আর জোরে চালা!'

তাঁর কণ্ঠস্বরটা কোস্তিয়ার কানে এবারে রূঢ় ঠেকল। এদিকে তিনি নিজেও প্রাণপণে হালের বৈঠা দিয়ে নৌকোর ডান পাশ থেকে জল তোলপাড় করে ঠেলে দিচ্ছেন বাঁ দিকে। কোস্তিয়া বসার তক্তার ওপর সামান্য উঠে দাঁড় হাতে প্রায় শুয়ে পড়ে কখনও সামনে কখনও বা পেছনে, শুনতে পায় তার ঠিক কানের কাছে কে যেন ভাঙা ভাঙা, বুক-ফাটা শ্বাস ফেলেছে, সে বুঝতে পারে না যে শিস দিয়ে এমন ভারী ভারী নিশ্বাস ফেলছে সে নিজেই। মামা হাতের দাঁড় ফেলে দিয়ে আঁকশি তুলে নিয়ে সেটাকে বাঁ দিকে জলের ভেতরে ঝপাং করে ফেললেন।

'দাঁড় ফেলে দে!'

কোস্তিয়া দাঁড় ওপরে তুলল, নৌকোও ঢেউয়ের ধাক্কায় একপাশে কাত হয়ে পড়ল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাক ঘুরিয়ে দিল স্রোতের মুখে, তবে বেসামাল হয়ে ছুটে যেতে পারে না।

'পেয়েছেন ? পেয়েছেন বয়াটা ?' হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে বলল কোস্তিয়া।

'নোঙ্গরে আঙটাটা দে ! আঁকশিটা ধরে রাখ !' উত্তরে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ নির্দেশ দিলেন।

কোস্তিয়া আঁকশির হাতল চেপে ধরল, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচও বাঁ হাতের কনুইয়ে চাপ দিয়ে ওটাকে চেপে ধরে রাখেন, আর ডান হাতে নোঙ্গরের আঙটা ফেলেন। নোঙ্গর ঠিক জায়গায় পড়ল না, উঠিয়ে ফের ছোঁড়েন। এবারে নোঙ্গর কিসের সঙ্গে যেন গিয়ে আটকাল। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ আঁকশি ছেড়ে দিলেন, নোঙ্গরের দড়ি বাঁধলেন নৌকোর আঙটার সঙ্গে, তারপর আঁকশির হাতল বেঁধে দিলেন। জামার আস্তিনে ভিজে মুখ মুছে নিয়ে কোস্তিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ অক্ষত হাতটা দিয়ে কোস্তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন:

'বা: কোস্তিয়া ! এই ত চাই !'

আনন্দে কোস্তিয়ার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম, কিন্তু নিদারুণ আতঙ্কে সে কী ভাবে জলে এলোপাতাড়ি দাঁড় ফেলে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে একথা মনে পড়ে যেতে ফের বিহ্বলতার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

'আরে না, না আমি... আমি আর কীই বা...' লজ্জা পেয়ে বিড়বিড় করে বলল সে।

'না, এরকম কাজের জন্য আমাদের মেডেল পাবার কথা...' হাসতে হাসতে বললেন এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ।

কোস্তিয়ারও মনে মনে আনন্দ লাগল, হাসিও পেল তার। কিন্তু না, এমন ঝড়বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে, ক্ষিপ্ত, গর্জনশীল নদীর বুকে একটা বয়ার ওপরকার কাঠের ছোট্ট ত্রিকোণ খুঁজে পেয়ে তার গায়ে নৌকো ভিড়ানো মোটেই ঠাট্টার ব্যাপার নয়। মামা আর কোস্তিয়া আনন্দে ও হাসিতে এমন মেতে ওঠে যে তারা খেয়ালই করতে পারে নি কখন ফের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, কখনই বা বইতে শুরু করে দিয়েছে কনকনে বাতাস। বাতাস কিন্তু উত্তরোত্তর জোরাল হতে থাকে, বৃষ্টির সাদা সাদা ছাঁটগুলিকে তেরছা করে দেয়, নৌকোয় বসে থাকা দুটি মানুষের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

'বয়া গেল কোথায় ?' হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল কোস্তিয়া।

'মজাটা ত সেখানেই !' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ বললেন। 'বয়া নেই, ভেঙে গেছে। কাঠের ক্রসটা শুধু টিকে আছে। কী ভাবে যে ওটা দেখতে পেলাম, আমি নিজেই জানি না।'

'তাহলে ?.. এখন কোথায় তাহলে লণ্ঠন লাগাতে হবে ?'

'কোথাও নয়। বয়ার জায়গায় আমাদের নিজেদেরই থাকতে হবে এখন... তুই বোধ হয় ঠাণ্ডায় জমে গেছিস ?'

'ন্-না,' কোস্তিয়া বলল, কেবল এখনই সে অনুভব করল যে সত্যিসত্যিই বড় ঠাণ্ডা লাগছে তার।

মামা তার কোর্তার বোতাম খুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কোস্তিয়াকে। কোস্তিয়ার মতো তিনিও ভিজে সপসপে হয়ে গেছেন বটে, কিন্তু তার বিশাল, শক্তিশালী শরীর থেকে উষ্ণতা এসে অল্প অল্প করে কোস্তিয়াকে গরম করছে।

দাঁড়ের আঘাতে আলোড়িত তরঙ্গরাশি আর বাতাসের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামের তীব্র আকর্ষণ এতক্ষণ যে আতঙ্ককে ঠেকিয়ে রেখেছিল এখন তা কাটিয়ে ওঠার পর, যখন বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই, তখন নৌকোয় দুলুনি তোলা এই ঢেউগুলি তার ফের মনে হতে থাকে ভয়ঙ্কর আর দমকা বাতাস যেন অলক্ষণসূচক। নৌকোর দুই কিনারার ওপর থেকে ভেতরে ছলকে পড়ছে ঢেউ, ঝরঝর ধারে ঝরছে বৃষ্টি, নৌকোর ভেতরকার ঝাঁঝরির ওপরে বয়ে চলেছে ছোট ছোট ঢেউ। কোস্তিয়া জল সেঁচে তোলে, ফের গিয়ে বসে মামার গা ঘেঁষে, তার পাশে থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করা যায়।

'পাইপটা টানতে পারলে মন্দ হত না,' মামা বললেন।

কিন্তু ধূমপানের কোন উপায় নেই, দেশলাই জলে ভিজে গেছে, তামাক পিছলে, চটচটে তাল পাকিয়ে গেছে। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ খালি পাইপটা টানতে থাকেন, আর কোস্তিয়া যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে বসার চেষ্টা করে — দমকা হাওয়ার মধ্যে ভিজে অবস্থায় বসে থাকাটা গরমের দিনে চোখ ঝলসানো বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে আসার মতো মজার ও তৃপ্তিদায়ক মোটেই নয়।

এই ভাবে বসে বসে অপেক্ষা করতে করতে তাদের কেটে যায় এক ঘণ্টা, তারপর আরও এক ঘণ্টা। বৃষ্টি থেমে যায়, বাতাসও অল্প অল্প করে পড়ে আসে, তা সত্ত্বেও ঢেউগুলি কিন্তু আগের মতোই ক্ষিপ্ত, ঐ একই রকম গভীর আঁধার বিরাজ করছে চারপাশে। স্টীমার চলার নির্ধারিত সময় অনেক আগে পেরিয়ে গেছে — স্টীমারের দেখা নেই, কিন্তু তারা বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকে: 'শয়তানের দাঁতকে' বিনা প্রহরায় অমনি অমনি ফেলে রাখা যায় না। যত বেশিক্ষণ তারা বসে থাকে ততই বেশি করে কোস্তিয়ার কাছে স্পষ্ট হতে থাকে যে নদী পারাপার করা নয়, বয়া খোঁজাখুঁজি করা নয়, সবচেয়ে কঠিন কাজ হল এই ঠাণ্ডা ভিজে জায়গায় একঠায় প্রতীক্ষা করে থাকা। কিন্তু যতই দুঃসহ হোক না কেন অপেক্ষা করা উচিত। ওরা বসে বসে অপেক্ষা করে।

কোস্তিয়া মনে মনে সর্বতোভাবে কল্পনা করছিল সামনে ঢেউ তাড়াতে তাড়াতে, নদীর বুকে আলো আর সঙ্গীতের বন্যা ঝরাতে ঝরাতে পাশ কাটিয়ে চলেছে তুষারশুভ্র স্টীমার, আর তারা — কোস্তিয়া ও তার মামা, স্টীমারটাকে লণ্ঠন তুলে পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু ঘটনাটা দাঁড়াল সম্পূর্ণ অন্য রকম।

সামনের উজানের দিক থেকে ভেসে এলো একটা দীর্ঘ মৃদু গুঞ্জন। দ্বীপের আড়াল থেকে দেখা গেল ফটফটে আগুনের একটা উঁচু শিখা, যেন একটা চোখ তুরপুন দিয়ে ছ্যাঁদা করে চলেছে অন্ধকার, তারপর অনেকখানি ব্যবধানে সবুজ আর লাল আলো, মাঝখানে ধূসর রঙের একটা স্তূপ — চোখে পড়ে কি পড়ে না। সেটা চলে আসছে সোজা তাদেরই দিকে। কোস্তিয়া কাঁপতে কাঁপতে বসার তক্তা আঁকড়ে ধরে, আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন এই বিশাল স্তূপটা খচমচ শব্দে পিষে দুমড়ে মুচড়ে ফেলবে তাদের নৌকোটা। মামা লাল আলোর লণ্ঠন তুলে ধরেন, হাত বাড়িয়ে ধরে থাকেন।

মুহূর্তের জন্য কোস্তিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তার মনে হল স্টীমারটা যেন সরাসরি তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করল — এমনই চোখ ধাঁধানো আলোর রাশি এসে পড়ল জলের বুকে আর নৌকোর ওপরে। সার্চলাইট নিভে গেল, মিনিট খানেকের জন্য কোস্তিয়া আশেপাশের কিছুই ঠাহর করতে পারে না, তারপর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে সে দেখতে পেল কেবল পাশের সবুজ আলো আর মাথার ওপরকার সাদা আলোটা। ধূসর রঙের স্তূপটা এগিয়ে আসছে, কিন্তু এখন নৌকো ডান পাশে রেখে বাঁয়ে মোড় নিচ্ছে। মঞ্চের রেলিং-এর গায়ে ঝুঁকে পড়ল একটি মানুষের মূর্তি, চোঙ্গের ভেতর দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল:

'কী হল, বয়া ছুটে গেছে বুঝি ?'

'ভেলা কিংবা আঙটা ভেঙে গেছে ! ও কিছু নয় ! সব ঠিক আছে !' জবাব দিলেন এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ।

মূর্তিটা এবারে সোজা হয়ে দাঁড়াল, ধূসর রঙের স্তূপটা ইঞ্জিনের জোরাল গুঞ্জন তুলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, দেখতে দেখতে কেবল অপসৃয়মাণ আলো আর ঢেউয়ের বুকে নৌকোর ঘন ঘন ওঠাপড়া এই সাক্ষ্য দিতে লাগল যে স্টীমারটা কোন চোখের ভুল ছিল না, সত্যিসত্যিই বেরিয়ে গেছে তাদের পাশ দিয়ে।

কোস্তিয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল স্টীমারে যারা যাচ্ছিল তাদের সকলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে তারা দু'জনে, সে আর এফিম মামা কী কাজ করেছে, কী অসাধারণ বীরপুরুষ তারা। সে আগে থাকতে মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিল রেলিং-এর ধারে ভীতসন্ত্রস্ত, সচকিত যাত্রীদের হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে, তারা সকলে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে সেই জায়গাটা, যেখানে ডুবো পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঢেউ, আর কোস্তিয়াকে — পুলকে ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে। কিন্তু যাত্রীরা অসন্দিগ্ধ মনে, শান্তভাবে নিদ্রা যাচ্ছে, আর মঞ্চে ডিউটিরত লোকটা কোস্তিয়াকে হয়ত লক্ষই করল না।

প্রত্যূষের পাণ্ডুরবর্ণের আলো-অন্ধকার আকাশের সীমানাকে ঈষৎ উন্নত করে তুলছে, ব্যাপ্ত করছে দৃষ্টির পরিধি। এখনই অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আলাদা আলাদা করে চেনা যাচ্ছে

তীরভূমি, দ্বীপ। এখন ডুবো পাহাড়কে ছেড়ে যাওয়া যায়, শিগ্গিরই ফরসা হয়ে আসবে, তখন আর ওটা তেমন বিপজ্জনক হবে না।

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ লণ্ঠন নিভিয়ে দিলেন, আঁকশি আর নঙ্গরটা খুলে নিলেন। নৌকো স্রোতের টানে চলতে থাকে। ফিরতি পথে কোস্তিয়া বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে, নিশ্চিন্তমনে নৌকো বায়: আলোতে ভয়ংকরকেও ভয়ংকর বলে মনে হয় না।

বাড়িতে এসে এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ প্রথমেই উনুন জ্বালালেন, কেটলি চাপালেন, তারপর বার করলেন সিকি পাঁইটের একটা ভোদ্‌কার বোতল।

'জামাকাপড় খোল!' তিনি আদেশ দিলেন।

'কিন্তু আমি... আমি... আমি যে... এখন আর আমার ঠাণ্ডা লাগছে না। আমার সওয়া হয়ে গেছে,' প্রতিবাদ করে বলল কোস্তিয়া।

'সওয়া যখন হয়ে গেছে তাহলে ত আর কথাই নেই, বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। খোল জামাকাপড়!'

কোস্তিয়া জামাকাপড় খুলে ফেলল। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ হাতের ওপর ভোদ্‌কা ঢাললেন। তিনি কোস্তিয়ার গা মালিশ করতে থাকেন। হাত তাঁর খরখরে — কোস্তিয়ার চামড়া সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠতে থাকে, জ্বলতে শুরু করে, যেন গরম জলের ভাপে ফোস্‌কা পড়ছে।

"হয়েছে! হয়েছে এফিম মামা, আমার এখন গরম লাগছে!' কোস্তিয়া মিনতি করে।

কিন্তু মামা মালিশ করে চলেন, তারপর কোস্তিয়ার গায়ে জড়িয়ে দেন ভেড়ার চামড়ার আলখিল্লা। বাকি ভোদ্‌কাটুকু তিনি খেয়ে ফেললেন, তারপর টেবিলের ওপর রাখলেন টগবগে কেটলি।

ওরা দু'জনে খেতে থাকে নুন মাখা কালো রুটি, পান করতে থাকে কড়া ঘন কালো চা। কোস্তিয়ার মনে হচ্ছিল এর আগে সে এর চেয়ে মুখরোচক আর কিছু খায় নি, পান করে নি। চামড়া জ্বালা করছে, সর্বাঙ্গ বয়ে চলেছে উষ্ণতার প্রবাহ, তার মুখ চকচক করতে শুরু করে ঘামে। সে নতুন করে বলতে শুরু করে কী ভাবে শুরু হল ঝড়বৃষ্টি, সে কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল এই সব কথা, এবং এখন কেন যেন এটা স্বীকার করতেও তার লজ্জা হল না। হয়ত মনে মনে ভেবেছিল, ভয় না হয় সে পেলই, তবু যা যা করা দরকার সে সবই ত সে করেছে।

এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ পাইপ টানেন, কোস্তিয়ার বিবরণ শোনেন, তাকে উৎসাহ দিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়েন। তারপর কোস্তিয়ার জিভ যখন জড়িয়ে আসতে থাকে, তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ে টেবিলের ওপর তখন তিনি আস্তে করে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন, গা ঢেকে দিলেন।

'কিন্তু আমার যে মোটেই ঘুম পাচ্ছে না, আমার ঘুমই আসবে না এখন...' অবাধ্য জিভ কোন রকমে নেড়ে প্রতিবাদ করতে করতে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমে ঢলে পড়ল কোস্তিয়া।

বাতির আর কোন দরকার ছিল না, এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ তাই ওটাকে নিভিয়ে দিলেন, জামাকাপড় পরে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ফের দেখা হবে

কোস্তিয়া অনেকক্ষণ ধরে পড়ে পড়ে অঘোরে ঘুমোয়, কোন স্বপ্ন পর্যন্ত সে দেখে না। সূর্যের কিরণ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে, ধীরে ধীরে এগোতে থাকে কোস্তিয়ার মুখের দিকে, কোস্তিয়া চোখমুখ কোঁচকায় — শেষকালে জেগে ওঠে। ঘর সাফ করা, মেঝে ধোয়ামোছা। জানলার বাইরে ফড়িং-এর দল ঝিঁঝিঁ আওয়াজ করছে, মার্টলেট পাখিরা চেঁচাচ্ছে। কোস্তিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দড়ির ওপর শুকোচ্ছে তার প্যান্ট আর কোর্তা, নদীর ধারে নিউরা কী যেন ধোয়াপাকলা করছে। কোস্তিয়া তার দিকে এগোতে গিয়ে নিজের সর্বাঙ্গে ভার ভার উপলব্ধি করে অবাক হয়ে গেল। গতকাল যে প্রয়াস তাকে প্রয়োগ করতে হয়েছিল তার দারুণ চাপে এখনও শরীর ভার হয়েছে, আঙুলগুলো খাড়া হয়ে আছে আঁকশির মতো, সেগুলোকে খোলা এবং ভাঁজ করাও কঠিন। হাতের তালুতে ফোস্‌কা পড়েছে, ছড়ে যাওয়া চামড়া জ্বলছে। পেশীতে পেশীতে এই টান এবং হাতের তালুতে এই জ্বলুনি — দুইই উপলব্ধি করতে বেশ লাগছে কোস্তিয়ার।

নদীতীর সাফ হয়ে গেছে, ঝড়বৃষ্টিতে ধোয়ামোছা। তৃণভূমির উঁচু উঁচু ঘাস যেন আরও শ্যামল বর্ণ ধারণ করেছে, আরও যেন জমকাল হয়ে উঠেছে হোয়াইট উইলো ও রোজ উইলোর ঝাড়, আকাশ আরও নির্মল, আরও নীল বেগবতী নদীর ধারা। আর কখনও এসব মনে হয় নি এত আনন্দের, এত সুন্দর, কোস্তিয়ার মনেও আর কখনও লাগে নি এত ভালো, এমন আনন্দ। কেন? কোস্তিয়া এ নিয়ে ভাবে না। তার খুশি লাগছে, তাই করতে ইচ্ছে হচ্ছে এমন কিছু যাতে আরও খুশি খুশি লাগে। সে ছুটতে ছুটতে এসে ঐ অবস্থাতেই ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল নিউরার পাশে। নিউরা চমকে সরে গেল, আরেকটু হলেই গিয়ে পড়ত জলের ভেতরে।

'ওঃ, ছড়ে টড়ে গিয়ে এ কী দশা হয়েছে রে তোর! কালসিটেও পড়েছে দেখছি! দেখ কাণ্ড,' কোস্তিয়া তীরে উঠে আসতে সমবেদনা ও তারিফের সুরে বলল নিউরা। সমস্ত ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই সে বাবার কাছ থেকে জেনেছে, কিন্তু তার জানার ইচ্ছে আরও বিশদভাবে, তাই সে

কোস্তিয়াকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল: 'তা বল্ দেখি কী হল? তুই বাবার সঙ্গে নৌকোয় চড়ে নদীতে গিয়েছিলি? অ্যাঁ? ভয় লাগছিল? আমার কিন্তু খুব ভয় করছিল! ওঃ কী বাজটাই পড়ল, কী বাজটাই না পড়ল — সাঙঘাতিক কাণ্ড বটে! আর বিদ্যুৎ — যেন ধেয়ে আসছে তোরই দিকে! তাই না? আমার ইচ্ছে হচ্ছিল বাড়ি চলে আসি, কিন্তু দিদা ছাড়লেন না। নইলে আমিও তোদের সঙ্গে... আর হ্যাঁ, খাদের ভেতর দিয়েও যাওয়া অসম্ভব। এমন কি সকালেও যাওয়া কঠিন ছিল — জল এমন পাক খাচ্ছে, এমনই পাক খাচ্ছে! বাবা আমাকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আসেন।'

'এফিম মামা কোথায়?'

'বয়া বসাতে গেছেন। সকালে গাঁয়ে এলেন। ভিজে সপসপে, কাদামাটি মাখা, খাদের ভেতর দিয়ে এসেছেন... তারপর যৌথখামারের সভাপতি দু'জন লোককে ঠিক করে দিলেন, ওরাই এখন বয়া বসাচ্ছে... তা তুই চুপ করে আছিস যে? বল্ না কী হল।'

কোস্তিয়া বর্ণনা দেয়, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা যেমন হয়েছিল বর্ণনায় সেরকম ভয়ংকর ও কঠিন হয়ে দেখা দিল না। নিউরা মুগ্ধ হয়ে শোনে, নিজেই ওকে খেই ধরিয়ে দেয়, আরও বলার জন্য তাড়া দেয়, কিন্তু তাতে কোস্তিয়ার বর্ণনার ভঙ্গি আরও কুণ্ঠিত ও নীরস হয়ে পড়ে।

তাছাড়া বিশেষ বলারই বা কী আছে? সবই ত করেছেন মামা, সে কেবল তাঁকে সাহায্য করেছে দাঁড় বাইতে আর নৌকো থেকে জল ছেঁচতে। হ্যাঁ, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তারা বেরিয়েছিল, ভয় লাগছিল। ব্যস, এই ত সব। এখানে বীরত্বের কী আছে? বড় কথা হল এই যে স্টীমার ভালোয় ভালোয় পাথরছড়া পেরিয়ে এগিয়ে গেছে কাখোভ্কায়, যেখানে তার মা এবং আরও অনেক অনেক লোক তৈরি করবে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। ওদের দেরি করিয়ে দেওয়া কি ঠিক? এটা যে বিশাল নির্মাণকর্ম!

কিছু বাদে মিশা ও তিমোফেই এসে হাজির। খাঁখাঁ রোদ্দুর, সেরকমই প্রচণ্ড তাপ, যেমন ছিল ঝড়বৃষ্টির আগে। ছেলেরা উত্তপ্ত বালির ওপর গড়াগড়ি দেয় — একবার উপুড় হয়, আরেক বার চিত হয়, আবার উপুড় হয়। মিশা ও তিমোফেই প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ করে দেয়। ফের বর্ণনা দিতে কোস্তিয়ার ইচ্ছে হয় না, সে তাচ্ছিল্যভরে বলে:

'রাতের বেলায় পাথরছড়ার ওপরকার বয়া ছুটে গিয়েছিল। আমি মামাকে সাহায্য করি।'

নিউরা তার হয়ে বর্ণনা দিল, সে এমন উৎফুল্ল হয়ে আর প্রবল উৎসাহে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল যে কোস্তিয়া শুনতে শুনতে কেবল চোখ কোঁচকায় আর মাথা নাড়ে। মিশা ও তিমোফেই সসম্ভ্রমে তাকিয়ে দেখে তার কালসিটে। কোস্তিয়া অবজ্ঞার ভান করে মৃদু শিস দিল — সে গৌরব অর্জনের সুখ উপভোগ করে।

শিগগিরই তিমোফেই ও মিশা যার যার কাজে চলে যায়। তা যাক গে, ওর নিজেরও কাজ

আছে! কোস্তিয়া নদীর তীরে ছুটে যেতে মুখোমুখি হল এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের সঙ্গে; তিনি তখন নৌকো ঘাটে ভিড়াচ্ছিলেন।

'কী বীরপুরুষ, ঘুম ভাঙল?' এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ হেসে বললেন। 'কী হল, কাশি-টাশি হচ্ছে না ত?'

'না... আপনার হাত ব্যথা করছে না ত? আমাকে সঙ্গে নিলেন না যে?'

'অন্য বার নেব 'খন। আমাকে ছেলেরা সাহায্য করেছে — ধন্যবাদ ওদের। আর হাত, ও কিছু নয় — অল্প অল্প করে সেরে যাচ্ছে...'

কোস্তিয়া নৌকো থেকে দাঁড় আর সাজসরঞ্জাম উঠাতে মামাকে সাহায্য করল, এই ভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুর করে বেড়াল। সন্ধ্যাবেলায় মামা যখন পরিদর্শনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন কোস্তিয়া কোন কথা না বলে ফের তাঁর সঙ্গ ধরল। এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের হাতের ফোলা ইতিমধ্যে কমে এসেছে, তবে দাঁড় বাইতে এমনিতেও তাঁর কষ্ট হয়, কোস্তিয়া মহা উৎসাহে সাহায্য করল তাঁকে।

কোস্তিয়া গাঢ় নিদ্রা যায়, তবে সজাগ থাকে, খুব ভোরে যখন আবার বয়ার জায়গায় যেতে হয় তখন ও বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে, যদিও মামা চেষ্টা করেন যথাসম্ভব চুপে চুপে চলে যেতে।

'তুই কোথায় চললি?'

'আপনার সঙ্গে!'

'ঘুমো, ঘুমো! তোর ঘুমানো দরকার।'

'না আমি যাব!' গোঁ ধরে থাকে কোস্তিয়া, আর এমন অনুনয়ের দৃষ্টিতে মামার দিকে তাকায় যে মামা আর আপত্তি করতে পারেন না, তারা একসঙ্গে যায়।

এমনই চলে রোজ রোজ। উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা ঘটে না, কিন্তু এখন নদীর বুকে আলো জ্বালানো ও নেভানো, নদীর চৌকিদারের কাজ করা কোস্তিয়ার আর একঘেয়ে বলে মনে হয় না। আসলে বলতে গেলে কি সে নিজেকে চৌকিদার ভাবে না, ভাবে কর্তা।

বয়ার জায়গাগুলিতে যাত্রার মতো আর কিছুই কোন কালে তাকে এত তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে পারে নি! কোস্তিয়া বুঝতে পারে না, এমন কেন লাগে, আসলে কিন্তু সে এ নিয়ে তেমন গভীরভাবে চিন্তাও করে না। কেবল পরে, বেশ কিছুকাল পরে সে বুঝতে পারে যে এর আগে সে কাজ করত শুধু নিজের জন্য কিন্তু এখন করছে অন্যের জন্য, আর সত্যিকারের আনন্দ মানুষকে দিতে পারে সেই শ্রম যা আরও দশজন মানুষের প্রয়োজনীয়, অন্যের উপকারে আসে।

টেলিগ্রাম, সেটা যদি প্রত্যাশিতও হয়, সর্বদাই কেন যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই আসে। এমনই অপ্রত্যাশিতভাবে এলো মা'র কাছ থেকে টেলিগ্রামটাও: মা কিয়েভে এসে গেছেন, কোস্তিয়াকে এখন ফিরতে হবে। কোস্তিয়ার এক দিকে যেমন আনন্দ হল, অন্য দিকে তেমনি দুঃখও হল: তার ইচ্ছে হচ্ছে মাকে দেখে, প্রাণের বন্ধু ফিওদর, পড়শী ছেলেমেয়ে, এমন কি লিওল্‌কোকেও সে দেখতে চায়, অথচ এখান থেকে চলে যেতে তার মন চাইছে না। তবু যেতে হয়।

ওরা চারজনে মিলে সবগুলি খাঁড়ি আর নদীনালা ঘুরে ঘুরে বেড়াল, স্নান করল, জলে এমন চুবুনি খেল যে কানের ভেতরে অবিরাম ঝিঁঝিঁ করতে লাগল, কিন্তু কথাবার্তা তারা বলল কমই। বিদায় নিতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। মিশা কোস্তিয়াকে বারবার বলে ফের যেন আসে: কিয়েভে কিছুদিন থেকেই যেন চলে আসে।

'কিন্তু ও কি আর আসবে?' বিষণ্ণ সুরে বলল তিমোফেই। তার ভরাট, সদা হাসি হাসি আর প্রসন্ন মুখ এখন থমথমে, বিষণ্ণ।

'আচ্ছা, আমাদের কিন্তু আবার দেখা হতে পারে!' নিউরা বলল। 'আমরা নিজেরাই যদি কিয়েভে আসি তাহলে কেমন হয়? অ্যাঁ? গেলেই হল! অ্যাঁ, কী বলিস?'

'সত্যিই ত!' কোস্তিয়া সায় দিয়ে বলল। 'দারুণ হবে কিন্তু! আমি তোদের সব দেখিয়ে দেব!'

'বটে, আমাদের কি আর ছাড়বে?' তিমোফেই সন্দেহ প্রকাশ করল।

সকলেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা সত্যিসত্যিই অত সহজ নয়, আর বুঝতে পেরে ওদের মন আরও খারাপ হয়ে গেল।

বিদায়কালে কোস্তিয়ার জন্য তিমোফেই নিয়ে এলো এক থলি আপেল।

'গোড়ার দিককার ফলন, মিচুরিন পদ্ধতিতে,' জাঁক করে বলল ও। 'কেবল বীচিগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিস।'

কোস্তিয়াও বুঝতে পারে এর থেকে উদার ও নিঃস্বার্থ উপহার আর কিছুই হতে পারে না।

নিউরা কোস্তিয়ার ব্যাগে পেস্ট্রি ঠেসে দিল, এগুলি সে নিজে বানিয়েছে; আর মামা তাকে দিলেন মোটা সোনালি সুতোয় বোনা 'কাঁকড়া' — 'কাঁকড়াটাকে' ইচ্ছে করলে টুপিতে সেলাই করে লাগানো যায়, নয়ত স্রেফ টেবিলের মাথার ওপর ঝুলিয়ে রাখা যায়।

মিশার উপহার দেবার মতো কিছু ছিল না। তাই ভারী দুঃখ হল তার মনে, সে ভেবে ভেবে বার করল কী ভাবে কোস্তিয়ার যাত্রা উপলক্ষে কিছু একটা করা যায়। মিশা শুকনো রোজ

উইলোর ডালপালা সংগ্রহ করল, আর এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচ যখন কোস্তিয়াকে নৌকো থেকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলেন স্টীমারে (এবারেও সেই 'আশখাবাদ') তখন সে ধুনি জ্বালল। উঁচু কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া আকাশে উঠল — ঠিক যেন আকাশের উঁচু নীল খিলানের গায়ে একটি দিকস্তম্ভ।

'কী হে নাবিক, অমন মনমরা কেন?' কোস্তিয়াকে জিজ্ঞেস করল তার পূর্বপরিচিত সেই স্ফূর্তিবাজ মেটটি। 'দেখতে পাচ্ছ, তোমাকে কেমন করে বিদায় জানাচ্ছে? এতে আনন্দ পাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ,' আমতা আমতা করে বলল কোস্তিয়া, এর বেশি সে আর কিছু বলতে পারল না।

রেলিং আঁকড়ে ধরে সে তাকিয়ে থাকে অপসৃয়মাণ তীরভূমির দিকে। ধুনির কিছু দূরে একপাশে দেখা যায় এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের দীর্ঘকায় মূর্তিটি, তাঁর পাশে ঝলকাচ্ছে লালচে বাদামী রঙের একটা শিখা — নিউরার মাথার চুল। কোস্তিয়া যথাসাধ্য নিজের মনকে শক্ত করে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তার পক্ষে এটা বড় কঠিন। সে তাদের সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের ভালোবেসেছিল। কোস্তিয়ার হৃদয়ের একটা কণা রয়ে গেল এখানে। আর এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই যেন বিদায় জানানোর ভঙ্গিতে দুলছে, নুয়ে পড়ে নমস্কার জানাচ্ছে ডুবো পাহাড়ের ওপরকার বয়াটি।

তবে কোস্তিয়ার এই বিষাদ দীর্ঘস্থায়ী হল না। বাঁকের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় এফিম কন্দ্রাতিয়েভিচের কুঠিটা, টিলার ওপরে মিশার জ্বালানো ধুনির ধোঁয়া দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায় আর স্নিগ্ধ প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে কোস্তিয়াকে অধিকার করে বসে নতুন নতুন উপলব্ধি, আচ্ছন্ন করে নতুন নতুন চিন্তা।

মা'র খবর কী? মা নিশ্চয়ই কত না দেখেছে, জেনেছে কাখোভ্‌কা সম্পর্কে! এখন কোস্তিয়া তাঁর পেছন পেছন লেগে থাকবে, যতক্ষণ না সব, সবকিছু জানতে পারছে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কে — ভূতত্ত্ববিদ, নির্মাণকর্মী আর শহর সম্পর্কে। এমনও ত হতে পারে যে পরের বার তাঁকে আবার যেতে হলে তিনি কোস্তিয়াকে সঙ্গে নেবেন? তবেই না ছেলেদের কাছে বলার মতো কিছু থাকবে! তবে হ্যাঁ, এখনও অবশ্য বলার মতো ঘটনা তার ঝুলিতে আছে। ফাইভ 'বি'-র ছেলেরা ত কোস্তিয়াকে দেখে হাঁ হয়ে যাবে — রোদে পুড়ে পুড়ে সে প্রায় পুরোপুরি কালো হয়ে গেছে, আর তার ভুরুজোড়া হয়েছে সাদা ধবধবে, শণের মতো। আর মাস্‌ল? নিশ্চিত হওয়ার জন্য কোস্তিয়া আরও একবার যাচাই করে দেখে — হাত ভাঁজ করে বাইসেপের শক্ত গুলি টিপে দেখে। মাস্‌ল — এমনই ত চাই! কেবল আফশোস এই যে স্কুলের ছুটি শেষ হতে এখনও ঢের দেরি।

সবচেয়ে আগে জানা দরকার নৌস্বেচ্ছাসহযোগিতা-সমিতির ব্যাপারটা। কোস্তিয়াকে ওখানে ভর্তি নিতেও ত পারে? অফিসার অবশ্য সে সঙ্গে সঙ্গে বনে যাবে না, কিন্তু তালিম

নেওয়া ত দরকার। আর তার আগে অবধি কত কিছুই না জানতে হবে, দেখতে হবে! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব কাজ শুরু করে দিতে হয়! কখন আসবে কিয়েভ, শুরু হবে স্কুল আর সেই সবকিছু যা এখনও পড়ে আছে তার সামনে!..

ভবিষ্যতের ছবি আগে থেকে উপলব্ধি করে কোস্তিয়া অধীর হয়ে এক জায়গায় পা ঠুকতে থাকে, তারপর ওপরের ডেক দিয়ে এমন ভাবে স্টীমারের সামনের দিকে ছুটে যায় যে মনে হয় এতেই যেন অতি দ্রুত তার চিন্তাভাবনা বাস্তবে পরিণত হয়ে যাবে, সে চটপট পেঁাছে যাবে কিয়েভে, স্কুলে, তার বাড়িতে — এক কথায়, পেয়ে যাবে সবকিছু যা তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে ওখানে।

ফের পাশ দিয়ে চলে যায় ঝোপেঝাড়ে ঢাকা ছায়াঘন তীরভূমি, সোনালি রঙের উত্তপ্ত চড়া, কোস্তিয়ার মুখোমুখি ছুটতে ছুটতে আসছে ঝলমলে মসৃণ নদীবক্ষ, নদীর নীল পথরেখা — সে পথরেখাকে এখন আর সহজসরল বলে তার মনে হচ্ছে না বটে, কিন্তু এর ফলে দেখা দিচ্ছে আরও সুন্দর হয়ে।

সাগরতীরে



অতল

সারা দিন ধরে সাশ্রুক কাঁদছে। ধমক দিচ্ছে মা, চড়-চাপড়ও দিচ্ছে, বাবা বলছে **'কান ছিঁড়ে নেব'**। কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করছে সাশ্রুক, তারপর ফের ঘ্যানঘ্যান, প্যানপ্যান। পুরনো ট্রাকটাকে সমবায় দপ্তরে নিয়ে আসছে সেমিওন খুড়ো, এর মধ্যে তাতে খাবারদাবারের বাক্স আর পেট্রলের পিপে উঠেছে। জেলেরা তাতে চাপাতে শুরু করলে ঝোলাঝুলি, প্যাঁটরা, আর তা দেখেই সাশ্রুক এমন হাহাকার করে কেঁদে উঠল যে খোদ ব্রিগেডিয়ার ইভান দানিলভিচ পর্যন্ত অবাক হয়ে চাইলে, কাছে এসে উবু হয়ে বসল তার সামনে।

'কান্না জুড়লি কেন রে ?'

'কু-কু-কুর,' ফুঁপিয়ে বললে সাশ্রুক।

বুঝতে পারলে না ব্রিগেডিয়ার।

'কী গো নাস্তিয়া, কী ব্যাপার ?'

'যত সব আবদার ! কুকুর সঙ্গে নিতে চাইছে, ওই বাচ্চাটা, কিন্তু জায়গা কোথায় ? এমনিতেই যন্ত্রনার একশেষ...'

ব্রিগেডিয়ার ইভান দানিলভিচ উঠে দাঁড়িয়েছিল সাশ্রুকের সামনে, যেন একটা পাহাড়। চুপ করে এসেছিল সাশ্রুক, ফোঁপাচ্ছিল শুধু নিঃশব্দে, নিচু থেকে মুখ উঁচু করে চেয়েছিল ব্রিগেডিয়ারের দিকে, কিন্তু মায়ের কথাটা কানে যেতেই ফের:

'ভ্যাঁ-্যা...'

'আরে দাঁড়া, দাঁড়া!' ভুরু কোঁচকালে ইভান দানিলভিচ, 'ভোঁ দিচ্ছিস যেন কুয়াসায় বয়া... একটি নাকি?'

সাশুকের পায়ের কাছে ছিল উইলোয় বোনা চুপড়ি। চুপড়িতে ঘুমুচ্ছে বাদামী রঙের একটা কুকুরের বাচ্চা। মাথাটা ঝুলে আছে কানার ওপর দিয়ে। অল্প হলেও বেশ পরিষ্কার নাক ডাকছিল বাচ্চাটার।

'ওরে বিচ্ছু,' মুচকি হাসলে ব্রিগেডিয়ার। 'নেতিয়ে পড়েছিস... যাকগে, নে তোর জানোয়ারটাকে সঙ্গে। শোনো নাস্তিয়া, সঙ্গেই নিক, কেন ছেলেটার প্রাণে দুঃখু দিচ্ছ। কুকুরছানা তো আর নেকড়ে নয়, আমাদের গিলে খাবে না...'

লাফিয়ে উঠল সাশুক।

'ইভান দানিলভিচ কাকু...'

'উঁহুঁ, তুই উঠবি পরে। আগে মুখ-হাত ধুয়ে আয়গে। এমন নাকের জলে চোখের জলে হলে তাকে কেউ কি আর জেলের ব্যাটা বলবে?'

নিমেষেই সাশুক ছুটে গেল কুয়োর কাছে, জলের ঝাপট দিলে মুখে, প্যাণ্ট থেকে বেরিয়ে আসা কামিজের খুঁট দিয়ে মুখ মুছলে, তারপর চুপড়ি নিয়ে ছুটে এল গাড়ির কাছে।

'সব ঠিক আছে তো, ভ্যাঁ-কাঁদুনি ছা?' বললে ইভান দানিলভিচ, 'যা মায়ের কাছে। আর তুমি নাস্তিয়া বসবে ড্রাইভারের কেবিনে, ইজমাইলের পর রাস্তাটা যা, তাতে মরদদের জানও নিকলে নেবে।'

'সে কি হয় ইভান দানিলভিচ, ওটা যে আপনার জায়গা...'

'কিন্তু তুমি যে সবে রোগ থেকে উঠলে গো।'

সাশুকের বগল চেপে তাকে তুলে নেয় ইভান দানিলভিচ, চুপড়ি সমেত সাশুকও গিয়ে পেঁছয় কেবিনে।

'দরজার হাতল ধরিস না পড়ে যাবি, একটা হাড়ও আর আস্তো থাকবে না।'

সেমিওন খুড়োর পাশেই বসেছে মা, সাশুক জানলার কাছে, জানলা দিয়ে বার করে দিয়েছে মাথাটি। চারপাশে ছেলেরা জুটেছে সবকটি পাড়া থেকে। কেউ এসেছে বাপকে তুলে দিতে, কেউ এমনি, দেখতে। আগে থেকেই হাত নাড়ছিল তারা। সাশুকও তাদের উদ্দেশে হাত নাড়ে। বেশিক্ষণ নয়। শুধু জানিয়ে দেবার জন্য যে ওরা পড়ে রইল, কিন্তু সাশুক চলে যাচ্ছে।

'সবাই বসেছ তো হে?' বললে ইভান দানিলভিচ, 'ছাড়ো তাহলে সেমিওন। শুভযাত্রা...'

কী সব ঘোরায় সেমিওন খুড়ো, কেঁপে উঠে এগিয়ে যায় গাড়ি। চেঁচায় ছেলেপিলেরা, পাশে পাশে ছোটে, তারপর থেমে যায় পেছনে। ঝিলিক দিয়ে যায় কুটির, মোড়ের কাছটায় ঝকঝক করে ইয়ালপুখের জল, যেন টিনের আয়না। তারপর হারিয়ে গেল ইয়ালপুখ, হারিয়ে

গেল কুটিরগুলো, ঘন দেয়ালের মতো রাস্তার দু'পাশ জুড়ে কেবল ভুট্টাগাছ, ঝাপট দেয় হলুদ ঝাড়ন দিয়ে, উঁকি দেয় কেবিনের ভেতর।

'আমাদের যা ঢিমেতেতালা স্বভাব,' বললে সেমিওন খুড়ো, 'যেন কবরখানায় চলেছি। তোড়জোড় করতেই সারা দিনটা গেল। এখন চলো রাতভোর। আর যা রাস্তা — দিনের বেলাতেই ধকল কত।'

'রাস্তার জন্যে কিছু এসে যাচ্ছে না,' বললে সাশুকের মা, 'কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর কী হবে?'

'কেন? যেমন হয় তেমনি।'

'তা বটে! কিন্তু ওই জেল-খাটাটাকে নিলে কেন? বড়ো ওকে আমাদের দরকার!..'

'কেন? ছোকরা তো আর সৃষ্টিছাড়া নয়।'

'কিন্তু জেল খেটে এসেছে তো! এমনি তো আর কেউ জেল খাটে না...'

'কে জেল খেটেছে?' জিজ্ঞেস করলে সাশুক।

'আরে ওই জোরকো-টা, পাটকিলে-চুল, বাজখাঁই গলা... তুই কিন্তু ওর সঙ্গে মিশবি না, বুঝলি?'

সেমিওন খুড়ো কটাক্ষে চাইলে মায়ের দিকে, কিন্তু কিছু বললে না।

ভুট্টাগাছ ফুরিয়ে আসছে, তারপর শুরু হচ্ছে কোঠা, বাড়ি, আর দালান।

'এটা কোন জায়গা?' জিজ্ঞেস করলে সাশুক।

'শহর। ইজমাইল শহর।'

কেবলি বড়ো আর লম্বা আর উঁচু হয়ে উঠছে বাড়িগুলো। কেবিন থেকে মুখ বাড়ালে সাশুক, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুণতে চাইল জানলাগুলো কিন্তু গুলিয়ে যেতে লাগল কেবলি। মস্ত শহর। যেন দশটা নেক্রাসভকা। উঁহুঁ, বোধ হয় একশটা... রাস্তাগুলোও একেবারে অন্য রকম। দু'ধারে গাছ-পোঁতা। চাকার গর্ত, খানাখন্দ, কিছুই নেই রাস্তায়, একেবারে চিকন যেন র‍্যাঁদা দিয়ে সমান করা। কাদা নেই, ধুলো নেই...

চৌমাথায় ব্রেক কষলে সেমিওন খুড়ো, আর সাশুক দেখলে মস্ত এক পাথরের বেদীর ওপর ঘোড়া, ঘোড়ার ওপর শুকনোটে চেহারা একটা মানুষ, হাত তুলে সে টুপি ধরে আছে।

'কে এটা?'

'সুভোরভ,' বললে সেমিওন খুড়ো, 'জেনারেল। ঝুনো লড়িয়ে।'

'চাপায়েভের মতো? ফ্যাসিস্টদের মারে?'

'ফ্যাসিস্ট বোধ হয় তখন ছিল না। অনেকদিন আগের কথা। তবে বলা যায় না, হয়তবা কোন কিসিমের ফ্যাসিস্টও থাকতে পারে...'

'আচ্ছা সেমিওন খুড়ো, তুমি ফ্যাসিস্ট মেরেছ?'

'নারে, আমি শুধু গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরিয়েছি।'

'যুদ্ধে ?'

'যুদ্ধেই বটে।'

শেষ হয়ে গেল শহর। সেই সঙ্গে ভালো রাস্তাটাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঝাঁকানি দিচ্ছে গাড়ি, লাফিয়ে উঠছে, পিছলে যাচ্ছে। চাকার তল থেকে ধুলো উড়ে হলুদ মেঘের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠে ঢেকে ফেলছে পাটে বসা সূর্যকে।

কেবিনের ছাতে করাঘাত পড়ল।

'সেমিওন, কী লাগিয়েছ বলো তো, কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার!' চেঁচিয়ে উঠল ইভান দানিলভিচ।

কী একটা জিনিস ঠেলাঠেলি করলে সেমিওন খুড়ো, গাড়ি এবার চলতে লাগল ধীরে ধীরে, কিন্তু কাঁপুনি ঝাঁকুনি চলল সমানেই, টলে টলে পড়তে লাগল এপাশে-ওপাশে। থেকে থেকেই সাশুকের মাথা ঠুকে যাচ্ছে জানলার ফ্রেমে। মা তাকে ধরে বসিয়ে দেয় সীটের গদিতে। চুপড়িটা লাফায় মেঝের ওপর, কুকুরছানাটা ছটফট করে। সীট থেকে নেমে আসে সাশুক, চুপড়িটা কোলে নিয়ে বসে। কুকুরছানাও কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ফের।

এইভাবেই চলল ওরা, ধুলো ওড়ে চাকায়, পেছন দিকে তা কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে এক রক্তিম দাবদাহের মতো। মাঝে মাঝে সামনেও দেখা দেয় ধুলোর বাঁকা স্রোত। দ্রুতবেগে তা ছুটে আসতে থাকে মুখোমুখি, বেড়ে ওঠে আকাশ পর্যন্ত। ঘড়ঘড়িয়ে চলে যায় সামনে থেকে আসা ট্রাকটা। তখন শুধু আর পেছনটা নয়, সামনেটাও ছেয়ে যায় ধুলোয়। সাশুক, এমনকি ঘুমের মধ্যে কুকুরছানাটাও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে হাঁচে। মাথায় বাঁধা রুমালের খুঁট দিয়ে মুখ মোছে মা, আর সেমিওন খুড়ো রেগে গালাগালি দেয় আস্তে করে।

সূর্য অস্ত গেল, সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। হেড লাইট জ্বাললে সেমিওন খুড়ো, তবে আলো তার জ্বলে শুধু বাঁয়েরটায়। আলোর তরল হলদেটে ছোপটা গিয়ে পড়ে রাস্তার খানাখন্দের ওপর। অন্ধকারের মধ্যে, মাঝে মাঝে তাতে ধরা পড়ে বাঁকাচোরা কী এক প্রেত। কিন্তু গাড়ি কাছিয়ে আসতেই সে প্রেত হয়ে দাঁড়ায় পুরনো কোন ডাল অথবা ছিটকে আসা ঝোপ। চোখ করকর করে সাশুকের, যেন বালি পড়েছে। ও কিন্তু একেবারে উইণ্ড স্ক্রীনের ওপর চোখ রেখে কেবালি চেয়ে আছে।

'চোখ যে ঠেলে বেরিয়ে আসছে,' বললে মা, 'কী আছে দেখবার, কিছুই নেই। নে ঘুমো।' মাথাটা তার সে টেনে নিলে নিজের উষ্ণ গায়ের কাছে।

'না মা, ঘুমব না,' বলে সরে গেল সাশুক, 'কিন্তু সমুদ্র কখন আসবে?'

‘সমুদ্র আসতে আসতে তোর আরো দশটা স্বপ্ন দেখা হয়ে যাবে। মাঝ রাতে পেঁছব,’ বললে সেমিওন খুড়ো।

‘কী রকম দেখতে ? ইয়ালপুখের মতো ?’

‘কার সঙ্গে কার তুলনা !’ বললে সেমিওন খুড়ো, ‘ইয়ালপুখ হল একটা ডোবা, আর সমুদ্র — সে হল বাপু অতল, অগাধ...’

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সাশুক চাইলে তার দিকে। ঠাট্টা করছে নাকি ? ইয়ালপুখ আবার ডোবা হয় কিসে, অন্য পাড়টা যে তার দেখা যায় একেবারে আবছা, তাও জলের কাছের উইলো গাছে উঠলে তবে। আর কোথায় তার শুরু, কোথায় শেষ, সে তো যেখানেই ওঠো একেবারেই দেখা যায় না।

‘কিন্তু ‘অতল’ — কী জিনিস ?’

‘অতল মানে অতল... যার তল নেই।’

‘তল নেই, সে আবার কী ?’

‘তাই। তল নেই, বাস !’

তল নেই, ব্যাপারটা কীরকম সেটা কল্পনা করতে চাইল মাশুক, কিন্তু পারলে না। সবকিছুরই তল আছে। কুয়োর তল তো প্রায় কাছেই। যখন তাদের পড়শী ক্রিস্তিনার হাত থেকে বালতি পড়ে গিয়েছিল কুয়োয়, তখন দড়িতে ‘কাঁটা’ বেঁধে নামানো হয়। এখানে-ওখানে কাঁটা নামাতেই বালতি উঠে আসে। পড়ে ছিল সেটা তলায়। ইয়ালপুখ অবিশ্যি অনেক গভীর। সাশুক সমেত ছেলেপিলেরা কতবার সেখানে ডুব দিয়েছে, তল ছুঁতে পারে নি। তবে সেখানেও তল আছে। সাশুক নিজেই দেখেছে বেড়া জালের জন্যে সেখানে খুঁটি পুঁততে, নৌকোর নোঙর ফেলতে। আর নোঙর আটকে থাকে কিসে ? তলে। জলে তো আর নয় ! তার মানে সেমিওন খুড়ো ওটা অমনি মুখে বলছে, রগড় করে।

সেমিওন খুড়োর দিকে চাইলে সাশুক, কিন্তু মুখে তার রগড়ের চিহ্ন নেই, টানটান হয়ে তাকিয়ে দেখছে সামান্য আলো হওয়া রাস্তাটা। সাশুকও চেয়ে রইল সেদিকে। সামনে হলদে আলোর ছোপটা গুলিয়ে যেতে লাগল, তারপর একঘেয়ে রংচঙে একটা ফিতে হয়ে মিলিয়ে গেল...

* * *

ঘুম ভাঙল তার কুকুরছানার কেঁউ-কেঁউয়ে। উঠে বসল সে, পা ঝুলিয়ে দিলে ক্যাম্প খাট থেকে। ছানাটা ছুটে এসে কেঁউ-কেঁউ করতে লাগল।

‘চুপ !’ কড়া করে বললে সাশুক, ‘কান্না জুড়লি কেন ?’

খাঁচার মতো কামরাটার খোলা দরজা দিয়ে আসছে চোখ ধাঁধানো আলো।

'আরে!' বলেই সাশুক ছুটে বাইরে বেরুল কুকুরছানার পেছু পেছু।

চালার নিচে চুল্লির কাছে দাঁড়িয়ে আছে মা, গরমে লাল হয়ে উঠেছে, মস্ত এক হাণ্ডায় খুন্তি নাড়ছে। প্রকাণ্ড আঙিনাটা গোচর মাঠের মতো ফাঁকা আর পায়ের চাপে চাপে ন্যাড়া। তার ওপর যেন আগুন হলকাচ্ছে। শুধু ব্যারাকের দেয়াল আর বেড়ার খুঁটিগুলোর কাছে উঁচিয়ে আছে ছোপ ছোপ রোদপোড়া ঘাস। দূর থেকেই বোঝা যায় ঘাসগুলো শক্ত আর কাঁটা কাঁটা।

'মা, আর সবাই কোথায়?' চেঁচালে সাশুক।

'কোথায় আবার? সাগরে গেছে, সেই অন্ধকার থাকতেই।'

মা যেদিকটা দেখাল, সেদিকে তাকলে সাশুক। বেড়ার পরে পোড়ো মাঠটা আস্তে আস্তে ছোটো একটা ঢিপি হয়ে উঠেছে, তার ওপাশে কিছুই চোখে পড়ে না।

'আয়, খেয়ে নে' — বললে মা।

সে কথা আর সাশুকের কানে গেল না। আঙিনা পেরিয়ে সে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তখন সেঁধচ্ছে।

'চান করতে নামবি না বলছি!' চেঁচালে মা, 'নইলে ফিরলে তোর ঝুঁটি ছিঁড়ে নেব!'

কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা ঘাসে ঢিপিটা ভরা, কিন্তু কাঁটার দিকে তখন আর খেয়াল নেই সাশুকের। প্রাণপণে সে ছুট লাগালে। পেছনে কেঁউ-কেঁউ করে ন্যাঙচাতে ন্যাঙচাতে ছুটল কুকুরছানা।

ঢিপিটার ওপর ছুটে উঠল সাশুক, তারপরেই থেমে গিয়ে পিছিয়ে এল। সামনে আর কিছু নেই। ঢিপির খাড়া দেয়াল সোজা নেমে গেছে নিচে। গহ্বরটা এতই গভীর যে সাশুকের ভেতরটা একেবারে হিম হয়ে এল।

'বাপরে!' ফিসফিসিয়ে বললে সাশুক। একটু পিছিয়েই এসেছিল সে, তারপর ফের তাকিয়ে দেখতে লাগল নিচে।

বহু নীচে বালির একটা সরু ফালি এঁকেবেঁকে গেছে সাপের মতো, সে বালির একেবারে প্রান্তে ছলকাচ্ছে ছোটো ছোটো ঢেউ। আর তারপর, সামনে ডাইনে বাঁয়ে — কোথাও কিছু নেই। শুধু নীল, ঝকঝকে চোখ-ধাঁধানো একটা শূন্য। যেন আকাশ।

মাথার ওপর দিকে চাইলে সাশুক। উঁহুঁ, আকাশ অন্যরকম। সে আকাশ অনেক অনেক দূরে, তবে যেন চেনা-জানা, নীল আর নিশ্চল। শুধু কোথাও কোথাও ভাসছে শাদা ধবধবে মেঘ। চোখ নামিয়ে আনল সে নিচে। আকাশ সেখানে হয়ে উঠছে কেবলি উজ্জ্বল, তারপর স্রোত হয়ে উঠছে, ঝিলমিল করছে, অধীর ঝলক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে, ছুটে আসছে একেবারে তীর পর্যন্ত, ছোটো ছোটো ঢেউ ছলকাচ্ছে যেখানে।

সাশ্বকের প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল। তার মানে, এইটেই সম্দ্র? সেমিওন খ্বড়ো তাহলে সত্যি কথাই বলেছে যে তার তল নেই — এত বড়ো, শেষ নেই তার, সীমা নেই...

তীর বরাবর তাকিয়ে দেখল সে। ডাইনে বহ্ব দ্বরে দেখা যাচ্ছে লোহার জালি-কাটা একটা মিনার, তার ওপর পাখির বাসার মতো একটা কেবিন। বাঁয়ে তীর থেকে সম্দ্রে চলে গেছে খ্বঁটির ওপর বসানো জেটি। তবে নেক্রাসভ্কায় সাশ্বক যা দেখেছে, এ জেটিটা সেরকম নয়। সেখানে জেটিটা নিচু, ন্যাড়া — একটা মাচার মতো। এখানকার খ্বঁটিগ্বলো জলের অনেক ওপরে মাথা তুলেছে, আর পাটাতন থেকে উ'চু পাড়ে উঠেছে ফের সেই জালি-কাটা কিসব থামের মাথায়, সেখানে একটা প্রকাণ্ড লম্বা চালাঘরের সঙ্গে ঠেকে অদ্শ্য হয়ে গেছে তা। জেটির ওপর পাক খেয়ে উড়ছে কয়েকটা গাংচিল। একটা উড়ে এল সাশ্বকের দিকেই। দেখা গেল সেটা ইয়ালপ্বখের গাংচিলের মতো একেবারেই নয়। ইয়ালপ্বখের গাংচিলগ্বলো ছোটো ছোটো, শাদা, এগ্বলো হাঁসের মতো প্রকাণ্ড, শাদা শ্বধ্ব তলাদিকটা, ওপরটা ব্বনো হাঁসের মতো ছিট-ছিট...

'কী হাঁ করে বসে আছিস?' পেছনে শোনা গেল মায়ের গলা, 'কখন থেকে ডাকছি, কানেই যায় না... নিশ্চয় চান করেছিস? সত্যি করে বল।'

'না, না, চান করি নি,' মায়ের দিকে ফিরল সাশ্বক, 'কিন্তু জেলেরা কই? ডুবে যায় নি তো?'

আশঙ্কাটা তার অনেকক্ষণ থেকেই মনে হয়েছিল, কিন্তু উচ্চারণ করে বলার সাহস হল কেবল মাকে আসতে দেখে। সত্যিই তো, সেমিওন খ্বড়ো যা বলেছে সম্দ্র যদি তেমনি অতল হয়, যদি তার একেবারেই তল না থাকে, তাহলে ডুবে মরতে কতক্ষণ...

'কী যা-তা বলছিস, জিব তোর খসে পড়বে!' রেগে উঠল মা, 'দ্যাখ, ফিরছে।'

'কোথায়, কোথায়?' লাফিয়ে উঠল সাশ্বক, কিন্তু কিছ্বই সে দেখতে পেলে না। মা যখন তার মাথাটি ঘ্বরিয়ে হাত দিয়ে দেখালে, কেবল তখনই সেই চোখ ধাঁধানো ঢেউয়ের মধ্যে কীটের মতো প্রায় অলক্ষ্য নৌকোগ্বলো ঠাহর হল তার।

কষে ন্বনে জরানো

কাঠের আড়া দেওয়া তক্তার পাটাতন পথগ্বলো চলে গেছে জেটিতে; আর পাটাতন পথগ্বলোর মাঝখানে মাথা তুলেছে প্রকাণ্ড কী এক দ্বর্বোধ্য ব্যাপার: উ'চু পাড়ের ওপর যে বিরাট ব্যারাকটা আছে সেখান থেকে সোজা জেটিতে নেমে গেছে ইয়া লম্বা এক রবারের ফিতে। লোহার রোলারের ওপর ফিতেটা পরানো, মনে হয় যেন চওড়া নালা, এত চওড়া যে সাশ্বক

তাতে দিব্যি শুয়ে থাকতে পারে। জেটিতে এসে মস্তো এক বাক্সের মধ্যে ফিতেটা ঢুকে গেছে, তারপর বাঁক নিয়ে ফের রোলারের তল দিয়ে উঠে গেছে ওপরের ব্যারাকে।

'কী এটা ?'

'যন্ত্র, মাছ তাড়িয়ে নিয়ে যায় নুনে জরানোর জায়গায়।'

অবাক লাগে সাশুকের, বিশ্বাস হতে চায় না। সেকি, মাছ তাড়ানো যাবে কি করে ? ওরা কি এতই বোকা যে নিজে থেকেই যাবে নুনে জরাতে ?

'অত ধারে যাস না, পড়ে যাবি,' বললে মা, সাশুক কিন্তু নিচে উঁকি না দিয়ে পারে না।

সেখানে ঝিলমিল ছলাৎ-ছলাৎ করছে থলথলে সবজেটে জল। থই পেতে হলে 'হাত তুলে' তিন দফা ডুব। নয়ত চারটে। হয়ত খোদ ব্রিগেডিয়ার ইভান দানিলভিচও হাত না তুলে থই পাবে না। আর হুঁ-হুঁ বাবা, নেক্রাসভ্কায় সেই হল সবচেয়ে লম্বা লোক... তাহলেও সে গভীরতা ভেদ করে দেখা যাচ্ছে তলটা — সমান, বালুময় তল, ওপরকার ঢেউয়ের ফলে সেখানে হালকা ছায়া আর রোদের নড়াচড়া চলছে... তাহলে অতল আবার কোথায় ? নাকি, নৌকোগুলো যেখানে রয়েছে সেখানে ?

কাছিয়ে আসছে নৌকোগুলো। প্রতিটি নৌকোয় দু'সারি করে দাঁড় উঠছে একসঙ্গে, রোদের প্রতিফলন পাঠাচ্ছে সাশুকের কাছে, তারপর ফের নেমে আসছে। নৌকোগুলোর ওপর প্রাণপণে ডাক ছেড়ে উড়ছে গাংচিল। এসে তারা পাল্লা ধরছে নৌকোগুলোর, গ্লাইডারের মতো শোঁ করে উঠছে ওপরে, মোটা মোটা শাদা বুকের ঝলক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে, আবার ছোঁ মেরে নামছে নিচে আর ডাকছে, কেবলি ডাকছে, তার আর বিরাম নেই। এমন চিল্লাতে পারা গাংচিল ইয়ালপুখে নেই...

রুপোলি মাছে ভরা নৌকোগুলো ভিড় করলে জেটিতে। জেলেরা উঠে এল ওপরে, কিনারায় ঠেলে আনতে লাগল চেপ্টা চেপ্টা বাক্স। প্রতি নৌকোয় রয়ে গেল কেবল দু'জন করে লোক। হাতল লাগানো বড়ো বড়ো ছাঁকনি জাল দিয়ে তারা মাছগুলো বোঝাই করতে লাগল বাক্সে। জেটির শেষ প্রান্তে বাবার কাছে ছুটে যেতে গেল সাশুক, কিন্তু ভেজা তক্তায় পা পিছলে পড়ে গেল সে।

'এখানে এসেছিস কী করতে ?' ধমকে উঠল বাবা, 'ভাগ এখ্খুনি তীরে !'

'ঠিক আছে হে, শক্ত হবে !' বললে তাকে পাটকিলে-চুল জোর্কা, 'অভ্যেস করে নিক।'

রবারের ফিতের রোলারগুলো যে বারের সঙ্গে লাগানো, সাশুক ঘেঁসে আসে তার সঙ্গে। জোর্কা উবু হয়ে বসে হাত দিয়ে বাক্সের মাছগুলো বাছে। যেগুলো বড়ো বড়ো, পিঠে কালচে সুন্দর দাগ, সেগুলোকে সে ছুঁড়ে দেয় একটা আলাদা বাক্সে, আর যেগুলো ছোটো, কালচে পিঠ, সেগুলোকে ফের ছেড়ে দেয় সমুদ্রে।

'ছেড়ে দিচ্ছ যে ?' জিজ্ঞেস করে সাশুক।

'কেন ফেলে দিচ্ছি ? ওঁছা জিনিস, গাংচিলেরাও এগুলো খায় না। নে, আমার

জোগাড়েগিরি কর, শিখে নে। এই এইটে, পিঠে নক্সা — এটা হল ম্যাকেরেল। পয়লা নম্বরের মাছ। ওটাকে রাখ এখানো। আর এইটে হল রাফ — ওটা এখানেই থাকুক।'

'রাফ মাছ তো অমন হয় না।'

'মানে, আসলে এটা হল স্তাভ্‌রিদা, তবে আমরা বলি রাফ।'

মাছটাকে সাশুক হাতে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলে — তীক্ষ্ণ কাঁটা ফুটেছিল হাতে। থপ করে বাক্সে পড়ল মোটা উঁচুনিচু চাপাটির মতো দেখতে একটা জিনিস।

'এ্যাই !' বললে জোর্‌কা, 'খানা এসে গেছে আমাদের। দেখেছিস এ মাছ ? এর নাম কাম্বালা।'

'কিন্তু চোখ ওর পিঠে কেন ?'

'পিঠে নয়, ওটা ওর একটা পাশ। অন্য পাশটা তলে। নে, নিয়ে যা মায়ের কাছে। ধরতে পারবি ?'

'পারব না তো কি !' দুই হাতে মাছটা ধরে বললে সাশুক।

কাম্বালা মাছটা এতই পেছল আর ভারি যে পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে ধরতে হচ্ছিল। তাহলেও পারলে না সে। থপ করে মাছটা পড়ল ঠিক সাশুকের পায়ের কাছেই, সাশুকও হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর, কাঁটা বিঁধল পেটে। হেসে উঠল জেলেরা। অভিমান করে সাশুক সরে যায়। কাঁটা ফোটা পেটটা জ্বালা করছে। ইচ্ছে হয় সেটা দেখে, এমনকি কেঁদেও ওঠে, কিন্তু ভয় পায় তাতে আরো বেশি হেসে উঠবে জেলেরা, তাই ভান করে যেন গাংচিলগুলোকে দেখছে। পাক দিচ্ছে গাংচিল, জোড় বেঁধে উড়ছে। কান্না তাড়াবার জন্য ঘনঘন চোখের পলক ফেলে সাশুক।

ভর্তি বাক্সগুলো পর পর রাখা হয় রবারের ফিতেটার কাছে। ছাঁকনি জাল থেকে, বাক্স থেকে স্তাভ্‌রিদা মাছগুলো ছিটকে পড়ে পাটাতনের ওপর। রবারের হাইবুট পরা জেলেরা তার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যায়। নিচু হয়ে সাশুক কুড়তে শুরু করে সেগুলো।

'কাজের ছেলে দেখছি,' বলে তাদের নেক্রাসভ্‌কার প্রতিবেশী, ইগ্‌নাৎ প্রিখদ্‌কো, 'দ্যাখো আবার সারেঙ হয়ে না দাঁড়ায়।'

'ভালো করে নুনে জরানো দরকার, তাহলেই ঠিকমতো সারেঙ হয়ে উঠবে,' বলে জোর্‌কা।

"আচ্ছা, মাছ তাড়াবে কি করে,' জিজ্ঞেস করে সাশুক, 'মরে গেছে যে।'

'এখ্‌খুনি দেখবি। ইভান দানিলভিচ, শুরু করব নাকি ?'

ব্রিগেডিয়ার ঘাড় নাড়লে। মুখে আঙুল পুরে এক কান-ফাটা শিস দিলে জোর্‌কা, সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল ঘর্ঘর শব্দ, কাঁপতে থাকল পাটাতন, আর রবারের ফিতেটা উঠতে থাকল ওপরে। জেলেরা মাছের বাক্সগুলো নিয়ে ঢুকিয়ে দেয় ফিতের ওপরকার বড়ো বাক্সটার ভেতর; কিছুক্ষণের মধ্যেই রবারের নালায় এসে মাছগুলো রুপোলী সারিতে উঠতে থাকে ওপরে ব্যারাকটার দিকে।

'কনভেয়রে চেপেছিস কখনো?' গোলমাল ছাপিয়ে সাশ্বকে শুধোয় জোর্কা, 'চাপিস নি? তাহলে চল।'

সাশ্বকে শূন্যে তুলে ধরে সে। হাত-পা ছোড়ে সাশ্ব, কিন্তু ছাড়া পায় না, পেঁছয় চলন্ত রবারের খালে।

'শক্ত করে ধরে থাকিস!' চেঁচিয়ে বলে জোর্কা।

পাড়ের দিকে ওঠে রবারের খালটা, কেবলি উঠতে থাকে উঁচুতে, নিচ থেকে কে ঠেলে দেয় সাশ্বকে, চমকে সে আঁকড়ে ধরে রবারের খালের প্রান্ত।

'ওহে শুনছ!' হাঁক দেয় জোর্কা, 'নুনে জরাবার জন্যে এই রাফ মাছটা ধরো! কষে জরিও!'

মা চেঁচিয়ে ওঠে। ছুটে যায় ফিতে বরাবর, কিন্তু সাশ্বের আর নাগাল পায় না। কেবলি দূরে সরে যাচ্ছে ফিতেটা। এর মধ্যেই সাশ্ব এমনকি ইভান দানিলভিচের মাথাও ছাড়িয়ে গেছে। নিচে থামতে চায় সে, কিন্তু ফিতেটা তাকে কেবলি সরিয়ে নিচ্ছে জেটি থেকে, চারিপাশ ফাঁকা, ভয় লাগে, মাটি এত দূরে যে সাশ্ব গুড়িসুড়ি হয়ে চেপে চোখ বন্ধ করে। কার যেন হাত তাকে তুলে নেয়, ফিতে থেকে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় জল ভরা সিমেন্টের মেঝেয়। মাত্র তখনি চোখ মেলে সাশ্ব।

'কী কাণ্ড এসব? দাঁড়া তোর কনভেয়র চাপা দেখাচ্ছি!' রেগে ধমক দিলে অচেনা একজন গুঁপো লোক, চড় মারলে তার সেই জায়গাটিতে। মেরেছিল তত জোরে নয়, তাহলেও অভিমান হয় সাশ্বের — নিজে থেকে তো আর এই রবারের জিনিসটায় সে চাপে নি...

ফটকের মতো পেল্লায় দরজাটা দিয়ে সে ছুটে বেরয়। নিচের জেটি থেকে জোর্কা কী যেন চেঁচিয়ে বলে তাকে, হাত নাড়ায়। সাশ্ব মুখ ফিরিয়ে নেয়, চলে যায় বাড়িতে।

প্রতি বসন্তেই সাশ্বের পায়ের চামড়া ফাটে। এখনো ফাটাগুলো একেবারে সেরে না গেলেও প্রায় বুজে এসেছিল, সাশ্ব তা নিয়ে আর মাথাও ঘামাত না। কিন্তু এখন সেগুলোয় জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল: সিমেন্টের মেঝের ওপরকার জলটা ছিল নোনা। আঙিনায় হাত ধোয়ার জায়গাটায় ছুটে যায় সাশ্ব, একের পর এক ঠ্যাং তুলে ফাটা চামড়া ধুয়ে নেয়। এখন জ্বালা করছে কম, তবে ফুলে উঠেছে, লালচে হয়ে উঠেছে ফাটাগুলো।

'আগেই বলেছিলাম গুণ্ডাটার কাছে ঘেঁসবি না,' টেবিলে পুরো এক থলে মাছ ঢেলে মা তা ছাড়াতে বসে, 'ও তোর সর্বনাশ করবে...'

ঘোঁজ মুখে চুপ করে থাকে সাশ্ব।

আনন্দে কলরব করতে করতে জেটি থেকে ফেরে জেলেরা, গা-হাত-পা ধুয়ে খেতে বসে।

'এই সারেঙ, চল খ্যাঁট দেওয়া যাক!' সাশ্বকে বলে জোর্কা, কিন্তু সাশ্ব ভান করে যেন তার কানে যায় নি, ইচ্ছে করেই বসে জোর্কার কাছ থেকে দূরে, বাপের কাছে।

খাওয়া চলে অনেকক্ষণ ধরে, তাড়াহুড়ো না করে, জিরিয়ে জিরিয়ে। তারপর এদিক ওদিক চলে যায় সবাই, সিগারেট খায়। 'কুলেশ'* আর কাম্বালা সাশুক এত খেয়েছে যে উঠতে আলস্যি হচ্ছে। কুকুরছানারও ঝিম ধরেছে, জিভ বার করে ফোলা পেটটি পেতে শুয়ে পড়ল।

'শেষ পর্যন্ত আনলি,' বলে ইগ্নাৎ, 'আচ্ছা করে মার দিতে হয়।'

'মার কেন ?' জিজ্ঞেস করে জোর্কা।

'সঙ্গে কুকুর না আনার শিক্ষা পেত তাহলে। যত আবদার। কুকুর রাখতে হয় শেকলে বেঁধে। তাহলে হিংস্র হয়।'

'আর তুই নিজে শেকল-বাঁধা থাকার চেষ্টা করে দেখেছিস ?'

'আমার কী দায় পড়েছে। যাকে দরকার তাকেই কয়েদে রাখবে...'

মুখখানা জোর্কার লাল হয়ে উঠল, তারপর ফ্যাকাশে হতে থাকল, খোলা গলার ওপর ফুলে উঠল মোটা শিরা। তবে আত্মসংবরণ করে সে, চুপ করে থেকে বলে:

'যাক গে, ধর আমি তোর খোঁচাটা বুঝি নি... তবে এখনি জাঁক করিস না, কয়েদে তুই যাবি। তোর লোভের জন্যে। গোটা ব্রিগেড জড়ো করলেও তোর লোভের কাছে দাঁড়াবে না।'

'আমায় শেখাতে আসিস না, নিজের চরকায় তেল দে...'

ইগ্নাৎ উঠে চলে যায় ব্যারাকে।

'শালা !' দাঁতে দাঁত চেপে বলে জোর্কা, 'কুকুর ওর পথে কাঁটা দিচ্ছে... কী নাম ওর ?'

'ছানা,' অনিচ্ছায় জবাব দেয় সাশুক। মনে মনে সে ঠিক করেছিল এই জোর্কার সঙ্গে আর কখনো মিশবে না, কিন্তু জোর্কা যখন ওর কুকুরছানাটির পক্ষ নিয়েছে, তখন জবাব না দিয়ে পারে কী করে।

'ছানা... আরে সব কুকুর-বাচ্চাই ছানা... ওর নিজের একটা নাম থাকা উচিত, আলাদা নাম... ইস্, ঠেসে খেয়েছে বটে, পেট গোল হয়ে গেছে একেবারে বীমের মতো...'

'বীম আবার কী ?'

'বর্গা, যার ওপর জাহাজের ডেক বসে... এই বীম,' আঙুলে তুড়ি দিল জোর্কা, 'আয় তো এখানে।'

উঠে দাঁড়ায় ছানা, ধুলোর ওপর পেট ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে আসে তার কাছে।

'দ্যাখো দেখি, চট করেই বুঝে গেছে !' খুশি হয়ে ওঠে জোর্কা, আদর করতে থাকে তাকে।

---

* ইউক্রেনীয় খাদ্যবিশেষ। — সম্পাঃ

কুকুরটা চিত হয়ে পা ছুঁড়ে তার ঢোল পেটটা দেখায়, পাতলা লোমের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সেখানকার গোলাপী চামড়া।

'ধেৎ,' বলে ছানাটাকে কোলে তুলে নেয় সাশুক, 'ওর ওপর হুকুম ফলাতে হবে না।'

ফের সে যায় সাগরে, বসে থাকে খাড়াই খাদটির ওপর, পাশেই কুকুরছানাটি। বাতাসে আলুথালু হয়ে উঠছে ঝকমকে জল, তীরের কাছের ঢেউগুলো হয়ে উঠছে বড়োবড়ো, গজরাচ্ছে, ফেনাচ্ছে, আছড়ে পড়ছে বালুর ওপর। ডানা মেলে নিঃশব্দে ভেসে যাচ্ছে গাংচিলগুলো, তারপর বাঁক নিয়ে ফিরছে উল্টোমুখে, যেন প্রহরীর পায়চারি। মাঝে মাঝে কখনো এটা, কখনো ওটা পাথরের মতো ঝুপ করে পড়ছে জলে, তারপর ঠোঁটে মাছ নিয়ে উঠে আসছে ওপরে। উড়তে উড়তেই মাছটাকে খেয়ে নেয় গাংচিল, তারপর ফের সেই ধীরেসুস্থে একবার এদিক, আরেকবার ওদিক। বড়ো একটা গাংচিল একবার ছোটো একটা গাংচিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাছটা কেড়ে নিলে। চিৎকার করে উঠল ছোটোটা, তা শুনে অন্য গাংচিলগুলোও জোরে কান-ফাটানো ডাক শুরু করলে। নিশ্চয়ই ওই তাগড়াই ডাকুটার ওপর ওদেরও রাগ হয়ে গিয়েছে...

'এখানে বসে আছিস কেন ? চল চান করি গে।'

পার্টাকিলে জোর্কা চুপিচুপি এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। সাশুক তাকিয়ে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'কোথাও তোমার সঙ্গে আমি যাব না।'

'সে কী!' পাশে বসল জোর্কা, 'কনভেয়রের জন্যে রাগ হয়েছে বুঝি? আরে, রাগ করিস না। লোকে বলে, রাগী — কপালখাগী! চল যাই।'

'যাব না। মা তোমার সঙ্গে যেতে বারণ করেছে।'

'কেন ?'

'মা বলে তুমি গুণ্ডা।'

ফের ফুঁসে উঠেই ফ্যাকাশে হয়ে যায় জোর্কা। ফের তার গলায় ফুটে ওঠে মোটা শিরা, ওঠানামা করতে থাকে গালের পেশী, যেন মুখের ভেতর বাদাম চিবুচ্ছে।

'মা তোর একটা গাধা,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে।

'মোটেই মা গাধা নয়!' চেঁচিয়ে ওঠে সাশুক।

'বেশ, তাই হল — মা সম্পর্কে ও কথা বলতে নেই। তবে অযথাই তিনি এসব বলেছেন।'

'মোটেই অযথা নয়। মা বলে তুমি কয়েদে ছিলে।'

'নয়, ছিলাম...'

'তার মানে সত্যি কথা... কিন্তু লোকে কয়েদে থাকে কেমন করে ?'

'খুব সোজা। তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখল একটা কামরায় — মানে একটা পাথুরে কুঠরি আর কি। বাস, থাকো বসে। এক বছর, দু'বছর, তিন বছর... যার যেমন মেয়াদ।'

'সব সময় কেবল কুঠরির মধ্যে ? আর বাইরে ?'

'কোথায় সেখানে বাইরে...' তিক্ত হাসল জোর্‌কা, 'শুধু যদি কোথাও খাটুনির জন্যে পাঠায়, তখন।'

'কিন্তু কয়েদে রাখে কিসের জন্যে ?'

'নানান জনকে নানান কারণে, কেউ চুরি, কেউ খুন...'

'আর তোমায় কিসের জন্যে ?'

'আহাম্মকির জন্যে। এক ওপরওয়ালাকে মার দিয়েছিলাম।'

'ওপরওয়ালাদের মার দেওয়া যায় নাকি ?'

'কাউকে কাউকে দেওয়া দরকার, তবে ঘুষি মেরে নয়। ঘুষিতে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় না, শুধু নিজেকেই ফ্যাসাদে পড়তে হয়...'

'কিন্তু তুমি ওকে মেরেছিলে কেন ?'

'লোকটা ছিল নচ্ছার। আস্তো হামবড়া। লোককে একেবারে জ্বালিয়ে মারত। মর্জি হয় — কাজ দেয়, মর্জি হল — এমন জায়গায় পাঠাবে যে টেঁসে যেতে হবে। কেউ কথাটি কইলে আর রক্ষা নেই, একেবারে ছাঁটাই। কাজ করত প্রায় সবাই মেয়ে। আর মেয়েদের ব্যাপার জানিস তো, মুখ বুঁজে থাকে আর কাঁদে। তা আমাকেও একদিন অপমান করলে ডিরেক্টর। বললাম, 'ব্যাপার কী কমরেড ডিরেক্টর ? আমাদের এটা সোভিয়েত রাজ, নাকি নয় ?' বলে, 'তোমার মতো লোকের দরকার সোভিয়েত রাজের নেই।' বলে দিলাম, 'আয় তুই ভুঁড়িবাজ, গোটা সোভিয়েত রাজের হয়ে কথা বলবার তুই কে ? ভেবেছিস তুই সোভিয়েত রাজ ?' এই করে গড়াল। আমি যখন রেগে উঠি, একেবারে জ্ঞান থাকে না। দোয়াতদানিটা তুলে নিলাম, দোয়াতদানিটা ওর দিব্যি বিরাশি সিক্কা, পাথরের, — ঝেড়ে দিলাম চন্দ্রবদনটিতে... সাক্ষীসাবুদের সামনে। রাজনীতি জুড়ে দিলে আমার সঙ্গে, আমি নাকি সোভিয়েত রাজের বিরোধী। দশ বছর ঠুকে দিলে। পাঁচ বছর কাটাই, লাথি-ঝাঁটা খেয়েছি। তারপর নতুন করে সব নথিপত্র দেখা হল, ছেড়ে দিলে। অনেক দিন আগের ঘটনা, বাহান্ন সালের...'

'আর কোথায় এখন ওই... হামবুড়ো ?'

'হামবড়া ? জানি না... হয়ত এখনো কোথাও ওপরওয়ালা হয়েই আছে। চল যাই, চান করি গে, গরম লাগছে।'

'না না, সেমিওন খুড়ো বলেছে সমুদ্রের তল নেই।'

'নেই মানে ? তল সবখানেই আছে। তুই সাঁতরাতে পারিস না বুঝি ?'

'পারি। তবে তল যদি না থাকে, তাই ভয় লাগছে।'

'আছে রে, তল আছে। চল দু'জনে গিয়ে দেখা যাবে।'

জেটি থেকে কিছু দূরে খাড়াই পাড়টা ঢালুতে নেমে গেছে। তপ্ত বালিতে লাফাতে লাফাতে তারা ঢালু বেয়ে ছুটে নামে জলে। কুকুরছানাটাও পড়ি-মরি ছুটে আসে তাদের পেছন পেছন, তারপর বহুক্ষণ ধরে মাথা ঝাঁকায় আর হাঁচে।

রাত পাহারা

'এই দ্যাখ তল, দেখছিস?' পোষাক ছেড়ে বললে জোর্কা।

'আর ওখানে?' দূরের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে সাশুক।

'ওখানেও আছে। তবে অনেক নিচে। ওখানে তোর সাঁতরে যাওয়া চলবে না, ডুবে যাবি।'

'তোমার গায়ে ওটা কী? মানুষের গায়ে ছবি আঁকে নাকি?'

নীল ফুটকি দিয়ে জোর্কার বুকে উল্কি আঁকা ছিল হরতনের টেক্কা, একটা বোতল, আর মেয়ের পা। ওপরে শিরোনামা: 'আমাদের সর্বনাশের কারণ'।

'আহাম্মকি যত সব!' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিতে চায় জোর্কা, 'আহাম্মকদের গায়ে এই সব ছবি আঁকে।'

'তুমিও কি আহাম্মক নাকি?'

'ছিলাম। হয়ত এখনো খানিকটা রয়ে গেছি।'

ছুটে গিয়ে জলে ডুব দেয় সে, এতক্ষণ ধরে সে ডুব সাঁতার কাটে যে সাশুকের মনে হতে শুরু করে, হাবুডুবু খেয়ে বুঝিবা তলিয়ে গেছে।

'লাগা সারেঙ!' হুস করে ভেসে উঠে চেঁচায় জোর্কা, 'ডুব দে!'

বুক ভরে দম নেয় সাশুক, গালদুটো পর্যন্ত ফুলিয়ে তোলে, তারপর নাকের ফুটো চেপে ডুব দেয়... আর যেতে থাকে বালিতে পেট ঘসে। হোহো করে হেসে ওঠে জোর্কা।

'ক্ষ্যাপা কোথাকার! পেট দিয়ে জমিতে হাল দিচ্ছিস নাকি?'

'এখানে যে জল কম!' ক্ষুব্ধ হয়ে বলে সাশুক।

'তোকে নিয়ে আর পারা যায় না — এই গভীরজল, এই অল্পজল,' কাছে সাঁতরে আসে জোর্কা, তারপর পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে, 'নে কাঁধে চাপ।'

হাতে পায়ে ভর দিয়ে উঠে পড়ে সাশুক, আঁকড়ে ধরে জোর্কার পাটকিলে চুল। সিধে হয়ে দাঁড়ায় জোর্কা আর ভয়ই করে ওঠে সাশুকের, জলের ওপরে জোর্কা কত উঁচু! লম্বায় জোর্কা ইভান দানিলভিচের চেয়ে অল্পই খাটো।

'তৈরি? ঝ-পাং!'

কাঁধ ঝাড়া দেয় জোর্কা। দু'হাত জড়ো করে নেবারও সময় পায় না সাশুক, ঠ্যাং ছড়িয়ে ব্যাঙের মতো থুবড়ে পড়ল জলে।

'কেমন ?'

'দারুণ !' চেঁচায় সাশুক, 'বীম, আয় এখানে !'

কুকুরছানা দাঁড়িয়েছিল একেবারে কিনারের কাছে, ছুটে আসা ঢেউগুলো থেকে পেছিয়ে পেছিয়ে গিয়ে ভেউ-ভেউ করছিল। সাশুক ওকে কোলে তুলে নেয়। নিয়ে যায় জলের মধ্যে। কেঁউ-কেঁউ করে বাচ্চাটা, হাত ছাড়িয়ে পালাতে চায়। বুকজল পর্যন্ত এসে সাশুক ছেড়ে দেয় ওকে। হাবুডুবু খায় বাচ্চাটা, ফোঁৎ ফোঁৎ করে, প্রাণপণে জলে থাবা চালিয়ে সাঁতরাতে থাকে। সাশুক যায় তার পেছু পেছু, খিলখিলিয়ে হাসে। বালিতে উঠে বীম মাথা ঝাঁকায়, ঝোলা ঝোলা কানদুটো ভেজা ন্যাকড়ার মতো লটপট করে লাগে তার মুখে।

'ইয়ালপুখের চেয়ে এখানে চান করে আরাম আছে,' বলে সাশুক, একেবারেই দম ফুরিয়ে গেছে তার, শুয়ে পড়ে বালিতে।

'নোনা জল, আপনা থেকেই ভাসিয়ে রাখে।'

'আচ্ছা, আমাদের জেলেরা কেন চান করছে না কেউ ?'

'বয়স হয়ে গেছে তো, ইচ্ছে করে না।'

'তোমারও তবে বয়স হয়ে গেছে নাকি ?'

'এখনো খুব বেশি নয়, মাত্র বত্রিশ... চল যাওয়া যাক, নইলে মা তোকে ধরে দেবে একচোট।'

ঢালু বেয়ে উঠতে থাকে ওরা।

'ওটা কী ?' মাথায় পাখির বাসাওয়ালা জালি-কাটা মিনারটা দেখায় সাশুক।

'সীমান্ত মিনার। সীমান্তরক্ষীরা পাহারা দেয়, সীমান্তে নজর রাখে।'

'গুপ্তচরদের ওপর ?'

'হ্যাঁ।'

'চলো গিয়ে দেখি।'

'দেখবার কী আছে ? তাছাড়া আমাদের দেখতে পেলে ভাগিয়ে দেবে।'

'আর রাতে যদি যাই। রাতে তো দেখতে পাবে না।'

'রাতে ভায়া ঘুমতে হয়।'

'আর ওটা কী ?'

'পিল-বক্স। জার্মানদের।'

খাড়াই পাড়টা থেকে কিছু দূরেই ভাঙা পিল-বক্স। কংক্রীটের অক্ষত বুনিয়াদ থেকে বেরিয়ে আছে পাকানো লোহার শিক বেঁকে যাওয়া বীম। বাঁধানো জায়গাগুলোয় মাটি জমেছে, ভরে উঠেছে আগাছায়। ভাঙা দেওয়ালটা আঁকড়ে ধরতে চায় সাশুক, কিন্তু আঙুল ওর ধার

পর্যন্ত পেঁাছয় না। পিল-বক্স থেকে খাড়াইটার কিছু দূর পর্যন্ত এঁকেবেঁকে আছে ভেঙে পড়া অগাছা গজানো ট্রেঞ্চ। গলায় ভরসার সুর এনে সাশুক বলে:

'হয়ত ওখানে গুলি-টুলি পড়ে আছে, এ্যাঁ? চলো খুঁজে দেখি।'

'বিশ বছর তোর জন্যে পড়ে থাকবে বইকি... ওই দ্যাখ তোর মা ছুটে আসছে। তোর গুলি খোঁজা দেখাবে।'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে মা। জোরকার দিকে তাকায় না পর্যন্ত, যেন তার অস্তিত্বই নেই। সাশুককে চড় মেরে তাকে বাড়ি টেনে নিয়ে যায় হাত পাকড়ে। জোর্কা যখন অনেক পেছনে পড়ে গেল কেবল তখন সে হিসিয়ে উঠল:

'কতবার না তোকে বলেছি ওই গুণ্ডোটার কাছে ঘেঁসবি না!'

'একেবারেই ও গুণ্ডো নয় মা, আমায় সব বলেছে... উহ্, মারছ কেন?.. মারামারি করলে জেলে পুরে দেবে।'

'দেখাচ্ছি তোকে!'

এঁকেবেঁকে হাত ছাড়িয়ে পালায় সাশুক।

'পালা না, কত পালাবি। ঘরে তো ফিরতেই হবে!'

এই শাসানিতে সাশুক ভয় পায় না: মা'র রাগ খড়ের আগুন, চট করেই নিভে যায়।

সত্যিই রাগ পড়ে যায় মা'র, সাশুক যখন খেতে এল, তখন বড় একটা তো মারলই না, বকুনিও দিলে না। খাওয়ার পর মা বাসন ধুতে বসে, তারপর মুছতে শুরু করে সেগুলো। অলিন্দের পেছনে ঠাণ্ডা জায়গাটায় বসে সাশুক, পাশেই ঠাঁই করে নেয় বীম আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। সাশুকের ঘুম ধরেছে, ঘুমিয়েই পড়ত, কিন্তু এই সময় ব্যারাক থেকে অলিন্দে বেরিয়ে আসে জোর্কা। সাশুককে সে লক্ষ করে নি, সোজা চলে যায় মায়ের কাছে। আড়চোখে তার দিকে চেয়ে মা সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে নেয় বাসনগুলোর ওপর। জোর্কা বলে:

'নাস্তিয়া, একটা কথা আছে...'

মা তার দিকে সামান্য মুখ ফেরায়, কিন্তু চোখ তোলে না।

'ছেলেটাকে তুমি আমার ভয় দেখাচ্ছ কেন বলো তো?'

'তোমার কি ওর সঙ্গী হবার মতো বয়স?'

'এখানে ওর সঙ্গী হবার মতো কেউই নেই, সবাই বুড়ো ধেড়ে।'

'বুড়ো ধেড়ে হোক না হোক, মুখে তো আর চুনকালি পড়ে নি।'

'আর আমার মুখে বুঝি, চুনকালি পড়েছে? কেন, খুন করেছি কাউকে, ডাকাতি করেছি?'

'সেসব আমি জানি না...' বলে মা এমন রেগে রেগে তোয়ালে দিয়ে জামবাটিটা মুছতে শুরু করে, যেন তাতে একটা ফুটো করাই তার ইচ্ছে।

'জানো না, তাহলে জিজ্ঞেস করো।'

'বড়ো আমার দায় পড়েছে জিজ্ঞেস করতে!'

'তাহলে এসব বলে বেড়াচ্ছ কেন? 'গুণ্ডা', 'জেলে ছিল'...'

'বলতে চাও, ছিলে না?' ফুঁসে ওঠে মা।

'নয় ছিলাম... কিন্তু কীসের জন্যে? এই তোমার মতো হাঁদাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম বলে...'

চুপ করে মা সেই একই জামবাটিটাই মুছে যায়, তারপর বলে:

'কথা এমন একটা বলে দিলেই হল...'

' 'বলে দিলেই হল...' ' পুনরুক্তি করলে জোর্কা। 'কথার পেছনে মানুষটাকে দেখতে হয়!.. ছি ছি!'

মাথা নিচু করে সে ফিরে যায় ব্যারাকে আর আড়চোখে চেয়ে দেখতে থাকে মা।

'ওর পেছনে তুমি লাগলে কেন মা?' বলে সাশুক, 'ও যে...'

'চুপ!' ধমকে ওঠে মা, তোয়ালের ঝাপট মারে সাশুকের বুকে, 'এখনো সেই এক গোঁ...'

সন্ধ্যার আগে জেলেরা ফের চলে যায় সমুদ্রে। বীমকে নিয়ে সাশুক তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায় জেটি পর্যন্ত, তারপর সেখানে বসে বসে তাকিয়ে থাকে নৌকোগুলোর দিকে। তারপর একেবারে যখন নৌকোগুলো এইটুকু হয়ে যায়, তখন বীমের উদ্দেশে শিস দিয়ে চলে যায় সেই পিল-বক্সটার কাছে। জোর্কা কি আর সবই জেনে বসে আছে? কিছু না কিছু হয়ত এখনো পড়ে আছে, কারো চোখে পড়ে নি, সাশুকই হয়ত তা পেয়ে যাবে? নেক্রাসভ্কার ছেলেপিলেরা তাহলে হিংসেয় মরে যাবে...

অনেক খুঁজল সে, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। শুধুই কেবল কাঁটাগাছ, বার্ডক, কংক্রীট শানের ওপর রোদপোড়া ধুলো। খামকাই তার হাত-পা ছড়ে গিয়ে আঁচড় খাওয়াই সার হল। তখন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা শুরু করে সাশুক। ভাঙা ট্রেঞ্চে নেমে সে মেশিনগান চালায় ফ্যাসিস্টদের দিকে: খট-খট-খট-খট... তবে একা একা খেলা জমে না, বীমও বড়ো গোলমাল করছে। অকারণে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে ওটা, কোনো হুকুমই বুঝতে পারছে না। তারপর যখন সে বুক ছেঁচড়ে এগুতে লাগল শত্রুর আঁত-ঘাঁত জেনে আসার জন্য, বীম তখন ঘেউ-ঘেউ লাগিয়ে কামড়ে ধরল তার গোড়ালি। এতে কি আর গুপ্তসন্ধানের কাজ চলে?

সীমান্ত মিনারটার দিকে ছুটতে শুরু করে সাশুক, কিন্তু শীগগিরই ছোটা থামিয়ে হাঁটে, তারপর একেবারে থেমে যায়। ওপরের সেণ্ট্রিবক্সে যে সিঁড়িটা উঠে গেছে, তার কাছে একটা ঘোড়া বাঁধা। একবার এ পায়ে একবার ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে ঘোড়াটা, লেজ নাড়ছে। কেউ ধরা পড়েছে নাকি?.. খুব তার ইচ্ছে আরো কাছিয়ে যায়, সাধ মিটিয়ে সব দেখে, কিন্তু জানেই তো, তাকে তাড়িয়ে দেবে। সূর্য যদি এমন জ্বলজ্বল না করত, তাহলেও নয় নজর এড়িয়ে

সেঁধনো যেত চুপি চুপি। সূর্য কিন্তু ঢলে পড়লেও সবকিছুই আলোয় আলো, জীপসীদের খঞ্জনির মতো ডাঙাটাও একেবারে ন্যাড়া, কোথাও লুকোবার উপায় নেই দূর থেকেই ওকে দেখে ফেলবে, ভাগিয়ে দেবে নির্ঘাত। বড়োরা যে সব সময় অমনি ভাবে, সবকিছু তাদের জানলেই হল, ছেলেপিলেরা নিজেদের মনে থাকুক...

বাড়ি ফেরে সাশুক। তার ইচ্ছে, জেলেরা ফেরা পর্যন্ত সবুর করে, কিন্তু মা ওকে জোর করে খাওয়ায়, তারপর খাওয়ায় বীমকে, তারপর চোখ ওর বুজে আসতে শুরু করে, আর ক্যাম্প খাটে যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন রাত।

পার্টিশানের ওপারে অবিরাম নাক ডাকাচ্ছে জেলেরা। মা-বাবাও ঘুমুচ্ছে। বীমও ঘুমচ্ছে দরজার কাছে মেঝের ওপর। জানলায় ঠিক তাকটার কাছেই উঁকি দিচ্ছে চাঁদ। চুপি চুপি খাট থেকে নামে সাশুক, এগিয়ে যায় দরজার দিকে। কুকুর কুণ্ডলী হয়ে পাশ ফেরার চেষ্টা করে বীম, কিন্তু ঢোল পেটটার জন্য পারে না, পা ছড়িয়ে দিয়ে কাত হয়।

বেশি দূর যেতে চায় না সাশুক, অলিন্দেই ঠাঁই নেয়। চাঁদটা মোটেই নেক্রাসভ্কার মতো নয় — কেমন অজানা, বিরাট, লালচে — জেগে আছে ঠিক দিগন্তের ওপর। আর গোটা ডাঙা আর গোটা আঙিনার সবখানি দেখা যাচ্ছে, শুধু দিনের চেয়ে একটু অন্যরকম। কেমন ভুতুড়ে আর মনমরা। বিরল কয়েকটি তারার মধ্যে উঁচিয়ে আছে সীমান্ত মিনারের কালো দাগ।

আচ্ছা, এখন গেলে কেমন হয়? গিয়ে দেখবে কীভাবে গুপ্তচর ধরছে ওরা? গাঁয়েও গুপ্তচর ধরেছে সাশুক। তীরের হোগলা বনে। ছেলেরা যখন হোগলা ঝোপের মধ্যে লুকোয় তাদের ধরা — সে দারুণ কঠিন। কিন্তু মিছি-মিছি...

সাবধানে এগোয় সাশুক, কান পাতে, ব্যারাক থেকে নাক ডাকার শব্দ আসছে। বরাবরই ব্রিগেডিয়ার ইভান দানিলভিচ নাক ডাকায় সমান তালে গাঢ় আওয়াজে, যেন রাস্তা দিয়ে যাওয়া ট্রাক্টরের শব্দ... আরো এগিয়ে যায় সাশুক। পা দেবে যায় তপ্ত ধুলোয়, একেবারেই শোনা যায় না হাঁটার আওয়াজ। বেড়া গলে বেরিয়ে সে ছোটে মিনারটার দিকে। ঐ তো ভাঙা পিল-বক্সের ঢিপি, আগাছা ভরা ট্রেঞ্চ। ছুট থামিয়ে এবার হাঁটতে শুরু করে সাশুক, এদিক ওদিক চেয়ে দেখে। না, মোটেই ভয় পাচ্ছে না সে, কেমন গা ছমছম করে: এটা যে মড়ার রাজ্য, ফ্যাসিস্টরা মারা পড়েছে এখানে... দিনে তারা কিছু করতে পারে না, কিন্তু রাতে?..

কাছেই কোথায় তীক্ষ্ণ খনখনে শব্দে একটা সিসাদা ফড়িং ডেকে ওঠে। থেমে যায় সাশুক। ফের সব চুপচাপ। ঢিপিগুলো বোবা, নিশ্চল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে মাটি থেকে বেরিয়ে আছে বাঁকাচোরা হাত। আড়ষ্ট হয়ে যায় সাশুক, হিম হয়ে আসে গা। চিৎকার করে সে ভোঁ-দৌড় দিতে যাবে এমন সময় মনে পড়ে গেল যে দিনে এগুলোকে দেখেছে, মোটেই হাত নয় এগুলো, দোমড়ানো লোহার শিক। সাহস ফিরল সাশুকের। সত্যিই তো, ফ্যাসিস্টরা এখানে মারা পড়েছে, কিন্তু কবর দিয়েছে নিশ্চয় অন্য জায়গায়... তার মানে, কোনো মড়াই এখানে নেই!

আশেপাশে চাইতে চাইতে সাশুক ঢিপিগুলোর পাশ দিয়ে যায় সাবধানে পা টিপে, যেন কাচের ওপর দিয়ে হাঁটছে। পিঠ ওর হয়ে ওঠে কাঠের মতো, আটকে আসে নিশ্বাস। পেরিয়ে গেছে ঢিপিগুলো। সাশুক এবার হাঁটে তাড়াতাড়ি, তারপর দৌড়তে শুরু করে। মিনার আর বেশি দূরে নয়। ঢিপিগুলোর আড়াল থেকে দেখা যায় কেবল চাঁদের কিনারাটুকু। মিলিয়ে যায় চাঁদ, হারিয়ে যায়, হঠাৎ একেবারে অন্ধকার হয়ে যায় চারিদিকে। প্রাণপণে সামনে ছোটে সাশুক, মিনারের সিঁড়িটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আঁকড়ে ধরে সেটা।

চারিদিক নিস্তব্ধ। কালো আকাশে মিটমিট করছে অল্প কিছু তারা। কাছেই উঁচিয়ে আছে এক গোছা কাঁটাগাছ। তাছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, ব্রিগেডের ব্যারাক, ভাঙা পিল-বক্স — কিছুই না। অনেক ওপরে সেণ্ট্রিবক্সটা, কেউ হয়ত সেখানে বসে আছে। কিন্তু যদি না থাকে ? কান পেতে শব্দ ঠাহর করতে চায় সাশুক, কিন্তু কিছুই শোনা যায় না।

কেবল তখনই সাশুকের খেয়াল হয় কী সে করে বসেছে। একা সে, কালো ফাঁকা ডাঙ্গাটার মধ্যে একেবারে সে একা। কোথাও জনপ্রাণী নেই, আর মা-বাবা যেখানে ঘুমুচ্ছে সেই ব্যারাকটা আর তার মাঝখানে রয়েছে ভাঙা পিল-বক্স আর ট্রেঞ্চ, আর যত সব মড়া। সিঁড়িটা আঁকড়ে ধরে সাশুক ভয়ে কুকুরছানার মতো কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

ভারি ভারি পায়ের চাপে ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠল সিঁড়িটা। পিঠে তার কে যেন হাত দিলে।

'এই খোঁকা ? ইখানে যে ? কানছিস কেনে ?'

'কাঁদছি না,' ফুঁপিয়ে উঠল সাশুক।

'ইখানে এলি কেনে ? তুর মাজান-বাপজান কুথা ? এ্যাঁ ? যা সিথাকে।'

ব্রিগেডের ব্যারাকটা থেকে যে ভয়ংকর ফাঁকাটা তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে চাইলে সাশুক, তারপর হতাশ হয়ে মাথা নাড়লে।

'কী ব্যাপার, হাকিম ?' ওপর থেকে চ্যাঁচালে কে যেন।

'ছানা একটা, বাচ্চা খোঁকা, কানছে আর কানছে।'

'খোকা মানে ?'

'নিজেরই মালুম হছে না। খোঁকা, বাস খোঁকা !'

'নিয়ে আয় এখানে, দেখা যাবে।'

সাশুককে কোলে করে হাকিম সিঁড়ি বেয়ে তাকে নিয়ে আসে ওপরে। চোখ ধাঁধানো আলো পড়ল সাশুকের মুখে।

'কে তুই ? কোত্থেকে আসছিস ?'

আলোয় ধাঁধিয়ে গিয়ে চোখ কোঁচকায় সাশুক।

'ওইখান থেকে,' হাত দেখায় সে, 'মা আছে ওখানে। জেলেরা আছে। বাবাও।'

'তা এখানে এসেছিস কেন ?'

'দেখতে।'

'দেখবার কিছু নেই, পালা শীগগির মায়ের কাছে।'

'না-না!' বলে সাশুক পেছুতে পেছুতে গিয়ে ঠেকে একেবারে খোপটার শার্শির সঙ্গে, 'অন্ধকার, ভয় করছে।'

'আর এখানে আসতে ভয় করে নি? বেশ ফিরে যেতে পারবি।'

'তখন যে চাঁদনি ছিল,' বলে সাশুক।

'তাতে কিছু এসে যায় না। বাইরের লোক এখানে থাকার নিয়ম নেই। বুঝেছিস?'

কাঁধ পট্টিতে আড়াআড়ি নক্সা-তোলা সেপাহিটা কথা কইছিল খুব রেগে রেগে। জবাব দেওয়ার বদলে ফের ফোঁপাতে শুরু করে সাশুক।

'আর কাঁদবার নিয়ম একেবারেই নেই,' আরো রেগে বলে নক্সাদার সেপাই, 'এলি সীমান্তরক্ষীদের কাছে আর ভ্যা কান্না জুড়েছিস। কেমন ধারা সেপাই হবি তুই?'

'আমি যে এখনো ছোটো,' ফুঁপিয়ে উঠল সাশুক।

'ছোটো থেকেই কাঁদতে লাগলে বড়ো হয়ে ধ্যাড়াবি। কান্না থামা বলছি!' হুকুম করলে সেপাই।

'আ-আর কাঁদব না...'

'জবাব দিতে হয় সেপাইদের রেওয়াজ মতো: জো হুকুম, কান্না থামাচ্ছি।'

'জো হুকুম, থামাচ্ছি!' বললে সাশুক, 'শুধু আমায় ভাগিয়ে দেবেন না, আমি কিছু ছোঁব না, দুষ্টুমি করব না।'

'থাকুক, এ্যাঁ?' বলে হাকিম।

'নিয়ম নেই। ওদিকে মা-বাপে ব্যস্ত হয়ে উঠবে, ভাববে ছেলে হারিয়েছে।'

'কিন্তু আমি তো হারাই নি, আপনাদের সঙ্গে আছি!' চাঙ্গা হয়ে বলে সাশুক।

'বেশ, এখন নয় বসে থাক। বাড়ি ফিরলেই বাপ তোর পাছার ওপর বেল্ট দিয়ে যা দেবে না।'

'না, না,' বললে সাশুক, 'বাবা কেবল কান মলে দেয়...'

'কান — সেটাও মন্দ নয়।'

সেণ্ট্রিবক্সটা খুবই ছোটো আর ফাঁকা। একটা দরজা, তিনটে জানলা আর বেঞ্চি। তাক লাগবার মতো কিছুই না। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে সেপাইরা। সাশুকও পায়ের পাতার ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয় জানলার ফাঁক দিয়ে। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চারিদিকে, শুধু চোখ মটকায় ওপরের জ্বলন্ত তারারা। হঠাৎ ডান দিকের অন্ধকারটা ছিঁড়ে যায়। কাঁপা কাঁপা একটা নীলাভ আলোর স্রোত আছড়ে পড়ে ওপরে, নেমে আসে, হঠাৎ ফুটে ওঠে সমুদ্রের ওপরকার পাড়, তার ওপরকার ঘাসের গোছা, — এত স্পষ্ট

আর নিখুঁত যেন একেবারে কাছে। তারপর অন্ধকার থেকে ঝাঁপ দিয়ে আলোটা পড়ে দূরের জেটি আর কনভেয়রের ওপর। ঝকমকিয়ে ওঠে নীল হয়ে ওঠা ব্রিগেড ব্যারাকের শাদা শার্শিগুলো।

'কী এটা ?' চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে সাশুক।

'সার্চ লাইট।'

'সার্চ লাইট সব দেখে বেড়ায়, নয় ?'

'সার্চ লাইট আলো ফেলে। দেখি আমরা।'

কাঁপা কাঁপা আলোর তীক্ষ্ন ছোপটা তীর ছুঁড়ে ছুটে যায় ডাইনের দিকে, তাতে ঝকঝক করে ওঠে সমুদ্রের ঢেউ-খেলা। আলোটা কেবলি বাঁক নিয়ে যায় ডাইনের দিকে, দূরে দূরে, তারপর হঠাৎ মিলিয়ে যায়। সাশুকের চোখের সামনে সমুদ্রের ওপর অনেকক্ষণ ধরে কেবল কাঁপতে থাকে কালো কালো ডোরা। দূরবীন নামিয়ে নেয় সেপাইরা।

'আপনাদের এখানে গুপ্তচর ধরা অনেক সোজা,' বলে সাশুক, 'সার্চ লাইট রয়েছে, সব দেখা যাচ্ছে। হোগলা-বনও নেই। আর আমাদের নেক্রাসভ্কায় ইয়ালপুখে এমন হোগলা-বন যে লুকোলে আর কিছুতেই ধরা যাবে না।'

'হোগলা-বনেও ধরব বৈকি।'

'এমনিতে নয়, হয়ত বা কুকুর দিয়ে,' সন্দেহ প্রকাশ করে সাশুক, 'আমাদের নেক্রাসভ্কাতেও মিনার আছে। তবে সীমান্তরক্ষীরা নয়, সেখানে বসে থাকে তারাসিচ দাদু। বন্দুকও তার লম্বা... আঙুর ক্ষেতে কেউ সেঁধলেই সে অমনি গুড়ুম, গুড়ুম! নুন পুরে ছোঁড়ে।'

'কেন, আঙুর ক্ষেতে কেউ ঢোকে নাকি ?'

'ঢোকে।'

'তুই-ও ?'

'আমিও,' একটু থেমে বলে সাশুক।

'চুরি করা কিন্তু ভালো নয়।'

'সে তো ভালোই নয়,' নিশ্বাস ফেলে বলে সাশুক, 'কিন্তু আঙুর খাওয়ার লোভ হয় তো... ছেলেপিলেরা যায়, আমিও তাদের সঙ্গে...'

'কেন, এমনি চাইলে দেয় না ?'

'এমনি! ওতে কোনো মজা লাগে না... আচ্ছা, শীগগিরই আসবে ওরা ?'

'কারা ?'

'গুপ্তচর।'

হেসে ওঠে সেপাইরা।

'ওরা তো আর খবর দিয়ে আসে না।'

'আর যখন আসবে, গুলি করবেন আপনারা?'

'সে দেখা যাবে।'

'তাহলে আমি একবারটি গুলি করব, কেমন? অন্তত খানিকটা ধরে রাখব।'

'স্টেনগান খেলনা নয় রে। তাছাড়া শোন: ডিউটিতে গপ্প করার নিয়ম নেই। একবার যখন সেপাই হয়ে পড়েছিস, তখন নিয়মমতো চলতে হবে। বেঞ্চিতে বসে নজর রাখ। কী জবাব দিতে হবে?'

'জো হুকুম, নজর রাখছি।'

'বেশ, কাজে লেগে যা।'

জানলার কাছে গিয়ে বসল সাশুক, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ওপরের তারা আর সমুদ্রে তাদের আবছা ছটা ছাড়া কিছুই তার চোখে পড়ল না। শুধু শুধু অন্ধকারে চেয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগে, তাই বার দুয়েক তার নাক ঘসে গেল তক্তার দেওয়ালে। তখন সে দেওয়ালটায় বেশ গুটিসুটি হয়েই জমিয়ে বসল।

'বাঃ, দিব্যি শৃঙ্খলা,' নক্সা-তোলা উর্দির সেপাই বললে তার ওপর ঝুঁকে, 'ডিউটির সময় সেপাই ঘুমুচ্ছে।'

'মোটেই ঘুমুচ্ছি না,' বলে সাশুক।

ঘুমুচ্ছে না বৈকি। শুধু চারিদিকটা ভারি অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারাগুলো পর্যন্ত নিবে গেছে। সেপাইদেরও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওদের কথাবার্তা তো তার কানে আসছে। তার মানে ও ঘুমিয়ে পড়ে নি। শুধু বাস্তবটা ওর কাছে মনে হচ্ছে স্বপ্নের মতন। নক্সা-তোলা উর্দির সেপাই আর হাকিম এক জানলা থেকে অন্য জানলায় গিয়ে তাকিয়ে দেখে। সাশুকও যায় আর তাকায়। নক্সা-তোলা উর্দির সেপাই হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে:

'হাতিয়ার নেই, কেমন ধারা সৈন্য তুই? নে ধর।'

নিজের অটোমেটিক গানটা খুলে সে পরিয়ে দেয় সাশুকের ঘাড়ে।

'চিরকালের মতো?' আনন্দে আড়ষ্ট হয়ে যায় সাশুক।

'বটেই তো, চিরকালের জন্যে।'

প্রাণপণে সাশুক বাগিয়ে চেপে ধরে হাতিয়ারটা। এবার একবার গুপ্তচর এলে হয়। ঝট করে চালিয়ে দেবে এক পশলা — খট-খট-খট-খট!..

'কী ব্যাপার?' বলে হাকিম, 'জেলেদের ব্যারাকে আলো জ্বলেছে, লণ্ঠন নিয়ে ছুটাছুটি করছে।'

'ঘটেছে কিছু একটা... উসমানভ, গিয়ে খোঁজ নাও তো... আর শোনো হাকিম, এটাকেও নিয়ে যাও।'

আর সাশুকের মনে হয় যেন নৌকোয় ভাসছে — যাচ্ছে না কোথাও, ঢেউয়ে দুলছে।

তারপর হঠাৎ শোনা যায় চিৎকার, কে যেন তাকে আঁকড়ে ধরে এত জোরে যে তার ব্যথাই করে ওঠে...

মায়ের কোলে সে, তার ওপর ঝুঁকে আছে ইভান দানিলভিচ, ইগ্নাৎ আর জোর্কো। হাতে তাদের টর্চ।

'ফিওদর !' দূরে হাঁক দেয় জোর্কো। 'খুঁজতে হবে না। পাওয়া গেছে !'

'আক্কেল নেই তোর শয়তানটা ?' বলে ইভান দানিলভিচ, 'লোকে কাজের পর কোথায় ঘুমুবে, না রাতে খুঁজে বেড়াও একে...'

'আহ্লাদ দিয়ে মাথাটি খেয়েছে,' গজগজ করে ইগ্নাৎ, 'আনতেই হত না।'

হাইবুটের শব্দ করে অন্ধকার থেকে ছুটে আসে বাবা।

'দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে !' দূর থেকেই চেঁচায় সে।

'পরে, পরে ফিওদর,' বলে ইভান দানিলভিচ, 'এখন রাতের সময়, লোককে একটু ঘুমুতে দাও... ধন্যবাদ তোমায় সেপাই,' বলে সে হাকিমকে।

'এত সোর কেনে ?' জিজ্ঞেস করল হাকিম।

'এই শয়তানটাকে খুঁজছিলাম। ভেবেছিলাম বুঝি ডুবে গেছে। ছিল কোথায় ?'

'মিনারে এসেছিল। বলে সীমান্তরক্ষী হবে,' হাসে হাকিম।

'বাপ ওর সীমান্তরক্ষী হওয়া টের পাওয়াবে।'

সাশুককে বাড়ি নিয়ে আসে মা, খাটে শুইয়ে দেয়। বালিশে মাথা গুঁজে ভয়ানক ফুঁপিয়ে ওঠে সাশুক। কালকের পিটুনির ভয়ে নয়। তার শুধু কণ্ঠ যে স্টেনগান তার হাতে নেই, সবই স্বপ্ন দেখেছে সে।

জ্যোতিষী

কান গরম হয়ে উঠেছে সাশুকের। বাপ কান মলে দিয়েছে বলে নয় — রাতের মধ্যেই বাপের রাগ পড়ে এসেছিল, কান মলেছে তেমন জোরে নয়, শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য। আসলে সাশুককে নিয়ে ঠাট্টা করছে জেলেরা। আজ রবিবার, ভোরে সমুদ্রে যায় নি কেউ, বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রাতরাশের পর অনেকক্ষণ সবাই বসে থাকে টেবিলে, গল্প করে নানান রকম, তারপর আস্তে আস্তে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। মা-বাবা যাচ্ছে নিকলায়েভ্কা গ্রামে, কী সব কিনতে। অনেকটা পথ, সাশুককে তারা সঙ্গে নেয় না। বীমকে নিয়ে আঙিনায় ছুটোছুটি করে সাশুক, ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত গরমে আর হয়রানিতে জিভ বেরিয়ে পড়ে দু'জনেরই। তারপর তারাও যায় সমবায়-স্টোরে, গোটা ব্রিগেড সেখানে জুটেছে অনেক আগেই। দোকানটা রাস্তার ধারে, ব্রিগেডের ব্যারাক থেকে বিশেষ দূর নয়। দোকানের ওদিকে বালাবানভ্কা গাঁয়ের প্রথম বাড়িগুলো আলগা আলগা শেকলের মতো টানা। ওখানে সাশুক যায় না। প্রথমত মা বারণ করে দিয়েছে;

তাছাড়া দূর থেকেই সে ওখানে বড়ো বড়ো ছেলেপিলে আর কুকুরদের ছোটাছুটি করতে দেখেছে, তাই ভয় ছিল বীমকে ওরা জ্বালাতন করবে। ওকেও...

সমবায়-স্টোরটা সাধারণ কুটিরেরই মতো, শুধু সদর দরজার সামনে মস্ত চওড়া একটা অলিন্দ। তাতে কাঠের গুঁড়ির ওপর বসানো চারটে টেবিল আর বেঞ্চি। টেবিল ঘিরে বসেছে জেলেরা, আর মা যা বলে, 'চেরভোনে টানে'। সরু সরু বোতলে কালচে-লাল মদ এটা। বোতলের গায়ে আঁটা কাগজে প্রকান্ড পেয়ালা আঁকা। জেলেরা কিন্তু পেয়ালা থেকে নয়, খায় ম্যাড়মেড়ে গেলাস থেকে। অনেক খালি বোতল রয়েছে টেবিলে, তার মানে তারা 'চেরভোনে' বেশ 'টেনেছে', মুখগুলো হয়ে উঠেছে আরো লালচে, গলার স্বর হয়েছে বরাবরের চেয়েও আরো চড়া। আর সবার চেয়ে চেঁচিয়ে কথা কইছে স্বভাবতই জোর্কা। ওকে যে সবাই বাজখাঁই বলে সেটা খামোকা নয়। বলতে কি, কথা কইছে না সে, স্রেফ চেঁচাচ্ছে। কামিজ ওর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত খোলা, গলায় ফুটেছে মোটা মোটা শিরা।

'না তুই বল,' চেঁচাচ্ছিল সে ইগ্নাতের উদ্দেশে, 'সরকার যদি স্পুৎনিক গড়তে টাকা ঢালে তাতে তোর জ্বলুনি কিসের?'

ইগ্নাৎ মদ খায় না। তার সামনে গেলাসও নেই, বোতলও নেই, তাহলেও চাট খাচ্ছে সে: সঙ্গে নিয়ে আসা শুঁটকি স্তাভ্রিদা মাছ চুষছে।

'শুয়োর! তুই একটা আস্তো শুয়োর!' চেঁচায় জোর্কা, 'দেখিস শুধু নাকের সামনে কোনটা গেলা যাবে...'

'আমি সংসারী লোক,' বলে ইগ্নাৎ, ঠোঁট ওর কাঁপে, 'নিজের রোজগারে খাই, তোর মতো বাউণ্ডুলে নই। সংসারের কথা ভাবতে হয় আমায়।'

স্তাভ্রিদার অভুক্ত অংশটুকু সে পরিপাটী করে মুড়ে নেয় খবরের কাগজে। তারপর উঠে চলে যায়।

'ওর পেছনে লাগিস কেন বল তো,' জিজ্ঞেস করে ইভান দানিলভিচ, 'ক্ষেপাস কেন?'

'কিপটেগুলোকে দেখতে পারি না। ও নিজের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত খেয়ে নিতে রাজী।'

'তা খাক, তোকে দিয়ে না খাওয়ালেই হল। তাছাড়া চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'আমার গলার আওয়াজই যে ওই রকম, সেটা আমার দোষ?'

'তোর গলাটা নয়, চেঁচাচ্ছে তোর ভেতরকার চেরভোনে... কী কথা দিয়েছিলি? বুকের ওপর তোর অমন পরিষ্কার একটা প্রচারপত্র — সেটা একটু ঘন ঘন দেখিস।'

কামিজের কলারে হাত দেয় জোর্কা, সবারই নজরে পড়ে তার বুকের ওপর নীল ফুটকি দিয়ে আঁকা উল্কি, ওপরে শিরোনামা — 'আমাদের সর্বনাশের কারণ'। হেসে ওঠে সবাই, ক্ষেপে ওঠে জোর্কা, তবে সামলে নিয়ে হাত নাড়ে।

'ঠিক আছে দানিলভিচ, এই শেষ। যাই গিয়ে ঘুমই গে... এই সারেঙ!' অন্য বিষয়ে

কথা কইতে পেয়ে সে স্পষ্টই খুশি হয়ে উঠল, 'কি, কান এখনো টিকে আছে, নাকি একেবারেই ছিঁড়ে নিয়েছে তোর বাপ? নাহ্, গোটাই আছে দেখছি। এবার ফন্‌ফন্ করে বেড়ে যাবে... আরে, ঠোঁট ফোলাস নে, তার চেয়ে বল, সীমান্তরক্ষীদের কাছে রাতে গেলি কেমন করে? ভয় করে নি?'

'উঁহুঁ! এমন কি মড়াগুলোতেও ভয় পাই নি।'

'কিসের মড়া?'

'মানে ফ্যাসিস্টদের পিল-বক্সে যেগুলো রয়েছে।'

'তুই দেখেছিস?'

'দেখি নি মানে? দেখেছি বই কি।'

এখন ওর সত্যি সত্যিই মনে হয় যেন রাত্রে স্বচক্ষে সে মরা ফ্যাসিস্টদের দেখেছিল, ইচ্ছে হয় বলে কেমন তারা দেখতে, কিন্তু এমন হো-হো করে হেসে উঠল জেলেরা যে ও চুপ করে গিয়ে নেমে আসে বেঞ্চি থেকে। আহতভাবে বলে:

'তোমরা ভারি ইয়ে! তাতে আবার অমন বুড়ো বুড়ো লোক... চল বীম, যাই।'

কয়েক পা যেতেই তার সঙ্গ ধরে জোর্‌কা।

'শোন তুই,' বলে সে জড়িয়ে জড়িয়ে, 'রাগ করিস না। ভারি তো কাণ্ড — একটুখানি হেসেছে। তাতে আর তুই মরে যাচ্ছিস না... চল, সকালে তোর জন্যে একটা উপহার জোগাড় করেছি, তবে তখন তুই ঘুমুচ্ছিলি।'

চুপ করে থাকে সাশুক। রেগে গিয়ে ও এমনকি বলেই দিতে যাচ্ছিল তোয়াজ করতে হবে না, ওকে নিয়ে যখন হাসাহাসি করেছে তখন উপহার তার দরকার নেই। কিন্তু কী উপহার জোগাড় করেছে জোর্‌কা সেটা জানতেও ইচ্ছে হয় তার, তাই চুপ করে থাকে। উপহার যদি তেমন না হয়, তাহলে কথাটা সে পরেও শুনিয়ে দিতে পারবে।

ব্রিগেডের ব্যারাকে তার খোলা বাক্সের ওপর ঝুঁকে ছিল ইগ্নাৎ।

'লাখ টাকা গুনে দেখছিস?' তাকে লক্ষ করে বলে জোর্‌কা।

জবাব না দিয়ে ইগ্নাৎ পিঠ দিয়ে সিন্দুকটা আড়াল করে।

নিজের বাঙ্কের তলে উঁকি দেয় জোর্‌কা, চিন্তিতভাবে মাথা চুলকায়।

'ওহো, আমি যে ওটা আঙিনায় লুকিয়ে রেখেছি...'

আঙিনার কোণে পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া জালের স্তূপের তল থেকে সে বার করলে মিহি জালে মোড়া একটা কাচের গোলক। প্রকাণ্ড বড়ো গোলকটা — সাশুকের মাথার সমান। হয়ত বা আরো বড়ো। উল্লাসে আড়ষ্ট হয়ে যায় সাশুক, সাবধানে গোলকটা নেয় হাতে। জিনিসটা খসখসে, ক্ষুদে ক্ষুদে শুকনো গুগলি লেগে আছে তাতে, শক্ত হয়ে ওঠা জালটা কাচের গায়ে বসানো। নুন আর সমুদ্রের কড়া গন্ধ উঠছে গোলকটা থেকে।

'কী, পছন্দ হচ্ছে ?'

'সে আর বলতে ! কিন্তু কী জিনিস এটা ?'

'কুর্খতিল। জালের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ওপরে ভাসে, তাতে জাল তলিয়ে যায় না।'

'কোথায় পেলে ?'

'সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে আসে। আমি কুড়িয়ে নিই। আরেকটা এই জিনিস পেলে দড়িতে বেঁধে যেখানে খুশি ভেসে যাওয়া যায়।'

'হোই দূরে ?'

'বলছি তো যেখানে খুশি।'

জোর্কা চলে যায় নাক ডাকাতে। আর সাশুক সযতনে কুর্খতিলটাকে নিয়ে আসে চালার নিচে, খাবারের টেবিলের ওপর রেখে চারপাশ থেকে তা লক্ষ করতে থাকে। কাচটা পুরু, সবজেটে। ওই ভাবেই বানানো, নাকি সমুদ্রে ভেসে ভেসে সবুজ হয়ে গেছে ?.. মাঝখানটায় কিছু আছে হয়ত ? কিন্তু মাঝখানটা দেখা খুবই কঠিন — জালটা মিহি, খুদে খুদে গুগলিতে ভরাট। এমন এঁটে বসেছে সেগুলো যে কিছুতেই খসানো যায় না। নখ ভেঙে গেল, কিন্তু একটিকেও ছাড়ানো গেল না...

দরজায় দেখা দেয় ইগ্নাৎ প্রিখদ্কো। এগিয়ে এসে সে কুর্খতিলটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

'কোনো কাজে লাগবে না। তবে... আধাআধি চিরতে পারলে বাটির মতো দাঁড়াবে।'

'দিয়ে দাও আমায়,' বলে সাশুক, 'বাটি আমার দরকার নেই। কুর্খতিলই আমার দরকার, সাঁতরাব।'

'যত আবদার,' বলে নিশ্বাস ফেলে ইগ্নাৎ, 'কেউ দেখবার নেই, বুনো ওল হয়ে বেড়ে উঠবি...'

'আচ্ছা ইগ্নাৎ খুড়ো,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে সাশুক, 'কুগুৎ কাকে বলে ?'

'মানে... ধনী চাষীর মতো আর কি, লোভী কঞ্জুস।'

'আচ্ছা, সত্যিই তুমি লোভী কঞ্জুস ?'

'কে এসব তোকে শেখাচ্ছে ?'

'কেউ শেখায় নি। শুধু জোর্কা বলছিল তুমি কুগুৎ।'

'কান দিবি না বলছি ওর কথায়, হাঁদারাম। কোনো মঙ্গল হবে না ওকে দিয়ে। বরং নিজের পায়ে দাঁড়ানো সংসারী লোকেদের দিকে তাকা, তাদের দৃষ্টান্ত নে।'

'যেমন তুমি ?'

'যেমন আমি। আরো অনেকে। যারা চুপচাপ থাকে, ভবিষ্যতের কথা ভাবে। এখনো তুই ছোটো, তাহলেও ভেবে দেখতে হয়। যেমন এই বাজখাঁইটাকে ধর। কী হবে ওকে দিয়ে ?

বকবকি-ফক্কাড়ি, দিন কাটায় লক্ষ্মীছাড়ার মতো। ঘর নেই দোর নেই, বাড়তি এক জোড়া প্যান্ট পর্যন্ত নেই...'

সেটা সাশুক জানে। জোর্কোর যাকিছু সম্পত্তি সবই এঁটে যায় একটা ভাঙা স্যুটকেসে, তাতে চাবিও সে দেয় না। সত্যি, কী দরকার চাবি দেবার, আধখানা স্যুটকেসই খালি। জীর্ণ কামিজ আর এক জোড়া ইজের ছাড়া কিছুই তাতে নেই। আর ইগ্নাতের ট্রাঙ্কটা পরিপাটী, মজবুত। কী তাতে আছে সাশুক দেখে নি, কেননা সর্বদাই তাতে তালা ঝোলে। যদি কখনো বা ইগ্নাৎ তা খোলে, তাহলেও এমনভাবে পিঠ দিয়ে আড়াল করে যে কিছুই দেখা যায় না।

'ওই বাজখাঁইটা,' বলে যায় ইগ্নাৎ, 'নেহাৎ অকেজো লোক। যা রোজগার করলে, ধর, সবই মদ খেয়ে, উড়িয়ে দিলে। কী জন্যে যে বেঁচে আছে কে জানে।'

'কিন্তু কীসের জন্যে লোকের বেঁচে থাকা উচিত?'

'কাজে লাগার জন্যে। সমস্ত জিনিসপত্র, সব মানুষকেও কাজে লাগতে হবে।'

'আমাকেও?'

'মানে, এখনো পর্যন্ত তোর কাজে লাগা আর পাঁঠার দুধ দোয়া সমান কথা, মিছেই রুটি গিলছিস। এখনো তুই তোর কুকুরছানাটার মতোই অবোধ। অথচ ছোটো থেকেই নিজেরটা বুঝে নিতে শেখা দরকার।'

শেষ কথাটা সাশুক আর শোনে না। বলে:

'যাক গে আমরা নয় অকেজোই হলাম...'

কুর্খতিল সে ঘরে নিয়ে আসে, ঢুকিয়ে দেয় খাটিয়ার নিচে, ন্যাতাকানি চাপায় ওপরে যাতে কেউ না দেখতে পায়। এরপর কী করবে সে? মা-বাপ শীগগির আসবে না, এলেও কী লাভ? মা লাগবে রান্নায়, বাবা চলে যাবে দোকানে, জেলেদের কাছে। সাশুকও দোকানে যাবে নাকি? ফের হাসাহাসি শুরু হবে। বেশ হত জোর্কোর সঙ্গে চান করতে গেলে — ওর ঘাড়ে চেপে জলে সেই ঝাঁপ — ভয় ভয় করে, তাহলেও কী আনন্দ। তবে পার্টিশানের ওপাশে জোর্কো এমন নাক ডাকাচ্ছে যে গোটা ব্যারাক কাঁপছে। জাগানো তো চলে না...

জেটিতে যায় সাশুক। কাজ বন্ধ, কনভেয়র অচল, মাছের বাক্সগুলো খালি। জেটিতে বাঁধা নৌকোগুলো দুলছে, ধাক্কা খাচ্ছে। নৌকোয় ঢেউয়ের দুলুনি খেলে মন্দ হত না। কিন্তু ভয় হয় সাশুকের, লাফিয়ে নৌকো পর্যন্ত পেঁছিতে পারবে না হয়ত। খাড়াই পাড় বরাবর বালির সরু ফালিটায় জনপ্রাণী নেই। গাংচিলগুলো পর্যন্ত কোথায় যেন হাওয়া হয়েছে। হঠাৎ খেয়াল হয় সাশুকের — আরো একটা কুর্খতিল যদি ভেসে এসে থাকে সমুদ্রে?.. জোর্কো যখন পেয়েছে, তখন সেও পেয়ে যাবে হয়ত?

পা টেনে ধরে ঝুরঝুরে বালিতে, রোদে তেতে ওঠা খাড়াই পাড়টার গা থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। জলের কিনারায় যায় সাশুক। নিবিড় ভেজা বালি, থেকে থেকেই তপ্ত ঢেউ ধুয়ে

দেয় পা। সমুদ্র যা তীরে এনে ফেলেছে, সব খুঁটিয়ে দেখে সাশুক। বাদামী শেওলা আর যত রাজ্যের আবর্জনা ছাড়া কিছুই সেখানে নেই। ফলে খুবই একঘেয়ে লাগত, কিন্তু মাঝে মাঝেই ঢেউয়ে পিরিচের মতো ছোটো ছোটো জেলি মাছ এনে ফেলছিল তীরে। সাশুক ফুটবল খেলে তাদের নিয়ে। জেলি মাছ সম্পর্কে ওর ভয় ভেঙে দিয়েছে জোর্কা, শিখিয়ে দিয়েছে কোনগুলো গায়ে ঠেকলে জ্বালা করে, কোনগুলোতে করে না।

সীমান্ত মিনারের কাছে এসে সাশুক মাথা তুলে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। দেখা যায় না সীমান্তরক্ষীদের। লুকিয়ে আছে, নাকি দিনের বেলা ওরা আদৌ থাকে না?

তীর এখানে বেঁকে গেছে, জেটিটা একেবারে ছোট্ট হয়ে লুকিয়ে যায় বাঁকের এপাশে। পা ধরে আসে সাশুকের, তাহলেও একগুঁয়ের মতো সে এগোয়: আশা সে ছাড়ে নি, কুর্খাতিল না পেলেও অন্য কিছুও তো পেয়ে যেতে পারে।

পেয়েও গেল। শুকনো বালিতে পা আর দাঁড়া ছড়িয়ে রোদে পেট পেতে চিত হয়ে পড়ে আছে একটা মস্ত কাঁকড়া। সাশুক দেখেছে শুধু জীবন্তগুলোকে, চোরের মতো তারা চুপি চুপি পাশকে হয়ে এসে মাছের ঢিপ থেকে পালাবার চেষ্টা করে আর জেলেরা খপ করে তাদের ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জলে। এটা পড়ে আছে নিশ্চল হয়ে, সাশুক তার ওপর খানিকটা শুকনো শেওলা ফেললেও নড়ল না। কাঠি দিয়ে সাশুক নাড়ে ওটাকে, উপুড় করে দেয়। কিলবিলিয়ে কী সব পোকা ছুটে পালায় কাঁকড়াটা থেকে। সাবধানে খোলটা ধরে সাশুক ওকে জলে চুবায়। কাঁকড়া কিন্তু বেঁচে ওঠে না। প্রকাণ্ড কাঁকড়া — শুধু খোলটাই সাশুকের তালুর চেয়ে বড়ো। আর দাঁড়াগুলো এমন যে কামড়ালে রক্ষা নেই। সাশুক ওটাকে ছুড়ে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মত পালটায়। ওটাকে যদি ভালোমতো শুকিয়ে বাক্সে করে নেক্রাসভ্কায় নিয়ে যাওয়া যায়... সন্তর্পণে সে কাঁকড়াটাকে কামিজের ভেতর বুকের কাছে ঢুকিয়ে ফিরতি পথ ধরে।

মোড়ের পর মাঝ পথে একটা মানুষ। কেমন খাপছাড়া। পরনে ইজের, গায়ে ছবি-আঁকা একটা শার্ট। মাথায় কানাওয়ালা একটা ঝাঁকড়া টুপি, নাকে মোটা কাচের চশমা। মুখখানা অল্প বয়স্ক, মোচ নেই, কিন্তু গালে আর থুতনিতে ছোটো ছোটো দাড়ি। হাতে ছিপ ধরে আছে পাগলাটা, ফাতনার দিকে এমন একদৃষ্টে চেয়ে আছে যে সাশুকের আসা, থামা, তারপর তার পেছনে বসা — কিছুই সে খেয়াল করে না। ঢেউয়ে ফাতনাটা নড়ছে, হঠাৎ ডুবে গেল। ঘাই মারল পাগলা, বড়শি থেকে খসে টুপ করে জলে পড়ল একটা ছোট্ট কাঁকড়া।

‘চোট্টা, ডাকু,’ খালি বড়শিটা দেখে বিনা রাগেই বকে যায় লোকটা, ‘দুনিয়ার তলানি বললেও তোদের গাল দেওয়া হয় না, কেননা ঐটেই তোদের স্বাভাবিক অবস্থা...’

পেছনে রাখা টিনের কৌটোটা নেবার জন্য ফিরতেই দেখতে পায় সাশুককে।

‘জানতাম না যে আমি আবার শ্রোতাও পেয়ে গেছি। কোত্থেকে আসা হল, ছাল-তোলা-নাক যাদুমণি?’

'রোদে পুড়ে হয়েছে,' ব্যাখ্যা দিয়ে তার খোসা-ওঠা নাকে আঙুল বুলোয় সাশুক।

'কোনো সন্দেহ নেই, কোনো সন্দেহ নেই...' বলতে বলতে কৌটোটা হাতড়ায় লোকটা। 'ওরে ছোকরা !'

'আমায় ডাকছেন ?'

'নয়ত কাকে ? আমাদের দু'জনের মধ্যে তুই নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে ছোকরা। এতেও সন্দেহ নেই যে তুই এখানকার লোক। শোন, ডুবুরি দস্যিগুলো আমার সব টোপ খেয়ে শেষ করেছে। বলতে পারিস, কোথায় কেঁচো পাওয়া যাবে ?'

'কেঁচো ? সে খুঁড়তেও হবে না। সবখানেই রয়েছে।'

'সবখানে মানে ?'

'এইত...'

উবু হয়ে বসে সাশুক কিনারা থেকে মুঠো মুঠো ভেজা বালি তুলতে লাগল। কিলবিলিয়ে উঠল কয়েকটা হলদে আভার লালচে কেঁচো।

'আরে ! তুই দেখছি দিব্যি ওয়াকিবহাল।'

'এই দেখুন, এই দেখুন...' অন্য আরেকটা জায়গায় বালি তুলতে তুলতে বলে সাশুক, 'হাজারে হাজারে।'

'দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তার চেয়েও বেশি... ধন্যবাদ তোর বিদ্যের জন্যে। এবার আর আমায় আদৌ গোবর খুঁজে বেড়াতে হবে না।'

'কিছু ধরতে পেরেছেন ?'

'বড়াই করবার মতো নয়। একটা বিটকেলেকে ধরেছি, কিন্তু এমন বিষাক্ত তার রঙ যে সন্দেহ আছে সর্বভুক বেড়ালও তা খাবে কিনা।'

মাছটা বের করে সে দেখায়। সাশুক বলে:

'এটা জেলেনুশকা। বেড়ালে খাবে।'

'মেহনত আমার তাহলে বৃথা যায় নি... তাহলে চালানো যাক,' বলে ছিপ ফেলে পাগলাটা, 'তা লোকটা তুই কে ? কোত্থেকে আসছিস ?'

'কোত্থেকেও আসছি না, এইখেনেই থাকি।'

'আনন্দের কথা, আনন্দের কথা,' বলে ফের ঘাই মারে পাগলা, ফের দেখা যায় বড়শি খালি, 'তা মোটের ওপর এ জায়গাটা কেমন ?'

'ভালো।'

'কী ভালো ?'

'সবই ভালো,' কী জানতে চাইছে তা বুঝতে না পারে বলে সাশুক।

'বেশ, তাহলে দেখা যাবে, দেখা যাবে...' টোপ গাঁথতে গাঁথতে বকবক করে লোকটা।

অনেকক্ষণ দ্বিধার পর সাশ্নক শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেসই করে ফেলে।

'আচ্ছা, দাড়ি রেখেছেন কী জন্যে ?'

'কেন খুব খারাপ দেখাচ্ছে ?'

'তা নয়। যারা দাড়ি রাখে তারা ইজের পরে বেড়ায় না।'

'তাই নাকি ?' নিজের শর্টসের দিকে একবার তাকিয়ে বলে লোকটা, 'সেটা তো আমি ঠিক ভেবে দেখি নি। তবে দাড়ি আমায় রাখতেই হবে। সব জ্যোতিষীই নুর, দাড়ি, এমনকি ইম্না-দাড়ি পর্যন্ত রেখেছে। আমিও রাখলাম, ভারিক্কী দেখাবে, সুন্দরও বটে।'

'আপনি জ্যোতিষী নাকি ?' ঠিক বিশ্বাস হয় না সাশ্নকের।

'পুরো নয়, তবে সেই জাতের। জ্যোতিপদার্থবিদ্যা বলে একটা বিজ্ঞান আছে। শুনেছিস কখনো ? তবে এখনো তোর বয়স কম... আর মহাকাশের কথা ?'

'মহাকাশ আমি জানি,' বলে সাশ্নক, 'গাগারিন সেখানে উড়েছিল।'

'হ্যাঁ, গাগারিন উড়েছিল, বলা যায়, কাছাকাছি। আর আমার কারবার আরো দূরের জিনিস নিয়ে...'

'সেটা করেন কোথায়, এখানে ?'

'আরে না, এখানে নয়। এখানে আমার পরিবার নিয়ে এসেছি সমুদ্রে চোবাবার জন্যে। ওই ওখানে রোদে ভাজা হচ্ছে।'

দূরে চাদর দিয়ে টাঙানো একটা তাঁবুর নিচে কে যেন শুয়ে আছে, কিন্তু কেবল এক পলক সেদিকে তাকায় সাশ্নক। পরিবারে ওর আগ্রহ নেই। পাগলাটার আরো কাছে করে বসে সে। জীবন্ত জ্যোতিষী তো আর হামেশা দেখা যায় না।

আনুস্যা

'আচ্ছা, তারাগুলোকে আপনি গোনেন কী করে ?' জিজ্ঞেস করে সাশ্নক।

'আমি গুনি না, গবেষণা করি। সব তারার গোনা-গুনতি হয়ে গেছে একেবারে লাইনবন্দী সৈন্যদের মতো।'

'একেবারে শেষ তারাটি পর্যন্ত ?'

'একেবারে শেষটি পর্যন্ত। অবিশ্যি যতটা সম্ভব, তার মধ্যে।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সাশ্নক নিচু থেকে তাকায় তার চোখের দিকে, কিন্তু বিনা ফ্রেমের মোটা কাচে চোখ তার ঢাকা, বোঝা যায় না লোকটা সত্যি বলছে নাকি তামাশা করছে। অনেকক্ষণ ভাবে সাশ্নক, তারপর বহুদিন তাকে যে প্রশ্নটা ভাবিয়েছে সেইটেই শেষ পর্যন্ত করে বসে:

'আচ্ছা সত্যি, প্রত্যেক লোকের নিজস্ব এক একটা তারা আছে? যেই জন্মায় অমনি সে তারা ফুটে ওঠে? যেই মরে যায়, তারাও খসে পড়ে?..'

'বাজে কথা। তারা কখনো খসে পড়ে না। খসে পড়ে যাকে বলে, জঞ্জাল, যতরকমের মহাজাগতিক আবর্জনা। তাছাড়া পৃথিবীর মানুষের চেয়ে তারারা অনেক বড়ো। মানুষ নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই... অবিশ্যি সাধারণভাবে, রূপক হিসেবে... এক অর্থে প্রত্যেক লোকেরই নিজস্ব তারা আছে। অন্তত থাকা উচিত।'

'আমারও আছে?'

'তোরও। অন্যের চেয়ে তুই কম কীসে?'

'কোথায় সে তারাটা, দেখাবেন আমায়?'

'উঁহুঁ, সেটি হচ্ছে না। প্রত্যেককে তার নিজের তারা খুঁজে বার করতে হবে নিজেকেই।'

'কী ভাবে?'

'কী করে তোকে বোঝাই!.. প্রথম কথা, কুঁড়েমি করা চলবে না। যেমন, শুরুতে সকাল সকাল ওঠা অভ্যেস করা ভালো।'

'ফরসা হবার আগেই?'

'তাহলে তো কথাই নেই।'

'কিন্তু ঘুম পায় যে!'

'ওই তো, আলসেমি! কেউ কেউ শুধু তারা খোঁজা তো দূরের কথা, গোটা জীবনই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। অথচ, দুঃখের কথা হলেও জীবন তো মোটের ওপর ছোটোই।'

'আর যদি ভোর ভোর উঠি, সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাব?'

'হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই নয়, তবে একদিন না একদিন দেখবি।'

'তারপর?'

'তারপর মানে?'

'দেখার পর কী হবে?'

'মানে... জানতে পারবি কোনদিকে যাবি, কী করতে হবে... ওহো, এবার আমার আদরের মেয়েটি আমার শেষ মাছটিকেও ভাগাবে দেখছি...'

নীল ফ্রক আর শাদা পানামা-টুপি পরা একটি মেয়ে ছুটে আসে জল ছিটকিয়ে।

'বাবা, কত মাছ ধরলে?' দূর থেকেই চেঁচায় সে, পরে সাশুককে দেখে চুপ করে যায়, ছোটা থামিয়ে হাঁটে, পা ফেলে নিরীহ প্রায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, ভাব করে যেন সাশুককে দেখতেই পায় নি।

'ন্যাকামি রাখ তো,' বলে বাবা, 'দেখছিস, এই বিজন তীরেও ডন জুয়ান পাওয়া গেল তোর জন্যে,' সাশুককে দেখায় সে।

'মোটেই আমি ডন নই,' বলে সাশ্রুক, 'আমি সাশ্রুক।'

'আনন্দের কথা,' বলে দেড়েল, 'তাহলে আলাপ করে নাও।'

টুপি বাঁধার রবারের ফিতেটা টেনে কৌতূহলে সাশ্রুককে দেখতে থাকে মেয়েটি। সশব্দে ফিতেটা এসে লাগে তার থুতনিতে। তারপর ছোট্ট পাটার মতো সুগঠিত হাতটা বাড়িয়ে বলে:

'আমি আনুস্যা।'

আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে সাশ্রুক, আড়চোখে তাকায় হাতখানার দিকে, পরে দেখে আনুস্যাকে। মেয়েটি একেবারেই অন্যরকম, যেন ভিন্ন এক জগতের লোক। সাশ্রুক ভেবে পায় না কী সে করবে, কী ভাবে চলা উচিত, তাই নিশ্চল হয়ে বসে থাকে আর তাকায়।

মেয়েটি মুখ কোঁচকায়, কাঁধ ঝাঁকায়, তারপর ফের টানাটানি করে টুপির ফিতেটা।

'মহিলার প্রতি খুব একটা সৌজন্য দেখালি, তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না,' বলে দেড়েল।

হেসে ওঠে মেয়েটি, ছোট্ট নাকটা তার কুঁচকে যায়। সাশ্রুক কিছুই বুঝতে না পারলেও লাল হয়ে ওঠে। প্রথমে তার ইচ্ছে হয়েছিল বলে যে মেয়েদের সঙ্গে সে মেশে না, কিন্তু কেন জানি গলা দিয়ে কথাটা বেরয় না। মোটেই মেয়েটি নেক্রাসভ্‌কার চিল্লানে তুখোড় মেয়েগুলোর মতো নয় বলেই হয়ত। অত শাদা কেন ও? হয়ত দিন রাত্তির সাবান ঘষে...

কী করবে ভেবে পায় না সাশ্রুক, শুধু আরো বেশি করে লাল হয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার, বুকের তল থেকে বার করে আনে তার আবিষ্কার।

'নে, নিবি?'

এক পা পিছিয়ে যায় আনুস্যা, গোল হয়ে ওঠে তার ধূসর-নীল চোখ।

'কী এটা?'

'কাঁকড়া। নে, ভয় নেই, মরা, কামড়াবে না।'

'না, নেব না,' পিঠের পেছনে হাত গুটিয়ে নিয়ে বলে আনুস্যা, 'বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছে।'

'তাতে কী হল, কিছু গন্ধ ছেড়ে থেমে যাবে।'

'কাঁকড়া মোটেই অমন হয় না,' মাথা নাড়ে আনুস্যা, 'কাঁকড়া থাকে কৌটোয়।'

'লজ্জা হওয়া উচিত,' বলে বাবা। ওদের দিকে তাকায় নি সে, কিন্তু দেখা গেল সবই সে দেখেছে, শুনেছে। 'কৌটোয় থাকে সেদ্ধ কাঁকড়া। আর এটা স্রেফ সমুদ্র থেকে। তোর যা খুশি, আমি হলে কিন্তু নিতাম। আমার মতে দামী জিনিস।'

বাপের দিকে তাকিয়ে আনুস্যা সন্তর্পণে কাঁকড়াটা নেয় দুই আঙুলে।

'যাও হে শ্রীমান শ্রীমতীরা, একটু ছোটাছুটি করে নেবে নাকি?' বলে আনুস্যার বাবা, 'এক ঢিলে দুই পাখি: নিজেদের মধ্যে ভাবও করে নেবে, আমার ওপর থেকেও গুরুগিরির পাথরটা নেমে গিয়ে বুক হালকা হবে।'

'কীসের পাথর?' চলে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে সাশ্রুক।

'ওর কথায় কান দিস না,' বলে আনুস্যা, 'সব সময়েই খানিকটা অদ্ভুত করে ও কথা বলে।'

কাঁকড়াটা তার ক্রমেই ভালো লাগতে শুরু করেছে। গন্ধে আর বিতৃষ্ণা লাগে না, কণ্টকিত বিটকেলেটাকে সে নাড়াচাড়া করে হাতে, সব দিক থেকে লক্ষ করে সেটাকে। তারপর সমান মনোযোগে লক্ষ করতে থাকে সাশুককে।

'সব সময় তুই এমনি ভাবে বেড়াস?' সাশুকের রোদপোড়া ঝুঁটির দিকে দেখায় সে, 'কিছু হয় না?'

'কী হবে?'

'আর আমার পক্ষে রোদ নাকি ভালো নয়, পলকা শরীর আমার,' নিশ্বাস ফেলে আনুস্যা।

'তুই তো আর মাখন নস, গলে যাবি না।'

খানিকটা দ্বিধা করে আনুস্যা, তারপর দৃঢ়ভাবেই তার পানামা-টুপি ঠেলে দেয় পেছনে, ফিতের সঙ্গে তা ঝুলতে থাকে পিঠের ওপর। সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস এসে তার শণরঙা ঢেউ-খেলা চুল উড়িয়ে দেয়।

'চল, মাকে গিয়ে দেখাই,' বলে আনুস্যা।

ছোটে ওরা ভেজা বালির ওপর দিয়ে। ঢেউ এসে ভেঙে পড়তে না পড়তেই সাশুক প্রাণপণে লাথি মেরে তা ভেঙে দেয়। আনুস্যারও খেলাটা মনে ধরে। সাশুকের আগে আগে ছুটে যায় সে, তার লাথিতে জল বেশি ছিটকে উঠলে বিজয়গর্বে চেঁচায়। সাশুকও ছাড়ে না। বেশি চটপটে সে, জলের ছিটকানি তার ওঠে বেশি, ছড়ায় অনেক দূর। এইভাবেই তারা পাল্লা দিয়ে ছোটে, জল ছিটায়, চেঁচায় উল্লাসে, তারপর থেমে যায় একটা চিৎকারে।

'কী হচ্ছে এসব?'

লাঠিতে টাঙানো চাদরটার তল থেকে তাকিয়ে দেখছে একটি মেয়ে। প্রথমে সাশুকের মনে হয়েছিল মেয়েটি একেবারে ন্যাংটা। পরে চোখে পড়ে, একেবারে নয়। গায়ের ওপর দু'টুকরো রঙচঙে ছিট বাঁধা আছে আড়াআড়ি, আর মাথায় তোয়ালে জড়ানো। খুবই সুন্দরী মেয়েটি, সাশুক সেটা বেশ দেখতে পাচ্ছে, যদিও বড়োসড়ো কালো চশমায় চোখ তার ঢাকা, নাকের ওপর কাগজের ঢাকনি, শাদামতো কী একটা জিনিস দিয়ে মুখ মাখা, আর ঠোঁট এমন টকটকে লাল যেন কাঁচা চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে কেউ। তবে সাশুক জানে যে চামড়াটামড়া তোলা হয় নি, স্রেফ রঙ করা ঠোঁট। নেক্রাসভ্‌কাতেও কিছু কিছু বড়ো মেয়ে ঠোঁট রাঙায়।

'মা, মা-মণি!' চেঁচায় আনুস্যা, 'দ্যাখো কী পেয়েছি!'

'কোত্থেকে জোটালি এই ভনভনে মাকড়টাকে?' বলে ঘেন্নায় কাঁকড়া কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় আনুস্যার মা।

পাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কাঁকড়া যখন বালিতে পড়ল তখন তার আর পা-দাঁড়া কিছু নেই। আতঙ্কে হাত জড়ো করে আনুস্যা, কিন্তু মা তাকে কথাটি বলতে দেয় না।

'আর টুপি খুলেছিস কেন ? কী ছিরি হয়েছে ! লজ্জাও নেই, ধাড়ী মেয়ে, আর গা ভিজিয়ে এসেছে খুকির মতো ! এক্ষুনি চলে আয় !' গলা নামায় সে, কিন্তু স্পষ্ট কানে যায় সাশুকের: 'ওই নোংরা ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিস কী করতে ? দেখছিস না নাকে ওর একটা যেন ঘা... ছোঁয়াচে রোগ জোটাবি শেষে।'

'মোটেই ও নোংরা নয়,' আপত্তি করে আনুস্যা, 'ও যে বাবার সঙ্গে ছিল...'

বাকিটা আর সাশুক শোনে না। মুঠো করা হাত পকেটে ঢুকিয়ে সে ফিরে চলে যায়। কান ওর ফের গরম হয়ে উঠেছে। অপমানে। এবার আর আনন্দ করে নয়, আক্রোশে সে লাথি মারে ঢেউগুলোর মাথায়। ফোয়ারা তুলে তা ছিটকে যায়, কিন্তু যতই মারুক, কেবলি ছুটে আসে নতুন নতুন ঢেউ। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা — মহিলাটির এতে কিছুই এসে যাবে না। এখন আর তাকে সুন্দরী মনে হয় না সাশুকের। ভূতের মতো কী সব মেখেছে মুখে। পাড়ের ওপর উঠে একটা চাঙর খসিয়ে দিতে হয় দড়াম করে কিংবা একটা বড়ো জেলি মাছ নিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয় ওর কামিজের মধ্যে। না, কামিজের মধ্যে নয়, কামিজ ওর যখন নেই, তখন যেসব ন্যাতা বেঁধেছে গায়ে তার মধ্যে...

দিনটা গরম, বাতাসও জোরালো নয়, তীরে গিজগিজ করছে জেলি মাছ। পিরিচের মতো ছোটো ছোটো, থালার মতো চওড়া, আবার বালতির মতো ধুমসো, সবই আছে। জলে নামে সাশুক, অমনি একটা ন্যালনেলে ঠাণ্ডা বালতি ধরে বহু কষ্টে তীরে নিয়ে আসে। ফুলে ওঠে জেলি মাছটা, গায়ের শাদাটে জেলি বেরিয়ে আসে, জলে ভাসিয়ে দেয়। আরো, আরো, আরো জেলি মাছ ধরে সাশুক... বেড়ে ওঠে শাদাটে জেলির স্তূপ। তা দিয়ে বজ্জাত মাগীটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া যায়, কিন্তু কেবলি নতুন নতুন শিকার টেনে তুলছে সাশুক।

'এটা কী করছিস রে ?'

পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে আনুস্যা, টুপির ফিতে টানছে।

'আমার সঙ্গে মেশা যে তোর বারণ, চলে যা...' জবাব না দিয়ে বলে সাশুক।

'আমি মিশব,' বলে আনুস্যা। 'তুই মায়ের ওপর রাগ করেছিস, তাই না ? ওর কথায় কান দিস না, বাবা বলে, ভুরি ভুরি পেটিবুর্জোয়া কুসংস্কার আছে ওর ভেতর,' একেবারে বড়োদের মতো কথা বলে আনুস্যা। 'এটা অবশ্য একটা ভয়ঙ্কর দোষ, কিন্তু কী করা যাবে, কিছু না কিছু দোষ সকলেরই তো থাকে। তোরও আছে ?'

এ কথাটা সাশুক কখনো ভাবে নি, আর এখন ভেবে ভেবেও কোনো দোষ সে খুঁজে পেল না। তাই কোনো জবাব না দিয়ে সে জেলি মাছ ধরেই চলল।

'কী করবি ওগুলো দিয়ে ?'

'স্যুপ রাঁধব, ননীর পুতুলদের খাওয়াব,' মনের সমস্ত ঝাল ঝেড়ে বলে সাশুক, আনুস্যা কিন্তু সেটা গায়ে মাখে না, জলে নেমে ছোট্ট একটা জেলি মাছ ধরেই সঙ্গে সঙ্গে ঘেন্নায় ছেড়ে দেয়।

'ইস, কী বিচ্ছিরি!'

'হুঁ, হুঁ, আঁতকে গেলি তো?' বিজয়গর্বে বলে সাশুক, 'পালা তোর মা-মণির কাছে, এখানে তোর করার কিছু নেই...'

'মা ঘুমিয়ে পড়েছে,' বলে বেগুনী রঙের কানাওয়ালা একটা বড়ো গোলাপী জেলি মাছ ধরতে যায় আনুস্যা।

'ছুঁস না, ওটা বিষাক্ত!' চেঁচিয়ে ওঠে সাশুক।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। জ্বলুনি ধরা হাত টেনে নেয় আনুস্যা, মুখে ওর ফুটে ওঠে আতঙ্ক আর যন্ত্রণা।

'বললাম ছুঁস না। বিছুটির চেয়েও ওগুলো খারাপ, জ্বালা করে। লাগছে?'

'পোড়াচ্ছে,' ফিসফিসিয়ে বলে আনুস্যা।

ছোট্ট নাকখানা তার কুঁচকে আসে, তবে এবার সেটা হাসির জন্যে নয়, পড়ো-পড়ো চোখের জলে। জ্বালা ধরা হাতখানা সে দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে ঘন ঘন চোখের পাতা নেড়ে কান্না ঠেকায়।

'ভয় নেই, কিছু হবে না,' সান্ত্বনা দেয় সাশুক, 'প্রথমবার যখন আমি ছুঁই অনেক বেশি জ্বালা করেছিল। গোটা পেটটা!'

কিন্তু এ সংবাদে আনুস্যার জ্বালা কমল না। নাকটা তার আরো বেশি করে কোঁচকায়, জল গড়িয়ে আসে গাল বেয়ে।

'খুব তুই নরম!' বলে সাশুক, 'ছিঁচকাঁদুনি চোখে পানি। দূর ছাই এই জেলি মাছগুলো, চল যাই জেটিতে।'

ধীরে ধীরে কমে আসে যন্ত্রণা, জেটির কাছাকাছি পেঁাছে আনুস্যা একেবারেই তার কথা ভুলে যায়। জেটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ওরা দেখে রোদবেঁধা জলের মধ্যে এক ঝাঁক পোনা, কিসে যেন ভয় পেয়ে রুপোলী জল ছিটিয়ে দিগ্বিদিকে পালিয়ে যায় তারা; চোরের মতো চুপিসারে পাশকে ভঙ্গিতে খুঁটি থেকে খুঁটিতে উঠছে ছোটো ছোটো কাঁকড়া, জলের তলার বালির ওপর দিয়ে কেবলি ছুটে যাচ্ছে ঢেউয়ের স্বচ্ছ স্বচ্ছ ছায়া। সাশুক শোনায় কেমন করে জোর্কা তাকে উঠিয়ে দিয়েছিল কনভেয়রে, উল্লসিত হয়ে ওঠে আনুস্যা, তারও চেপে দেখার শখ হয়। কনভেয়রের ফিতের ওপর ওঠে তারা, ফিতে কিন্তু অনড়, আর পেছল, রবার বেয়ে ওপরে ওঠা মুশকিল, ভয়ও করে। ড্রামের ধুরায় তেল তেমন পড়ে না, তাহলেও পায়ে এক পোঁচ কালি লাগিয়ে বসতে অসুবিধা হয় না আনুস্যার, আর সে কালি তুলতে গিয়ে কালিমাখা

হয়ে যায় গোটা পা আর হাত। প্রথমটা ওর তাতে হাসিই পেয়েছিল, কিন্তু পরে মনে পড়ে যায় মায়ের কথা... সাশ্‌ক তাকে নিয়ে যায় ব্যারাকের কাছে হাত ধোবার জায়গাটায়। অনেক সাবান ঘষে আনস্যা, কিন্তু কালির ওপর সে সাবানের কোনোই প্রভাব পড়ে না আর ফের কান্না পায় আনস্যার। তাকে সান্ত্বনা দিতে চায় সাশ্‌ক, বলে:

'চল যাই, আমার একটা যে জিনিস আছে না...'

খোলা দরজাটার কাছে থেমে যায় আনস্যা, ব্যারাক থেকে ভেসে আসছে ঘড়ঘড়ে গর্জন।

'কে গোঙাচ্ছে ওখানে?'

'জোর্‌কা। গোঙাচ্ছে না, ঘুমচ্ছে।'

'কী ভয়ংকর। যেন কেউ ওর গলা কাটছে...'

'ছ্যো! ওর গলা কাটবে কে... জানিস,' চোখ বড়ো বড়ো করে সাশ্‌ক, 'ও হল জেলখাটা কয়েদী!'

জোর্‌কা সম্পর্কে কিছু একটা বানিয়ে বলতে সে তৈরি ছিল, কিন্তু চোখে পড়ে যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে আনস্যা, চম্পট দেবার জন্য তৈরি, সাশ্‌ক তাই তাড়াতাড়ি করে যোগ দেয়:

'আরে না, না, ভয় নেই, খারাপ লোক নয়... এই দ্যাখ কী আমায় দিয়েছে।'

খাটের তলে ঢুকে কুর্খাতিলটা নিয়ে আসে সাশ্‌ক।

'বাঃ!' উল্লসিত হয়ে ওঠে আনস্যা, 'এটাও তুই আমায় দিয়ে দিবি?'

'ইস, কী শখ! ওটা আমারই দরকার। আরেকটা খুঁজে বার করব, তারপর ভেসে বেড়াব। তোকেও ভাসতে দেব। অল্পস্বল্প,' যোগ দিলে সে কিছুটা ইতস্তত করে।

খাটের তল থেকে বেরিয়ে আসে ঘুম-ভাঙা বীম, আনস্যাও অমনি ভুলে যায় কুর্খাতিলের কথা।

'আঃ, কী সুন্দর!'

বাচ্চাটার সামনে উবু হয়ে বসে আনস্যা হাত বুলাতে থাকে তার গায়ে। আনন্দেই বীম চিৎপাত হয়ে গোলাপী পেটটি এগিয়ে দেয়, কিন্তু তারপরেই জরুরী কী একটা তাগিদে থপর্থপিয়ে চলে যায় জলের বাটিটার কাছে, অনেকক্ষণ চুকচুক করে, তারপর একটু সরে যায় পাশে, প্রস্রাবে ভিজিয়ে দেয় জায়গাটা।

'অ্যাহ্‌, অসভ্যটা!' অন্যদিকে চেয়ে বিব্রতের মতো হাসে আনস্যা। এরোপ্লেনের মতো গুঞ্জন তুলে শার্শিতে উড়ে বসছে মাছি। আগের মতোই ভেসে আসছে ভয়ংকর নাক-ডাকানি। 'চল যাই বাইরে, এ্যাঁ?'

'ঠিক আছে, চল লড়াই-লড়াই খেলি... পিল-বক্স দেখেছিস?'

'উঁহুঁ,' বলে আনস্যা, 'ও আবার খেলা নাকি?'

'কেন ? সবচেয়ে ভালো খেলা!' জোর দিয়ে বলে সাশ্বক, তারপর মনে পড়ে যায়, 'তবে তুই যে আবার মেয়ে।'

'সেজন্যে নয়, খুন-জখম ভালোবাসি না... আমার মায়ের বাবা ছিল কর্নেল। যুদ্ধে মারা গেছে।'

'আমরা যে খেলব মিছিমিছি করে।'

'মিছিমিছি করেও খেলব না।'

'যাক গে,' বলে সাশ্বক, 'চল, নয় এমনি গিয়ে দেখি।'

তার দৃঢ় বিশ্বাস, যেই ট্রেঞ্চ আর ভাঙা পিল-বক্স দেখবে আন্যস্যা, অমনি সব কিছু ভুলে সে লড়াই-লড়াই খেলতে চাইবে।

কিন্তু বেড়ার বাইরে আসামাত্র সাশ্বক নিজেই পিল-বক্সের কথা ভুলে গিয়ে পথের তোয়াক্কা না করে সোজা ছুটতে শুরু করে তীরে নামার ঢালুটা বেয়ে। ভগবান দাঁড়িয়ে আছে সেখানে...

কমলারঙের যাদুটা

মনে মনে সাশ্বক অবিরাম একটা অলৌকিক কিছুর জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে — এই বুঝি এমন একটা কিছু ঘটবে যা কখনো ঘটে নি, কেউ দেখে নি, শোনে নি কেউ।

সেই অলৌকিকটা ঘটল। দাঁড়িয়ে আছে তা সাশ্বকের সামনে, চার চাকার ওপর কাচ, নিকেল, ক্রোমিয়ামে বাঁধানো কমলারঙের অনির্বচনীয় এক অপরূপ। বডি তার জ্বলছে, প্রকাণ্ড হেডলাইটদুটোর কাচ-দৃষ্টি সাশ্বকের ওপর থেকে সরছে না, ছোটো লাইটদুটো নজর রাখছে তার প্রতিটি গতিবিধির ওপর, আর প্রকাণ্ড দাঁত বার করে হাঁ করে আছে রেডিয়েটর আর বাম্পার। বলতে কি, আদৌ মোটরগাড়ি নয় এটা, সত্যিকারের ভগবান — কাচ, রবার, ইস্পাতে গড়া, যা শুধু চোখে দেখা যাচ্ছে না, ছোঁয়াও যায় হাত দিয়ে...

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সাশ্বক ধীরে ধীরে পাক দেয় গাড়িটাকে, তারপর ফের থেমে যায় রেডিয়েটরের কাছে। চোখ সরানো যায় না তা থেকে। ধুলোর আস্তর সত্ত্বেও চোখে পড়ে কী মসৃণ গা, হাত পিছলে যায় এত তেলতেলে... বাম্পার আর চাকার ঢাকনি যেন আয়না, মুখ দেখা যায় তাতে। অবিশ্যি মুখটা দেখায় কেমন চ্যাপটা, হাস্যকর, তাহলেও বাড়ির আয়নার চেয়েও তা অনেক ঝকমকে; জেলেরা যে ফাটল ধরা ঝাপসা টুকরোটার সামনে দাড়ি কামায়, তার তো কথাই ওঠে না...

'কী তুই অতো দেখছিস তো দেখছিসই,' বলে আন্যস্যা, 'চল যাই।'

'দাঁড়া দাঁড়া,' বলে সাশ্বক, 'দেখছিস না ? এটা যে 'ভোলগা'।'

'ভোলগা' মোটরগাড়ি সাশ্বক কখনো দেখে নি, কিন্তু শুনেছে যে সে হল গাড়ির রাজা।

'মোটেই 'ভোলগা' নয়,' বলে আনুস্যা, 'এটা হল আমাদের 'মস্কভিচ'।'

'বাজে বকিস না!'

'বাজে বকতে যাব কেন? তাছাড়া, আদপেই আমি বাজে কথা বলি না...' অভিমান হয় আনুস্যার, যদিও খানিকটা দেরিতে।

'একেবারে তোদের? নিজস্ব?'

'হ্যাঁ, ওতে করেই তো আমরা এসেছি, মা-বাবা আজ তিন বছর ধরে ওতেই আসে। তবে আগে আমায় সঙ্গে নিত না, রেখে যেত দিদিমার কাছে। এবার সঙ্গে নিয়েছে!'

'বাড়ি থেকে সোজা মোটরে চলে এলি?'

'তাতে অবাক হবার কী আছে? মা চাইছিল কোনো স্বাস্থ্যাবাসে যাবে, বাবা বললে স্বাস্থ্যাবাসে তার ঘেন্না ধরে গেছে, তার চেয়ে বরং যাওয়া যাক প্রকৃতির কোলে, যেদিকে দু'চোখ যায়। তাই এখানে এসেছি। শুধু মা'র কাছে জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে না। সুব্যবস্থা কিছু নেই, তাছাড়া...'

ওদিকে আর সাশুকের কান নেই। নতুন করে সে তাকিয়ে দেখতে থাকে আনুস্যাকে। আনুস্যা সেই আনুস্যাই আছে, কিন্তু এই গাড়িটাতেই ও এসেছে জানার পর কী যেন বদলে গেছে ওর মধ্যে। গাড়িটাও একটু যেন অন্যরকম হয়ে উঠেছে — সেই একই গাড়ি, অথচ যেন এক নয়। তেমনি অপরূপ, কিন্তু এর এক মিনিট আগেও যেমন অনায়ত্ত বলে ঠেকেছিল, তেমন নয় আর। ফের গাড়িটাকে চক্কর দেয় সাশুক, তাকায় তার আয়নার মতো কাচে, সবকটা হাতল, পেছনের লাইট, হেডলাইট, আর নক্সা-নক্সা রেডিয়েটরে হাত বুলিয়ে দেখে।

'চল না,' বলে আনুস্যা, বেজার লাগছে তার।

'দাঁড়া দাঁড়া... শোন, আগে এক কাজ করি। কেউ দেখবার আগে আয় ভেতরে গিয়ে বসি। একটুখানির জন্যে।'

'ভেতরে উঠব কী করে, দরজা যে বন্ধ।'

বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাশুক। তাহলেও গাড়ি ছেড়ে সে নড়তে পারে না। ঘুরপাক খায় তার চারপাশে, যেন মজবুত এক অদৃশ্য খোঁয়াড়ে সে আটকা।

'তাহলে এক কাজ করা যাক। আয় পরিষ্কার করি!'

হলদে ধুলোর পাতলা স্তরে চাপা পড়ে এনামেলের কমলারঙা আগুন, নিভে আসে ক্রোমিয়ামের ঝিলিক আর সাশুকের ইচ্ছে হয় চার চাকার পরমাশ্চর্যকে সে দেখবে তার পুরো মহিমায়। কিন্তু ধুলো মুছবে কী দিয়ে, আশেপাশে ন্যাতাকানি কি কাগজ শুধু নয়, নরম ঘাস পর্যন্ত নেই, শুধুই কেবল কাঁটাগাছ। বেশিক্ষণ ভাবে না সাশুক, প্যাণ্ট থেকে শার্টের ঝুলটা বার করে চাকার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ধুলো মুছতে থাকে। শার্টটা ছোটো তাই কেবলি তাকে হাঁটু গাড়তে হয় বটে, চাকা কিন্তু চোখ ধাঁধিয়ে ঝলক দেয়। হিংসে হয় আনুস্যার। সেও

আরেকটা চাকার কাছে হাঁটু গেড়ে মুছতে শুরু করে ফ্রকের খুঁট দিয়ে। মোছে তারা প্রাণপণে, পাল্লা দিয়ে, তাছাড়া আর কোনো দিকে তাদের চোখ নেই, কানও নেই।

'এর জন্যে গালে চড় মারা উচিত!' মাথার ওপর শোনা গেল কার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

সাশুকের পাশেই দেখা গেল রোগা রোগা লোমশ পা, তার ওপর শর্টস। তার ওপর ছবি আঁকা শার্ট, দাড়ি, বরফের ঝলক-দেওয়া মোটা কাচের চশমা।

'গা-গাড়িটা যে ময়লা,' তো-তো করে সাশুক, 'আমরা ভেবেছিলাম...'

'বটে, তোমরা ভেবেছিলে?' বলে জ্যোতিষী, ঝুলন্ত জেলেনুশ্‌কা মাছটা আরো লম্বা দোলনে দুলতে থাকে, 'তোমাদের মনে হল, স্থির করলে এবং লেগে গেলে, এই তো? কিন্তু গাড়িতে হাতের ছাপ ফেলেছে কে?'

মাত্র এতক্ষণেই সাশুকের নজরে পড়ল গাড়ির যেখানে সে হাত দিয়েছে সেখানেই থেকে গেছে দাগ, ডোরা আর ছড়ানো আঙুলের ছাপ। জবাব দেবার তার কিছু নেই, কাতর ও লজ্জিত মুখে সে ফোঁৎ ফোঁৎ শব্দ করতে লাগল নাক দিয়ে।

'এমনিতেই তোর ঠুঁটো নাকটা ভালো করে মলে নে,' বলে জ্যোতিষী, এবারেও বোঝা যায় না কথাটা সে সত্যি করেই বলছে, নাকি ঠাট্টা, 'মোটরগাড়ি বেড়াল নয় যে তার গায়ে হাত বুলাতে হবে, আর ধুলো মোছে না, ধুতে হয়। আর এই আনুস্যা' ফেরে সে মেয়ের দিকে, 'ওই দ্যাখ, মা আসছে, এখ্‌খুনি এক তুমুল কাণ্ড ঘটবে। তোর পালিয়ে বেড়ানোয় এমনিতেই ওর যা মনের অবস্থা, তারপর যখন দেখবে তোর সাজসজ্জা...'

কিছু আগেও আনুস্যার যে ফ্রকটা ছিল নীল, তা এখন ধুলোয় গেরুয়া হয়ে উঠেছে, আর হেন জিনিস নেই যা তাতে না আছে: জেটিতে লাগা মাছের আঁশ, সাবান জলের ছোপ, যা এখন হয়ে উঠেছে স্রেফ নোংরার ছোপ, আর সেই তেলকালির দাগ। ফ্রকের ঝুল নাড়া দেয় আনুস্যা, ফ্রক তাতে কিন্তু পরিষ্কার হয় না। আনুস্যার মা ওদিকে বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে। পরনে তার এবার লালচে-বাদামী গাউন, এমনভাবে ঝকমক করছে যেন বার্নিশ করা, তোয়ালেটা এখন আর মাথায় জড়ানো নয় হাতে ঝুলছে, ফলে দেখা যায় তার চুল ঠিক আনুস্যার মতোই শণরঙা আর ঢেউ-খেলানো। নাকে সেই কাগজের টোপরটা নেই, মুছে ফেলেছে মুখের শাদা প্রলেপটা, ফলে মুখখানা দেখাচ্ছে আগের চেয়েও সুন্দর, কিন্তু এতই রাগী-রাগী যে সাশুক একটা ডোণ্ট-কেয়ার ভাব করলেও চট করেই সরে যায় গাড়িটার ওপাশে, জ্যোতিষী যেখানে চাবি দিয়ে সামনের দরজাটা খুলছে। সেখান থেকে ক্যানভাসের ট্রাউজার বার করে পরে জ্যোতিষী, তারপর গাড়ির চারটে দরজাই হাট করে খুলে দেয় হাওয়া খেলাবার জন্য: রোদ্দুরে গরম হয়ে উঠেছিল গাড়িটা, সদ্য ধরানো চুল্লির মতো তা শোঁ-শোঁ করছে। এই সময়েই শুরু হয় সেই 'তুমুল কাণ্ডটা'।

'আনুস্যা, পালিয়ে এসেছিস কেন?' দূর থেকেই বলে মা, 'আমি যে বারণ করেছিলাম...

মাগো, কী ছিরি হয়েছে তোর !' চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'এসব তোর ইচ্ছে করে করা, আমায় জ্বালাবার জন্যে ! নাকি ফের সেই নোংরা ছেলেটার সঙ্গে যত রাজ্যের ওঁছা জিনিস কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলি ?'

'ওকে টানছ কেন মা ? ও তো লাগায় নি, নোংরা মেখেছি আমি নিজেই...'

'ফুর' না 'হুঃ' কী একটা অদ্ভুত শব্দ করে জ্যোতিষী, সাশুকের মনে হয় যেন সে চোখ মটকাচ্ছে তার দিকে, কিন্তু সেটা সে ঠিক হলফ করে বলতে পারে না: চশমার পুরু কাচ থাকায় ঠিক দেখতে পায় না সে।

'আবার ওর হয়ে ওকালতি শুরু করেছিস তুই ! খবরদার, ওর কাছে ঘেঁসবি না বলছি ! ছোঁড়াটা একবার আমার চোখে পড়লে হয় !'

এই সময় সে গাড়ির পেছন থেকে সামনে আসতেই সাশুক পড়ে গেল তার চোখে।

'বটে, তুই এখানে ? নে, ভাগ এখান থেকে ! এখ্খুনি ! কখনো যেন আর তোকে না দেখি !..'

'লুদা,' চাপা গলায় বলে জ্যোতিষী, 'কী বলছ তুমি ! লজ্জা হওয়া উচিত !'

'রাখো তোমার লজ্জা ! নিজের মেয়ের জন্যে একটু ভাবনাও নেই তোমার...'

'ও-ও তো কারো ছেলে।'

'পরের কোন এক পোঁটা-পড়া বাচ্চার জন্যে ভারি আমার দায়। এমনিতেই বলে ঝামেলায় থই পাচ্ছি না...'

ঘুরে দাঁড়ায় সাশুক। ঘাড় গোঁজ করে চলে যায়। কান ওর জ্বলছে, চোখ করকর করছে, কয়েক ফোঁটা অশ্রুও পড়ে পায়ের কাছে তপ্ত মখমলী ধুলোর ওপর। উহ্ কী খাণ্ডারনী ! কী ঘেন্নাই না তাকে করে সাশুক... কেন সে লাগছে তার পেছনে ? আনুস্যা তো নিজেই এসেছে তার কাছে। ও কি তাকে ডেকেছিল ? এবার আসুক না, এমন তাড়া দেবে... নিজেই সে তো কখনোই যাবে না। ভারি তার দায় পড়েছে...

অযথা অপমানের সমস্ত জ্বালা সত্ত্বেও সে পুরোপুরি চলে যেতে পারে না। অন্তত দূর থেকে হলেও, আড়চোখে হলেও তাকে দেখতে হবে কীভাবে কমলারঙের যাদুটা ছাড়ছে। কে তাকে মানা করবে ? স্তেপ তো আর আনুস্যার মায়ের নয়, যার ইচ্ছে সে যাবে... একটু দূরে গিয়ে সাশুক মাটির ওপর বসে বসে ভাব করে যেন উইঢিপি খুঁড়ছে, আসলে কিন্তু আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে কী চলছে গাড়িটার কাছে। খাণ্ডারনীটা আনুস্যার ফ্রক খুলে সেটা ঝাড়ে, তারপর ফের পরিয়ে দেয়। আর অনবরত কী যেন বলছে। কী বলছে সেটা এমনিতেই বেশ বোঝা যায়: গাল পাড়ছে আর কি, দোষ দিচ্ছে তাকে, সাশুককে। আর জ্যোতিষী ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দৃঢ়ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আসতে থাকে... সাশুকের দিকে। লাফিয়ে ওঠে সাশুক। যদি দরকার পড়ে আর কি। ভোঁ দৌড় দেওয়া যাবে...

'রাগ করেছিস ?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করে জ্যোতিষী।

'আমার পেছনে উনি কেন লাগছেন ?'

'রাগ হবারই কথা বই কি, বুঝতে পারছি,' দাড়ি নেড়ে চিন্তিতভাবে বলে জ্যোতিষী, 'এবার চল আমার সঙ্গে।'

'কেন ?'

'জ্যোতিষীরা শুধু তারাদের বিষয়েই জানে না, পরের মনোবাঞ্ছাও গুণে বলে দিতে পারে। তোর ইচ্ছেটা আমি গুণে দেখেছি।'

'মোটেই না !'

'রীতিমতো হাঁ ! তাকা তো আমার দিকে !' কড়াভাবে বলে সে সাশুকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করে, 'তুই মোটরগাড়িতে বেড়াতে চাস।'

সাশুকের চোখ আর মুখ এমন বিস্ফারিত হয়ে ওঠে যে জ্যোতিষী ফের সেই, 'ফুর' আর 'হুঃ'-এর মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত শব্দ করে ফিরে যেতে থাকে গাড়ির দিকে। বিশ্বাস হয় না সাশুকের। সন্দেহ আর সেই সঙ্গে উদ্দাম একটা আশায় সে প্রায় ছুটতে ছুটতে যায় তার পেছন পেছন।

জ্যোতিষীর বউ তাদের দিকে চায় কাঁটার মতো দৃষ্টিতে।

'ওকে আবার নিয়ে এলে কেন ? করতে চাও-টা কী ?'

'ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে। এই বয়সে ন্যায়ে বিশ্বাস হারাতে দেওয়া চলে না।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে জ্যোতিষীর বৌ আনুস্যাকে বসায় পেছনের সীটে, তারপর নিজে বসে দরজা বন্ধ করে প্রচন্ড শব্দে।

'বেশ,' বলে জ্যোতিষী, 'আর সামনে বসবে নির্বাচিত পুরুষ সমাজ। ওঠ !'

ডান দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে সে অপেক্ষা করে, সাশুক সীটে বসার পর বন্ধ করে সেটা। ভেতরটা এমন ফিটফাট আর সুন্দর, এমন ঝকঝক করছে যত কলকব্জা, উইন্ড স্ক্রীনের সামনে রবারে ঝুলছে এমন অপূর্ব এক কুকুর, পেছনে এমন হিংস্রের মতো চুপ করে আছে আনুস্যার মা, পিঠ আর মাথার পেছন দিয়ে সাশুক এমনভাবে টের পাচ্ছে তার বিষদৃষ্টি যে সে কিছু তো ছোঁয়ই না, নড়তে-চড়তেও ভয় পায়, নিশ্বাস নেয় দমকা দমকা।

'তা কেমন লাগছে ?' স্টিয়ারিঙের সামনে বসে জিজ্ঞেস করে জ্যোতিষী।

সাশুকের বুক এমন করে উঠেছিল যে সে জবাবও দিতে পারে না, শুধু টুকটুক করে ঘাড় নাড়ে।

'গাড়ি ছাড়তে হলে কী করতে হয় ?'

'হর্ণ দিতে হয় !' ফিসফিসিয়ে বলে সাশুক।

'হর্ণ ? সত্যিই তো, হর্ণ ছাড়া আবার গাড়ি চাপা কী। লাগা হর্ণ।'

স্টিয়ারিঙ বোর্ডের ওপর মস্ত কালো বোতামটায় আঙুলে চাপ দেয় সাশুক, কিন্তু কোনো হর্ণ শোনা যায় না। জ্যোতিষী বলে:

'হর্ণ আমার সত্যিকারের জ্যোতিষী মতে মন্ত্র পড়ে যাদু করে রেখেছি।' উল্লাসে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে সাশুকের, 'এবার যাদু তুলে নেওয়া যাক: 'এন, দে, ত্রুয়া, বেশামেল দে ভালুয়া,' এবার এইটে টেপ।'

সাবধানে সাশুক চাপ দেয় স্টিয়ারিঙের নিচে ক্রোমিয়ামের কাঁটায়, অমনি হর্ণ বেজে ওঠে স্তেপের ওপর। আওয়াজটা জোরালো, গমগমে, মোটেই সেমিওন কাকুর ট্রাকের ঘড়ঘড়ে ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙের মতো নয়, পোড়খাওয়া রঙচটা খোদ ট্রাকটাই যেমন নয় এই কমলারঙা ফুলবাবুটির মতো।

'বাবা, বাবা, আমিও টিপব!' চেঁচায় আনুস্যা, সীটে উঠে বাপের ঘাড়ের ওপর দিয়ে সে হাত বাড়ায়। 'মস্ক্ভিচ'এর গমগমে আওয়াজ গড়িয়ে যায় পাড়ের ওপর দিয়ে, নেমে আসে নিচে, গাংচিলেরা ঝটপটিয়ে পালিয়ে যায় সমুদ্রে।

'যথেষ্ট হয়েছে শ্রীমান শ্রীমতীরা,' বলে জ্যোতিষী, 'একটা সীমা রাখতে হয় তো, নইলে ফের মন্ত্র পড়ে দেব, গাড়ি এক পাও চলবে না।'

হাত গুটিয়ে নেয় সাশুক, আনুস্যাকে তার মা টেনে বসিয়ে দেয় তার জায়গায়। জ্যোতিষী কী একটা চাবি ঘোরায়, নিচে কী একটা গোঁ-গোঁ করে উঠেই থেমে যায়।

'বিগড়ে গেছে?' সশঙ্কে জিজ্ঞেস করে সাশুক, কিন্তু তখ্খুনি সে টের পায় যে কিছুই বিগড়য় নি, গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই, চলছে, এমন মসৃণভাবে চলছে যে মনে হয় যেন ভেসে যাচ্ছে।

'স্পীড দেব?' জিজ্ঞেস করে জ্যোতিষী।

'হ্যাঁ!' সানন্দে মাথা নাড়ে সাশুক।

'নে, সামলে থাকিস, নিয়ে যাব তোকে একেবারে দুনিয়া ছাড়িয়ে।'

'ঠিক আছে!' সোল্লাসে ফের মাথা নাড়ে সাশুক।

কুহকিনী এই গাড়িটায় চেপে কেবলি কেবলি চলে যেতে পারলে সে সব কিছুতে রাজী। খানাখন্দে সে গাড়ি দুলে উঠছে মসৃণ দোলায়, ধুলোর এক লম্বা লেজ টেনে আনছে পেছনে, আর এমন জোরে ছুটছে যে জানলায় লেগে গর্জন করছে বাতাস।

তবে সুখ কখনো বেশিক্ষণ টেকে না। চারটে কুঠি পেছনে ফেলে রেখে 'মস্ক্ভিচ' বাঁক নিয়ে থেমে যায় পঞ্চম কুঠির ফটকের কাছে। যে ধুলো আগে কিছুতেই গাড়িকে ছাড়িয়ে যেতে পারছিল না, তা এখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ঢেকে ফেলল ঘন হলদে মেঘে। রেগে থুতু ফেলে জ্যোতিষীর বৌ নামে গাড়ি থেকে, ঠেলতে ঠেলতে সঙ্গে নিয়ে যায় আনুস্যাকে। সাশুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় জ্যোতিষীর দিকে। জ্যোতিষী বলে:

'নেমে পড়, এসে গেছি। সফর শেষ।'

ভয়ানক একটা আশাভঙ্গ হয় সাশুকের। গাড়ি থেকে নেমে সে দূরে সরে যায়। কিন্তু জ্যোতিষী গাড়ি ঘুরিয়ে ভেতরে ঢোকামাত্র সে বেড়ার গায়ে চোখ লাগিয়ে দাঁড়ায়। ইঞ্জিনের

বনেট খোলে জ্যোতিষী, অনেকক্ষণ কী সব পরখ করে সেখানে, তারপর বনেট আর গাড়ির দরজা বন্ধ করার পর চোখে পড়ে তার বেড়ার ফাঁকে গোঁজা সাশ্বকের মুখ।

'সারা রাত তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি ?'

চুপ করে থাকে সাশ্বক।

'ছুটে যা বাড়িতে। নইলে তোকে নিয়েও তুমুল কাণ্ড বাধবে।'

বেড়া ছেড়ে দেয় সাশ্বক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসে।

'বেশ, তবে আপনাদের কাছে আবার আসব কিন্তু, এ্যাঁ ?'

'আলবৎ,' রাজী হয় জ্যোতিষী, আর এবার চশমার পুরু কাচের ভেতর দিয়েও সাশ্বক স্পষ্ট দেখতে পায় তার বাঁ চোখের মটকানি।

গাল ভরা খুশির হাসি নিয়ে সাশ্বক ফিরে আসে বাড়িতে, ব্রিগেডের ব্যারাকে।

আমাদের খানা

সাশ্বকের জন্য মনমরা হয়ে ছিল বীম, ওকে দেখেই ছুটে যায় তার দিকে, কিন্তু বীমের দিকে তখন সাশ্বকের মন নেই। প্রথমেই সে ছুটে যায় ব্যারাকের আয়নাটার কাছে। সব সময়েই তা থাকে জানলার তাকে, সেখানে দাঁড়িয়েই দাড়ি কামায় জেলেরা। আয়নাটা ফাটল-ধরা, ঘোলাটে, মাছির দাগে ভর্তি। থুতু ছিটিয়ে সাশ্বক সেটা মোছে জামার আস্তিন দিয়ে। তাতে একটুকু পরিষ্কার হয় না আয়নাটা, তাহলেও দেখা যায় যে নাকটার দশা খারাপ। আকাশের দিকে মুখ করা দুটো ফুটো, তার ওপর ফোড়ার মতো লাল চকচকে চামড়া, চারপাশে পুরনো চটা। নখ দিয়ে তা খোঁটে সাশ্বক, কিন্তু তার তলেও চামড়াটা দগদগে লাল।

'নাকের ছাল ছাড়াচ্ছিস কেন ?' জিজ্ঞেস করে ইভান দানিলভিচ।

জেলেরা সবাই প্রায় ব্যারাকে। চেরভোনের পর কেউ একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, কেউ স্রেফ গড়াচ্ছে, খাবার আগে, সন্ধ্যায় সমুদ্রে যাবার আগে জিরছে একটু। ঘুম হয়ে গেছে জোর্কার, মাথার তলে হাত দিয়ে শুয়ে আছে, পা এগিয়ে দিয়েছে খাটের পেছনে। সেও লক্ষ করে সাশ্বককে, ঘর ফাটিয়ে চেঁচায়:

'আরে ও যে রাজকন্যে জুটিয়েছে! মোটরগাড়ির দিকে ছুটে যেতে দেখেছি ওদের। একেবারে ডানাকাটা পরী। খুঁজে বার করেছে বটে। এখন রূপচর্চা চলছে...'

হেসে ওঠে জেলেরা, সাশ্বক ফুঁসে ওঠে, হাত মুঠো করে ফেরে। অথচ ও কিনা জোর্কাকে গাড়ির কথা, সবকিছু কথা বলবে ঠিক করেছিল...

'লজ্জাও হয় না!' চেঁচিয়ে ওঠে সাশ্বক, 'কী অসভ্য!'

'আরে রাগিস না, তোর রাজকন্যে কেড়ে নেব না। তবে দেখিস, বিয়েতে নেমন্তন্ন করিস কিন্তু,' হোহো করে হাসে জোর্কা।

রেগে টঙ সাশুকের ভয়ংকর এলোমেলো চেহারা দেখে জেলেরাও হাসতে শুরু করে।

'গেঁতো ঘোড়া সব,' বলে ইভান দানিলভিচ, 'মস্করার আর লোক পেলে না...'

সবার ওপর রাগ করে সাশুক বেরিয়ে যায় ব্যারাক থেকে। বীমও ছুটে যায় তার পায়ে পায়ে, লাথি মারে সাশুক। করুণ সুরে কেঁউ-কেঁউ করে ওঠে বীম, লজ্জা হয় সাশুকের, মায়া হয়। নিচু হয়ে সে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে:

'যাক গে, রাগ করিস না। ইচ্ছে করে মারি নি, মনের জ্বালায়...'

রাগ পুষে রাখে না বীম, সঙ্গে সঙ্গেই আদর কাড়তে শুরু করে, সাশুকের হাত চেটে দেয়। সাশুক ওকে নিয়ে টানাটানি করে, আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে সে।

মা ফিরে এসেছে, রান্নাবাড়ি নিয়ে বসেছে চালার নিচে। সাশুক ছুটে যায় তার কাছে।

'আমায় অন্য একটা জামা দাও মা।'

'কিসের জন্যে?'

'এটা নোংরা হয়ে গেছে।'

'নোংরা কম ঘাঁটতে হয়। পরলি তো মাত্র কালকে। অত বাবু হলি আবার কবে থেকে?'

'না মা, দাও না,' ঘেঙানি শুরু করে সাশুক, কিন্তু মা তাকে ভাগিয়ে দেয়।

'জ্বালাস নে তো। এমনিতেই বলে আমার গা ঘোলাচ্ছে।'

সত্যিই বোধ হয় গা ঘোলাচ্ছে মা'র, হাঁটছে কষ্টে-সৃষ্টে, কুঁজো হয়ে, মুখখানা ফ্যাকাশে, চোখের কোণে কালি, রগের কাছে ঘাম ফুটে উঠেছে। হাত ধোওয়ার জায়গাটার কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাত ধোয় সাশুক, এমনকি বালি দিয়ে রগড়ায় পর্যন্ত। একটু ফরসা হয় হাত, কিন্তু খুবই সামান্য, আগের মতোই এবড়ো-খেবড়ো নখ আর ফাটা ফাটা চামড়া রয়ে গেল আঙুলে।

খাওয়ার সময় সাশুক মুখ গুঁজে থাকে তার বাটির ওপর, কারো সঙ্গে কথা বলে না। ইচ্ছে করে। যেমন সব লোক।

জেলেরা চলে যায় জেটিতে। হাঁপাতে হাঁপাতে, ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিয়ে বাসন ধোয় মা, তারপর ব্যারাকে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

তীরে যায় সাশুক, মনে মনে আশা করে যে জ্যোতিষী ফের সপরিবারে আসবে চান করতে। বড়ো বড়ো জেলি মাছগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না, চলে গেছে তারা গভীরে, রোদ পোয়াবার জন্য যেখান থেকে তীরে ভেসে এসেছিল সেই অতলে। পিরিচের মতো ছোটোগুলোই কেবল চুলচুল ফরছে তীরের কাছে, তাও ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। খাড়া পাড়ের বাঁকের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে সূর্য। জ্যোতিষী আসে না, এবং নিশ্চয় আসবেও না। ঘরে ফেরে সাশুক।

কাত হয়ে শুয়ে আছে মা, আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছে। তাতে ভারি একঘেয়ে আর খারাপ লাগে সাশুকের। বাইরে বেরিয়ে আসে সে, বসে চালার নিচে খাবারের টেবিলটার কাছে, তাকিয়ে

দেখে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে সূর্যাস্তের আভা। গাঢ় হয়ে ওঠে ময়ূররঙা আকাশ, নীল ফুটে ওঠে, তারপর হঠাৎ হয়ে যায় মিশমিশে কালো। বালাবানভ্কার প্রান্ত থেকে একটা কুকুর ডেকে ওঠে, অন্য কুকুরগুলো তাতে সাড়া দেয়। কিছুক্ষণ এমনি ডাকাডাকি চালায় তারা, যেন রাত পাহারার আগে হাজিরা দিচ্ছে, তারপর থেমে যায়। সমুদ্র থেকে কোনো শব্দ আসে না। সমুদ্র থেকে ডাঙার দিকে সারা দিন যে হালকা বাতাস বইছিল সেটা থেমে গেছে, ডাঙা থেকে সমুদ্রমুখো হাওয়াটা এখনো ওঠে নি, নিবিড় একটা থমথমে স্তব্ধতা চেপে ধরে সাশুককে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে বসে থাকতে ভয় লাগে, তবে থেকে থেকেই পেছন দিকে তাকায় সাশুক। মা শুয়ে আছে ব্যারাকে, তার হাট করে খোলা দুয়োরটা এখান থেকে মাত্র তিন কদম, বেঞ্চির তলে গুটিয়ে থাকা বীমের গরম লোমও টের পাওয়া যাচ্ছে খালি পায়ে। 'ভয়ের কী আছে?' নিজেকে বোঝায় সাশুক, 'ভয় পেলে কখনোই তো খুঁজে পাব না।' জ্যোতিষী অবিশ্যি বলে নি কি করে খুঁজতে হবে, তাহলেও যে করেই হোক খুঁজে সে নেবেই। তারাটা যদি তার নিজের হয় তাহলে আপনিই সে তাকে জানান দেবে, চোখ টিপবে বা কিছু একটা করবে... কালো আকাশে এর মধ্যেই একটার পর একটা তারা ফুটছে, কিন্তু এতই তারা মিটমিটে আর কম্পমান যে তার তারা ওরা হতেই পারে না। টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে গালে হাত দেয় সাশুক...

'এখানে কী করছিস?'

সিরিশ কাগজের মতো খরখরে হাতে ইভান দানিলভিচ ঠেলা দেয় সাশুকের কপালে। ব্যারাকে আলো জ্বলছে, শোনা যায় ফিরে আসা জেলেদের গলা। জবাব দেবার ইচ্ছে ছিল না সাশুকের, কিন্তু তারপর মনে পড়ে যে ইভান দানিলভিচ কখনো তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে নি, সবার চেয়ে সে বলবান, জানে সবার চেয়ে বেশি। হয়ত তারার ব্যাপারটাও জানে?

'তারা খুঁজছি... একজন লোক, মানে ওই যে লাল গাড়িটা যে চালায়, সে বলেছে যে প্রত্যেক লোকের তারা থাকতে হবে।'

'ও, এই ব্যাপার! বেশ চল তোকে দেখাই।'

তারা আড়াল-করা চালাটা থেকে বেরিয়ে আসে ওরা।

'সপ্তর্ষি চিনিস? তাহলে আমার আঙুল বরাবর তাকা: ওই দ্যাখ সাতটা তারা। কলসী বা হাতলওয়ালা ডেকচির মতো। এবার এই দুটো তারা বরাবর ওপরে দ্যাখ। ওখানেও একটা ডেকচির মতো, শুধু আকারে ছোটো আর হাতলটা অন্য দিকে। হাতলের শেষ প্রান্তে যে তারাটা দেখছিস, ওটা হল ধ্রুব তারা। আমাদের প্রধান তারা, বরাবর ওটা থাকে ঠিক উত্তর দিকে। জেলে বা মাঝিমাল্লাদের যখন দিকভ্রম হয়, কম্পাস নেই, তীর-টির কিছু দেখা যাচ্ছে না, তখন এই তারাটি দেখে দিক ঠিক করে সোজা বাড়ি।'

'উঁহুঁ,' কিছুটা ভেবে বললে সাশুক, 'ও বলেছে প্রত্যেকের নিজ নিজ তারা আছে!'

'তাহলে নিজেই খুঁজে নিস। তবে অন্য সময়। এখন ঘুমতে যা। এর মধ্যে তোর তিনটে ঘুম হয়ে যাবার কথা।'

ঘুমচ্ছে না মা, চকচকে চোখে সে তাকিয়ে আছে কোণের কড়িকাঠের দিকে। বাবা উতলা হয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছে:

'ফলের ক্বাথ দিতে পারলে হত... কিংবা ঠান্ডা জেলি। তাহলে একটু নরম পড়ত... কিন্তু কাল কী হবে?'

'যে করে হোক কাটিয়ে দেব,' আস্তে করে বলে মা, 'তুমি ঘুমোও, হয়রানি তো কম হয় নি।'

আর নিজের খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে সাশুক ভাবে ক্বাথ হলে বেশ হয়, তার ভাগ্যে যেন জোটে। ওর যখন অসুখ করেছিল, তখন দিদিমা ক্বাথ বানিয়েছিল কেবল তার জন্য। কিন্তু বেশ মনে আছে ওর, তখন ওর খেতে ইচ্ছেই করছিল না। তারপর যখন ভালো হয়ে গেল, ক্বাথ খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল, তখন কিন্তু আর ওকে দেয় নি। কেন এমন মুখরোচক জিনিসটাকে দেয় কেবল অসুস্থদের যখন তাদের মুখে ওটা রোচে না, অথচ সুস্থ লোকেদের মুখে খুব রুচলেও তাদের দেয় না?

এই জরুরী ভাবনাটা সাশুক পুরো ভেবে শেষ করতে পারে না — চোখের পাতা জুড়ে আসে, ছড়িয়ে পড়া মটরদানার মতো ছুটে পালোয় ভাবনা।

সাশুকের যখন ঘুম ভাঙল, ব্যারাক তখন চুপচাপ। তার মানে জেলেরা চলে গেছে, ফের ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে পড়ে যে মা শুয়ে আছে, তার মানে তত দেরি হয় নি। মাকে না জাগিয়ে সে চুপি-চুপি ছুটে যায় আঙিনায়। সবে সাগরের ওপর মাথা তুলছে সূর্য, চোখ কোঁচকালে সূর্যের দিকে চেয়েও থাকা যায়। পালা করে একবার এ-চোখ একবার ও-চোখ কোঁচকাতে থাকে সাশুক, শেষ পর্যন্ত ব্যথা করতে থাকে চোখ, মাথা ঘুরে ওঠে। তারপর আগের দিনের কথা মনে পড়ে যায় তার, ছুটে যেতে চায় বাইরে, কিন্তু কী খেয়াল হতে ফিরে আসে হাত ধোবার জায়গায়, দুই হাতে জল নিয়ে মুখে ছিটে দেয় সে, কেন জানি তার শণরঙা ঝুঁটিটা ভিজিয়ে নেয়। তোয়ালের জন্য যাবারও তর সয় না তার, ছুটতে ছুটতেই মুখ মুছে নেয় আস্তিন দিয়ে।

বেড়ার ওপাশে আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে কমলারঙা 'মস্কভিচ'। বাড়ির জানলাগুলো হাট করে খোলা, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও, কোনো শব্দ নেই। ঘুমচ্ছে। কুঠিগুলো সবই রাস্তার একপাশ বরাবর — ফাঁকা রাস্তাটায় ছোঁড়াগুলোও নেই, কুকুরও নেই। এরা তো আবার শহুরে লোক, নিশ্চয় ঘুমবে অনেকক্ষণ। তাহলেও ফিরে আসে না সাশুক, রাস্তার পাশ দিয়ে যে খাল চলে গেছে, তাতে ঘুরে বেড়ায় সে, শুধু মনের মতো কিছুই নেই সেখানে, কেবল শুকিয়ে যাওয়া কাদা, আগাছা, আর যত রাজ্যের ফেলে দেওয়া আবর্জনা। রোদ্দুরের ঝাঁঝ লাগছে গায়ে, বেশ খালি খালি লাগছে পেট, অথচ এদের এদিকে ঘুম ভাঙার

নাম নেই। 'মস্ক্‌ভিচ'এর দিকে শেষ চাওয়া চেয়ে সে ফিরে আসে। অথচ আশ্চর্য, মা এখনো ওঠে নি।

'মা, খিদে পেয়েছে,' বাঙ্কের কাছে গিয়ে বলে সাশ্‌ক।

দেখা গেল মা মোটেই ঘুমচ্ছে না। চকচকে চোখে চেয়ে আছে কড়িকাঠের নিচের সেই একই কোণটাতেই, চোখের কালি আরো বেড়েছে, মুখ হয়ে উঠেছে ফ্যাকাশে নীলাভ। প্রথমে শুধু শুকনো ঠোঁট নড়ে তার, কথা শোনা যায় তারপর।

'চাবি নে... বালিশের তলে। ভাঁড়ার থেকে রুটি কেটে নিস... দেখিস হাত কাটিস না...'

'কী বলছ মা, আমি কি আর ছোটো আছি নাকি?'

'আর চর্বি আছে, তাতে হাত দিবি না... সমবায়ের জিনিস, নেওয়া মানা। ইচ্ছে হলে বাঁধাকপি নিস, টবে আছে...'

মায়ের বালিশের তল হাতড়ে চাবি বার করে সাশ্‌ক। ভাঁড়ারটা মাটিতে আধখানা ডোবা, ভেতরটা আঁধার-আঁধার, ঠাণ্ডা। পাঁউরুটিটা পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে তার চটা পড়া জায়গাটা কেটে নেয় সাশ্‌ক। তারপর কী ভেবে আরো একটা টুকরো কাটে—মজুত হিশেবে, বীমও খাবে। চর্বি রয়েছে খাদি ন্যাতায় ঢাকা একটা বাক্সে। রয়েছে অনেক। চার টুকরো করা তিন থাক শাদা, মোটা মোটা চর্বির পাটা, নুনের বড়ো বড়ো টুকরো তাতে ঝলকাচ্ছে। চর্বি ভালোবাসে সাশ্‌ক, কিন্তু তেমন ঘন ঘন খাওয়া হয় না। ভাঁড়ারের খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ভাবে সাশ্‌ক... কেউ তো আর দেখবে না... তারপর মুখের লালা গিলে চূড়ান্তভাবেই চর্বিটা ঢেকে দেয় ন্যাকড়ায়। বাঁধাকপি পুরনো, পিপের গন্ধ ছাড়ছে তা থেকে, নাড়ি উল্টে আসে। নিজের রুটির টুকরোটার ওপর নুনের দানা ছিটিয়ে, ভাঁড়ার বন্ধ করে সাশ্‌ক ফের ছুটে যায় মায়ের কাছে। চঞ্চল হয়ে ওঠে বীম, পাক খাওয়া লেজটা নাড়ায়। রুটির টুকরো পেয়ে সেও সলোভে খেতে শুরু করে। সশব্দে টিকটিক করা ঘড়িটার দিকে তাকায় মা।

'সর্বনাশ, ছ'টা বাজতে যে আর দেরি নেই...' ওঠার চেষ্টা করে মা, কিন্তু ফের শিথিলভাবে মাথা এলিয়ে দেয় বালিশে, 'বেটা আমার, বেটা রে,' হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে সে, 'জেলেরা শীগগির ফিরে আসবে যে...'

পা দোলানো থামায় সাশ্‌ক, কিন্তু খাওয়া চালিয়ে যায়।

'আমি এদিকে শয্যাশায়ী, ওরা খাবে কী...' পাঁউরুটি চিবানো থামায় সাশ্‌ক, দুই হাঁটুর মাঝখানে হাত চেপে অপেক্ষা করে মা কী বলবে। 'তুই একটু চেষ্টা করে দেখবি?'

'আমি? আমি তো রাঁধতে পারি না।'

'অন্তত কোনোরকমে একটু।'

'দূর, না মা, ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া আমার সময়ই নেই। ওরা নিজেরাই রেঁধে নিক।'

‘আরে একটু ভেবে দ্যাখ... গেছে ওরা ফরসা হবার আগে, ফিরবে আটটায়... হাওয়া খেয়ে তো বেড়াচ্ছে না, কাজ করছে। খাটুনির কাজ রে... দেখেছিস ওদের দাঁড়গুলো ?’

মাথা নাড়ে সাশুক। ইয়া ইয়া দাঁড়। একবার সে তোলবার চেষ্টা করেছিল — নড়াতেও পারে নি। একেবারে কাঠের কুঁদো। একটা দাঁড় দু’জনে বায় খামোকা নয়।

‘নিজেই ভেবে দ্যাখ, পাঁচ ঘণ্টা ধরে ওই দাঁড় বাইছে !’

‘আমি হলে বাইতাম না।’

‘বোকা কোথাকার ! বাইছে শখ করে তো নয়, পেটের গরজে। কেবল ছুটোছুটি করেই তোর খিদে পেয়ে যায়। আর ওদের ? হাড়ভাঙা কাজ।’

কেমন করে হাড় ভাঙছে সেটা কল্পনা করার চেষ্টা করে সাশুক, পারে না। তবে সে জানে যে জেলেরা বরাবরই ফেরে একেবারে রাক্ষুসে খিদে নিয়ে। খায় গোগ্রাসে, চুপচাপ। খেয়েই ঘুমতে যায়। খুব হয়রান হয়ে যায় কিনা। আর আজ ওরা ফিরবে, খাবার থাকবে না, তা রান্না করে নিতে হবে, কত সময় যাবে... মেজাজ বিগড়ে যাবে ওদের, গালাগালি দেবে, এমনকি ইভান দানিলভিচ পর্যন্ত...

‘আচ্ছা, রাঁধব,’ বলে সাশুক, ‘শুধু বলে দাও কী করে।’

‘এই তো লক্ষ্মী ছেলে, ভালো ছেলে...’ কেন জানি ঠোঁট তার থরথর করে, ‘অন্তত ‘কন্দের’ রাঁধতে পারলেও হয়। আমি তোকে সব পরপর বলে যাব। সবার আগে তুই শিক দিয়ে চুল্লিটা পরিষ্কার কর...’

আধ-মিনিটের মধ্যেই চালার তলে শুরু হয় আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ — ছাই আর ঝুলকালির মেঘ ওঠে চুল্লির ওপর, ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে, কিন্তু চুল্লির ঝাঁঝরি আর ফুটো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সাশুকের হাতের শিক থামে না।

‘তারপর কী করব ?’ মায়ের কাছে ছুটে আসে সে।

‘মা গো ! কী ভূতের মতো চেহারা করেছিস !’ ওর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলে মা, ‘যাক গে... এবার হাণ্ডায় জল ভর, কানা থেকে আট আঙুল নিচে পর্যন্ত... তারপর কেটলি। তারপর আগুন দিবি।’

জল রাখার লোহার পিপেটা কাছাকাছি থাকলেও নয় হত। হাণ্ডা ভরে জল আনে সাশুক, সযতনে কানা থেকে আঙুল মেপে দেখে। এনামেলের চটা ওঠা হাণ্ডার ওপর ঝুলকালির ছাপ থেকে যায় বটে, কিন্তু মাপটা হয় নিখুঁত, একেবারে টায় টায় আটটি আঙুল পর্যন্ত। আর চুল্লি জ্বালানো — ফুঃ ! বহুবার সাশুক পুকুর পাড়ে আর সবজী ভুঁইয়ে ধুনি জ্বালিয়েছে ছেলেপিলেদের সঙ্গে। চুল্লির ভেতর গনগনিয়ে ওঠে আগুন। তারপর সাশুক তল ভাঁড়ার থেকে আনে দু’হাঁড়ি মিলেট, সিকি ভাগ চর্বি। চর্বিটা সে কাটে কুচিকুচি করে আর চনমনে গন্ধটা পেয়ে পায়ের কাছে লুটোপুটি আর কেঁউ-কেঁউ করে বীম।

'তোয়াজ করা রাখ,' কড়া করে বলে সাশ্বক, 'বলেছি তো, পাবি না! সমবায়ের জিনিস...'

তাহলেও পারে না সাশ্বক, ছোট্ট এক টুকরো ছাল কেটে দেয় বীমকে। নিজেও তেমনি এক টুকরো ছাল গালে পুরে চুষতে থাকে। ছালটা মুখরোচক, চোষা যায় অনেকক্ষণ ধরে, বীম কিন্তু না চিবিয়েই নিজের টুকরোটা গিলে ফেলে এমনভাবে ছুঁচলো নখ দিয়ে আঁচড়াতে থাকে সাশ্বকের পা, এমন মিষ্টি করে তাকায় সাশ্বকের মুখের দিকে যে সাশ্বক মুখ থেকে তার টুকরোটা বার করে ওকেই দিয়ে দেয়।

ফুটে ওঠে কন্দের — দেখা গেল মেশানোটাই সবচেয়ে কঠিন। কাঠের প্রকাণ্ড হাতাটা প্রায় পুরোপুরি ডুবে যায় হাণ্ডায়, অথচ ঘন হয়ে উঠতে থাকে কন্দের, অসুবিধা হয় ঘাঁটতে। জল ঢালে সাশ্বক, কিন্তু ফের তা ঘন হয়ে ওঠে, বুদ্বুদ তুলে, বাষ্প ছেড়ে ফোঁৎ ফোঁৎ করতে থাকে ফুটন্ত মিলেট। বেশ কিছু পিণ্ড উথলে চুল্লিতে পড়ে পোড়া গন্ধ ছাড়তে থাকে। তারপর একটা দলা পড়ে তার কব্জির ওপরে। হাতা ফেলে দিয়ে, ভ্যাঁ করে কেঁদে সে ছুটে যায় মায়ের কাছে।

'ছ্যাঁকা খেয়েছিস? ও কিছু না, কিছু না! একটু লালা দিয়ে নুন ছিটিয়ে দে। সেরে যাবে — অমন জ্বালা করবে না।'

তাই ছিটিয়ে দেয় সাশ্বক, পোড়া জায়গাটায় শুকিয়ে ওঠে নুনের কড়া চটা, কিছুক্ষণ পরে সত্যিই অনেক আরাম লাগে। ইতিমধ্যে নৌকোগুলো এসে ভেড়ে জেটিতে। পোড়ার কথা, সমস্ত অসুবিধার কথা ভুলে সাশ্বক ছুটে যায় সেখানে, সগর্বে চ্যাঁচায়:

'বাবা, ইভান দানিলভিচ কাকু, আমি কন্দের রেঁধেছি! আমি একা!'

'আর মা?'

'মা'র অসুখ!' সানন্দে সংবাদ দেয় সাশ্বক, 'তাই আমিই রাঁধলাম...'

বাবা আর ইভান দানিলভিচ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, জেটিতে লাফিয়ে নেমে বাবা দ্রুত আসতে থাকে ব্যারাকের দিকে। সাশ্বকের ক্ষোভ হয় — একা, নিজে নিজে ও কন্দের রাঁধল, অথচ কেউ আনন্দ দেখাচ্ছে না, অবাক হচ্ছে না।

মাছ এদিন অল্প, চটপট তা কনভেয়রে উঠে যায়, ব্যারাকে ফেরে জেলেরা। অভিমানে গাল ফুলিয়ে সাশ্বক ছোটে ব্রিগেডিয়ারের পেছু পেছু, সেই সবার আগে যায় মায়ের কাছে। অতি কষ্টে তার দিকে মাথা ফেরায় মা।

'রাগ করবেন না ইভান দানিলভিচ, আমি পারলাম না, একেবারে নেতিয়ে পড়েছি...'

'তাতে কী হয়েছে, উপোস দিয়ে মরব না। তুমি ভালো হয়ে ওঠো,' বলে ইভান দানিলভিচ। মাথা নেড়ে ইশারা করে সাশ্বকের বাবাকে নিয়ে তারা বেরিয়ে যায় আঙিনায়, 'ব্যাপার সুবিধের নয় ফিওদর, নাস্তিয়াকে ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'পাব কোথায়?'

'নিকলায়েভ্‌কায় নেই। নার্সও নেই। আছে শুধু তুজলীতে। সেখানেই নিয়ে যেতে হবে।'

‘কিন্তু কিসে করে?’

‘তুই অমন পুতুপুতু করিস না তো!’ রেগে ওঠে ইভান দানিলভিচ, ‘কোথায়, কিসে করে, কীভাবে। চলে যা নিকলায়েভ্‌কায়, গ্রাম সোভিয়েতে, কলখোজে — গাড়ি আদায় কর। মানুষ তো তারা। সাহায্য করবে। সাহায্য না করলে কী চলে। জেদ ধর, দাবি কর!’

কোনো কথা না বলে বাবা দ্রুত আঙিনা থেকে চলে যায়।

‘তা বাবুর্চি, দেখা তো কী রাঁধলি।’

হাণ্ডার ওপর থেকে কাঠের ভারি ঢাকনাটা সরায় সাশুক। উঁকি দিয়ে দেখে ইভান দানিলভিচ।

‘সব নিজে নিজে?’ — দ্রুত ঘন ঘন মাথা নাড়ে সাশুক। — ‘খাশা কন্দের! একটু ধরে গেছে মনে হচ্ছে। তবে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, বরং মাখা-মাখা হবে। সাবাস ছোকরা!’

দেমাকে ফুলে ওঠে সাশুক। স্বয়ং ইভান দানিলভিচ যে এই কথা বলছেন...

টেবিলে বসে জেলেরা খেতে শুরু করে, সাশুক ভাবে এইবার ইভান দানিলভিচের মতোই বলবে কী চমৎকার কন্দের রেঁধেছে সে, তারিফ করবে তার, কিন্তু তার বদলে সাশুকের কানে আসে ইগ্নাতের গজগজানি:

‘ভারি আমার কন্দের! একেবারে ঘ্যাঁট, তাও দা দিয়ে কুপতে হবে।’

‘ওই ঘ্যাঁটই খেয়ে নে,’ বলে জোর্‌কা, ‘সুপ আর ঘ্যাঁট কষে দাও খ্যাঁট! তাই না সারেঙ?’

‘তোর কাছে মুড়ি মুড়কি সব এক... এই টুলটা দিলেও তুই দিব্যি চিবিয়ে যাবি... অথচ খাটুনির পরে লোকের চাই সত্যিকারের খানা।’

‘পছন্দ হচ্ছে না?’ জিজ্ঞেস করে ইভান দানিলভিচ, গলার স্বর তার অপ্রসন্ন। ‘এই খাবার জন্যেই ধন্যবাদ দে ছেলেটাকে, নইলে শুধু রুটি চিবিয়েই থাকতে হত।’

ঘ্যাঁটটা সত্যিই খুব শক্ত, গলা দিয়ে নামে না, তেতো-তেতো, তাহলেও সাশুকের মনে হয় এমন সুস্বাদু খাবার সে জীবনে খায় নি। আর ইভান দানিলভিচ... এতো জানা কথা, যত লোককে সে চেনে তারমধ্যে ইভান দানিলভিচের মতো ন্যায়পর, তার মতো জ্ঞানী আর কে আছে।

হামবুড়ো

নিজের ঘ্যাঁট সাশুক খায় পেট পুরে, তৃপ্তিতে ক্লান্তিতে ঢুলুঢুলু হয়ে আসে তার চোখ। দেখা যাচ্ছে শুধু এক কন্দের রাঁধতেই লোকে নেতিয়ে পড়ে, সেও জেলেদের সঙ্গে গিয়ে ব্যারাকে ঘুমাবার তৃপ্তিটা আগে থেকে রসিয়ে দেখছিল, কিন্তু ইভান দানিলভিচ হঠাৎ বলে ওঠে:

‘ইয়েগর, ধোয়া পাকলা লাগা, কী বল।’ — অসন্তোষে মুখ কোঁচকায় জোরকা। — ‘কাউকে তো করতে হবে। তুই হলি বয়সে সবার ছোটো।’

‘ঠিক আছে,’ বলে জোরকা, ‘তবে খাস বাবুর্চিকে আমার সঙ্গে দিতে হবে। কী সারেঙ, সাহায্য করবি ? তোতে আমাতে এক দমকে সব সাফ করে দেব।’

সাশুক রাজী। রাজী এখন সে সব কিছুতেই। এমনকি আরেক দফা কন্দের রাঁধতেও। কিংবা যা বলবে। শুধু আবার সবাই বলুক কেমন সে বাহাদুর, তার সব কাজ কেমন চমৎকার উৎরেছে।

‘তোড়জোড়টা কিভাবে করা যায় ?’ জিজ্ঞেস করে জোরকা মিনিটখানেক ভাবে। তারপর বাচ্চাদের স্নান করাবার যে পাত্রটায় সাশুকের মা কাচাকাচি করত, তাতে সমস্ত বাটি আর চামচে ঢেলে দেয় জোরকা।

‘আমি ধুতে থাকব, আর তুই নিয়ে গিয়ে টেবিলে রাখবি।’

‘আর মুছতে হবে না ?’

‘আবার মোছা ! রোদ্দুরে এমনিতেই শুকিয়ে যাবে।’

সত্যি, অ্যালুমিনিয়মের বাটি আর চামচে রোদ্দুরে এমন তেতে ওঠে যে হাতে ছ্যাঁকা লাগে।

‘কী যে কাণ্ড করেছিস !’ হাণ্ডার ওপর ঝুঁকে বলে জোরকা, ‘বুলডজার দিয়ে আঁচড়াতে হবে দেখছি। বালি নিয়ে আয়।’

‘কোথায় বালি ? এখানে তো নেই।’

‘সমুদ্রে বালির ঘাটতি পড়ল কবে ? ছিছি, আবার বলে কিনা সারেঙ।’

সমুদ্রে ছুটে যায় সাশুক, আর মাত্র সেখানেই তার খেয়াল হয় যে বালি নেবার পাত্র আনে নি। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে সে জামার ভেতর দিকে বুক ভর্তি বালি ভরে ফুলে-ওঠা শার্টটা চেপে দৌড়ে ফিরে আসে। ঝুরঝুরিয়ে বালি ঝরে সুড়সুড়ি লাগছিল গায়ে, তাহলেও প্রায় অর্ধেকটা বালি সে বাঁচাতে পেরেছিল। কালিমাথা হাণ্ডাটা ঘষে জোরকা, চুল্লির ওপর কনুই ভর দিয়ে, তা লক্ষ করতে থাকে সাশুক।

‘আচ্ছা, সারেঙ কে ?’

‘সারেঙ ভায়া, একটা লোকের মতো লোক। জাহাজের পয়লা নম্বর।’

‘কর্তা ?’

‘হ্যাঁ কর্তা। তবে ওর ওপরেও কর্তার কি আর কমতি আছে। আর সারেঙ হল গে, মাঝিমাল্লাদের নিজেদের লোক, মোড়ল। জাহাজের সব ব্যাপারে ওস্তাদ। সাংসারিক ব্যাপারেও। প্রতিটি নাটবল্টু ও জানে, বোঝে কার কী মুরোদ। বাস খতম ! এবার নাক ডাকানো যেতে পারে। আরে আচ্ছা, তোর রাজকন্যাটি কই ? নাকি এই দেখা, এই ছাড়াছাড়ি, সমুদ্রের দুই জাহাজের মতো ?’

'কী যা-তা বলছ্!' রেগে ওঠে সাশ্বক।

'নে, হয়েছে, হয়েছে! একটু ঠাট্টাও চলবে না?' মিটমাট করে জোর্কা চলে যায় ঘুমতে।

আর সাশ্বক ছুটে আসে মায়ের কাছে, হয়ত তার মত বদলাবে, নতুন জামা দেবে তাকে? মায়ের চেহারা আরো ফ্যাকাশে, হাঁপাচ্ছে, কোঁকাচ্ছে। এখন কি আর জামা চাওয়া যায়। ফিরে যেতে চায় সাশ্বক, কিন্তু মা তাকে দেখে ফেলে।

'আমার কাছে একটু বস না রে,' ক্ষীণ স্বরে ডাকে সে।

নিজের চৌকিতে বসে সাশ্বক।

'ইভান দানিলভিচ বলেছে যে আমি বাহাদুর ছেলে।'

'বাহাদুর, বাহাদুর...' বলে মা।

'জোর্কাতে আমাতে বাসনও ধুয়েছি।'

চুপ করে থাকে মা, সাশ্বক কিন্তু টের পায় যে ফের জোর্কার সঙ্গে মেশাটা তার পছন্দ হয় নি। চৌকির তলে ঢুকে সে কুর্খাতিলটা বার করে আনে, নিজের গুপ্তধনটি দেখে দেখে লুকিয়ে রাখে ফের। ভনভন করছে মাছি, ঠোক্কর খাচ্ছে জানলার ধুলোভরা শার্শিতে। হাতের অঞ্জলিতে মাছি ধরতে শুরু করে সাশ্বক। মুঠোর মধ্যে গুঞ্জন করে তারা, ঠোক্কর খেয়ে সুড়সুড়ি দেয়। তবে শীগগিরই বিরক্তি ধরে যায় মাছি ধরায়। মা তেমনি তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে, অল্প অল্প গোঙাচ্ছে। তাতে ভয়ানক বিছছিরি লাগতে থাকে সাশ্বকের। বলে:

'বীমের সঙ্গে গিয়ে একটু খেলব?'

'ঠিক আছে, যা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা।

সাশ্বক যায়, তবে বীমের সঙ্গে খেলতে নয়, সোজা সেই পঞ্চম কুঠিটায়। ছুটে এসে সে থমকে যায়। গাড়িটা নেই। একেবারেই নেই। না উঠোনে, না দরজা-খোলা গ্যারেজটায়, না গ্যারেজের পেছনে। চলে গেছে। রাস্তায় পুরু ধুলোর স্তরের ওপর টায়ারের টাটকা ছাপ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তার মানে গেছে বেশি আগে নয়। হয়ত এইমাত্র। ধাপ্পা দিয়েছে জ্যোতিষী। আবার কিনা নেমন্তন্ন করেছিল আসতে। ঠিক নেমন্তন্ন করে নি, বলেছিল, 'আলবৎ' — তার মানে তো আসতেই বলা, আর নিজেই কিনা... ছি!

এত কষ্ট হয় সাশ্বকের, এত অপমান লাগে যে কান্না পায়। কিন্তু কাঁদে না সাশ্বক, মুঠো করা হাত পকেটে গুঁজে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে রাস্তায়, বালাবানভ্কার দিকে। হয়ত বা একেবারে চলে যায় নি, এমনি হয়ত গেছে কোথাও বাজারে-টাজারে, ফের আসবে? ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে হয় ভাড়াটেরা কোথায় গেছে, কিন্তু সাহস পায় না সাশ্বক, ভাগিয়ে দেবে, গালাগালি দেবে। বরং এখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করা ভালো। বাড়িতে গিয়েও তো লাভ নেই, মা কোঁকাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে জেলেরা।

নালাটা পার হয়ে বুড়ো একটা পপলার গাছের কাছে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করে সাশ্বক।

আধ-ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা — কতক্ষণ সে বসে ছিল কে জানে। সূর্য দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গাতেই, তাছাড়া সূর্য দেখে সময় ঠিক করতে সে পারে না। আর ঘড়ি — বাবারই যখন ঘড়ি নেই তখন ও তা পাবে কোথায় ? রাস্তা নির্জন। শুধু এক বাড়ির এক গিন্নি বেরিয়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে আবার ফিরে এল। তার ওপর আবার ছুটে এসেছিল কুকুরটা।

যত সময় যায় ততই নিবে আসে আশা। বাড়ি ফিরবে ঠিক করে নালাটা ফের পেরিয়ে আসে সাশুক, হঠাৎ চোখে পড়ে বালাবানভ্কার দিক থেকে বাবা আসছে। গা তার ধুলোয় ভরা, মুখও ধুলোমাখা, ঘামের নোংরা স্রোত বইছে তা থেকে।

'এখানে কেন তুই ?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করে বাবা, কিন্তু জবাবের অপেক্ষা করে না, 'মা কেমন আছে ?'

'শুয়েই আছে।'

'কী যে বিপদ ! বালাবানভ্কা, নিকলায়েভ্কা, সবখানে ছোটাছুটি করেও কিছু হল না। ঘোড়া নেই — আজকাল আর ঘোড়া রাখবে কোন চাষী ? আর কলখোজের গাড়িগুলো সব মাঠে। ফসল তুলছে। গেলাম গ্রাম সোভিয়েত। বলে, আমাদের আছে শুধু একটি বাইসাইকেল...'

কথাগুলো সে শোনায় সাশুককে নয়, নিজেকেই, কেননা বলবে, ন্যালিশ করবে এমন কেউ নেই, কেননা ভেবে পাচ্ছে না সে কী করবে।

'ঠাট্টা করলে নাকি ? সাইকেলে কি আর নিয়ে যাওয়া যায় ? তুজলী যেতে পঁচিশ কিলোমিটার পথ, চাট্টিখানি কথা নয়। যেতে যেতেই রক্তস্রাব শুরু হবে...'

'কেন ?'

'তোর মাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে রে। নইলে মারা পড়বে। কী হবে তখন আমাদের ?'

'ধেৎ,' বলে সাশুক, 'মা তো এখনো বুড়ো হয় নি।'

'বোকাটা। মরে কি কেবল বুড়োরাই ?.. কেন যে মরতে কাল গাঁয়ে গিয়েছিলাম, লাভ তো হলই না... হয়ত এতটা রাস্তা হাঁটতে গিয়েই শরীরটা বিগড়েছে...'

আপন মনে বকতে বকতেই তাড়াতাড়ি হেঁটে যায় বাবা, আর সাশুক চেষ্টা করে পিছিয়ে না পড়তে আর মনে মনে ভাবে: মা কেন মরতে যাবে ? নয় অসুখ করেছে। আগেও তো অসুখ করেছিল। ইজমাইলের হাসপাতালে ছিল দু' হপ্তা। সাশুকের বরং সুবিধেই হয়েছিল তাতে। অবিশ্যি টাটকা রান্না করা খাওয়া জোটে নি — খুবই কষ্টের কথা। তবে যত খুশি যেখানে খুশি ছুটোছুটি করায় বাধা হয় নি, বাড়ি আসার জন্য তাড়া দিত না কেউ। আর এখন হঠাৎ কিনা বলে মরতে বসেছে ! মরা লোক সাশুক দেখেছে কেবল একবার — তার দিদিমা। মুখখানা তার হয়ে আসে ছোট্ট, হলদেটে, কেমন যেন অন্য লোকের মতো। আর সবচেয়ে ভয়ংকর কথা —

প্রাণ ছিল না তার: কথা কইছে না, তাকাচ্ছে না, বুকের ওপর হাত জড়ো করে শুয়ে আছে টেবিলে। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দেওয়া হয় মাটিতে...

কেবলি একটা অস্থিরতা পেয়ে বসে সাশুককে। এখন সে স্রেফ দৌড়তে শুরু করেছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে বাবাও তাকে পেছনে ফেলে দৌড়ে গিয়ে ঢুকছে ব্যারাকের আঙিনায়।

আঙিনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা জীপ। দুটো দরজাই তার হাট করে খোলা, গোটা সীটটা জুড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে একটা ঝাঁকড়া-চুলো ছোকরা, সিগারেট খাচ্ছে।

'শোন ভাই,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে বাবা, 'বাঁচা আমায়, একটা উপকার কর, একটা লোককে তুজলীতে পেঁাছে দে, দিবি?'

চোখ তোলে ছোকরা।

'কোন লোক?'

'আর বলিস না, বৌ আমার অসুখে পড়েছে, শীগগির হাসপাতালে পাঠানো দরকার। আর মাথা কুটেও এখানে গাড়ি মিলবে না। ঘোড়া-টোড়াও কিছু নেই, কাঁধে করে কি আর নিয়ে যাওয়া যায়?'

'উঁহুঁ,' বললে ছোকরাটা, 'হুকুম নেই। আমি তো আর মালিক নই, চাকর। কর্তাকে গিয়ে ধর। আমার কী? বলুক — নিয়ে যাব।'

'কিন্তু কোথায় তোর কর্তা?'

'ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে কোথায় যেন গেল। বোধ হয় দোকানটায়...'

বারান্দায় টেবিলের কাছে বসে আছে ইভান দানিলভিচ। টেবিলে চেরভোনের দুটি বোতল এর মধ্যেই খালি, আরেকটি শুরু হয়েছে। সামনে তার নক্সা-তোলা কামিজ-পরা অচেনা একটা লোক। মোটা বা থলথলে তাকে বলা চলে না, স্রেফ খুবই পুরুষ্টু, একেবারে যেন ঢালাই করা, আর এমন নিটোল যে কামিজটা এতটুকু কোঁচকায় নি কোথায়। বারান্দার কাছে গিয়ে টুপি খুলে বাবা বলে:

'কুশল হোক মশায়ের!'

'নমস্কার,' বলে নিটোল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় ইভান দানিলভিচের দিকে।

'আমাদের একজন জেলে,' বলে ইভান দানিলভিচ।

'আপনার কাছেই এসেছি,' বলে বাবা, 'মিনতি আছে... সারা বালাবানভ্‌কা আর নিকলায়েভ্‌কা ঘুরে এলাম... ঘোড়া-টোড়া কিছু নেই। আর যৌথখামারের গাড়ি সব ক্ষেতে। সভাপতি বললে, ফসল তোলার কাজ থেকে গাড়ি সরিয়ে নেবার হুকুম নেই। গর্দান যাবে...'

'ঠিক কথা, গর্দান যাবে,' ভারিক্কী গলায় বলে নিটোল, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'বৌটি ওর অসুস্থ,' বুঝিয়ে বলে ইভান দানিলভিচ, 'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে কিছুদিন আগে, এখানে এসেই, শয্যা নিয়েছে।'

'অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে কেন?'

'কথা কি আর কানে তোলে? ছেড়ে দিলে, বাস,' বলে বাবা। আরো দরদরিয়ে ঘাম ছোটে তার মুখে, গালে, দলামোচড়া টুপিটা দিয়ে সে তাড়াতাড়ি তা মোছে, 'একটা উপকার করুন...'

'আমি কী করব, আমি তো ডাক্তার নই।'

'আপনার গাড়িতে তুজলী নিয়ে যাবার অনুমতি করুন। মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার...'

বাবা চেয়ে থাকে নিটোলের দিকে। উত্তর না দিয়ে নিটোল ভাবে। মুখ তার নির্বিকার, শুধু কেমন যেন শক্ত হয়ে ওঠে তা, আরো যেন টানটান আর ঢালাই-করা মনে হয়। বলে:

'জানি ঐসব পঁচিশ কিলোমিটার। দেড় ঘণ্টা গাড়ি হাঁকাও, তারপর এটারে, সেটারে... কত সময় লোকসান? উঁহুঁ, পারব না। আমার এক্তিয়ারের বাইরে। আমার সময় রুটিন-বাঁধা, কাজে আছি। পাশের কলখোজে ফসল আটকে আছে। জলদি গিয়ে সেখানে আমায় হাঁকড়াতে হবে লোকেদের... নিজেরাই উপায় দেখুন।'

গেলাশটা শেষ করে মুখ মোছে তালু দিয়ে, হাত বাড়ায় টুপিটার দিকে। ফিকে হলুদ রঙের টুপিটা সবই ঝাঁঝরির মতো ফুটো-ফুটো, বাতাস খেলাবার জন্য। ইভান দানিলভিচের দিকে চোখ ফেরায় সাশুক। ভাবে, এই বুঝি ইভান দানিলভিচ কিছু একটা বলবে আর সবাই যেমন তার কথা মেনে নেয়, নিটোলটাও তেমনি মেনে নেবে। কিন্তু চুপ করে থাকে ইভান দানিলভিচ, চেয়ে থাকে টেবিলের দিকে, আঙুল দিয়ে ছলকে পড়া কিছুটা মদ মাখায় তাতে।

নিটোল এবং তার পেছু পেছু ইভান দানিলভিচ বারান্দা থেকে নেমে রওনা দেয় ব্রিগেডের আঙিনার দিকে। বাপ আর সাশুক আসে পেছন পেছন। টুপিটা তখনো মাথায় দেয় নি বাবা। নিশ্চয় ও লোকটা যখন ফিরে চাইবে বা থামবে, সেই সুযোগে আবার মিনতি করার কথা ভাবছে, কিংবা আশা করছে লোকটা নিজেই তার মত ফেরাবে। আশা করছে সাশুকও। দূর থেকেই কর্তাকে আসতে দেখে ড্রাইভার উঠে বসে স্টিয়ারিঙের সামনে, স্টার্ট দেয় ইঞ্জিনে।

ইভান দানিলভিচের দিকে ফিরে নিটোল হাত ঠেকায় টুপিতে, কেবিনের দরজা খোলে। কেবল তখনি সাশুক বুঝতে পারে লোকটা মত আর ফেরাবে না, মা পড়েই থাকবে ওই গুমোট, মাছি-ভনভন ঘুপচিতে, ভয়ংকর গোঙাবে, হয়ত বা মারাই যাবে... নিজেরই অজ্ঞাতে সাশুক প্রাণপণে হাত মুঠো করে মনের সমস্ত জ্বালা ঢেলে চেঁচিয়ে ওঠে ওই টানটান শার্ট-পরা ঢালাই-করা লোকটার পিঠের দিকে:

'হামবুড়ো!'

ইঞ্জিনের আওয়াজে নিটোল সেটা শুনতে পায় না, কিংবা ভ্রূক্ষেপ করে না, ফিরে পর্যন্ত তাকায় না। বাপ কিন্তু ঠিকই শুনতে পায়, এমন থাপ্পড় কষে যে গড়িয়ে পড়ে সাশুক।

বাঁটকুল জীপ থেকে ওঠা ধুলো থিতিয়ে গেছে বহুক্ষণ, সাশুক কিন্তু বসেই থাকে চালাটার নিচে, তিক্ত চোখের জলে মুখ মাখা। ঘরে ফিরতে চায় না সে, বাবা আছে সেখানে, আর এই

মুহূর্তে বাবাকে সে ভালোবাসছে না, ঘেন্না করছে। ইভান দানিলভিচকেও। থাকত যদি জোর্কা, তাহলে এই হামবুড়োকে সে কেটে দুখান করত। নিজেও সাশুক ভয় পেত না যদি একটা ঢিল-টিল সে পেত। এমন চালাত না!.. অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবে কি করে ঢিলানো যায় নিটোলকে অথবা অন্য কোনোভাবে শায়েস্তা করা যায় আর চোখের জল তার শুকিয়ে আসে অলক্ষ্যে।

দৃষ্টি তার লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে আটকে যায় সীমান্ত মিনারটায়। লাফিয়ে ওঠে সাশুক। কেমন করে কথাটা তার আগে মনে হয় নি? ওদের যে ঘোড়া আছে, সাশুক নিজে দেখেছে। গাড়িও আছে হয়ত...

পুরনো ট্রেঞ্চ আর ভাঙা পিল-বক্সের পাশ দিয়ে উদ্দাম ছুটে যায় সাশুক। আশেপাশে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাতে কী, নিশ্চয় কোথাও আছে, হয়ত লুকিয়ে রেখেছে...

হাঁপাতে হাঁপাতে সাশুক ছুটে আসে সিঁড়িটার কাছে, মাথা তুলে চ্যাঁচায়:

'কাকু, ও কাকু!'

কেউ সাড়া দেয় না। সিঁড়িতে কিল মারে সাশুক, ফের ডাকে:

'কাকু! হাকিম কাকু!'

ওপরটা, চারিপাশটা, সব চুপচাপ, শুধু মিনারের গায়ে লেগে মনমরার মতো ক্ষীণ শনশনিয়ে উঠছে বাতাস।

অনেক ফাঁক-ফাঁক ধাপগুলো বহু কষ্টে পার হয়ে সাশুক উঠে আসে ওপরে। দরজায় হুড়কো দেওয়া, তার মানে ভেতরে কেউ নেই। তাহলেও সাশুক দরজা খুলে দেখে, সেণ্ট্রিবক্সটা ফাঁকা।

ওঠার চেয়ে নিচে নামা কেন জানি অনেক কঠিন। পেছিয়ে আসে সাশুক, ডান পা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজে নিচের ধাপটা, কোনোক্রমে সেটা পাবার পর বাঁ পাটা নামায়। তারপর ফের পরের ধাপটা খোঁজার জন্য বাড়িয়ে দেয় ডান পা।

অসাফল্যে একেবারে দমে গিয়ে সে বাড়ি ফেরে। প্রায় বেড়ার কাছে এসে পড়েছে, এমন সময় তার চোখে পড়ে কাছাকাছি কুঠিগুলোর খিড়কি বরাবর ধুলোর কুণ্ডলী উঠছে। কোনো আগ্রহ না নিয়েই সাশুক তাকায় সেদিকে, — বাতাসে ওড়া ধুলোয় দেখবার কী আছে? কিন্তু মোড়ের মুখটায় ধুলোর মেঘের মধ্যে হঠাৎ ঝলক দেয় কমলারঙা গাড়ি। বাতাসে ধুলো সরে যেতেই পরিষ্কার দেখা যায় যে কমলারঙা গাড়িটা যাচ্ছে সমুদ্রতীরের ঢালুর দিকে।

গাড়ির দিকে ছুটতে যায় সাশুক, তারপর কী মনে হতে পড়িমরি ছুটে আসে ব্যারাকে। চ্যাঁচায়:

'বাবা! বাবা!'

'আস্তে!' টুপি নেড়ে তাড়া দেয় বাবা, তখনো সেটা তার হাতেই আছে, 'দেখতে পাচ্ছিস না?'

চোখ বুজে শুয়ে আছে মা। মুখটা তার শুধু ফ্যাকাশে নয়, মেটেমেটে নীলচে।

'বাবা, ও বাবা,' ফিসফিসিয়ে চেঁচায় সাশুক, 'জ্যোতিষী এসেছে!'

'কী বকছিস!'

'মানে সেই লোকটা... গাড়ি করে। চলো ওকে গিয়ে বলি।'

লাফিয়ে ওঠে বাবা, দু'জনে তারা ছুটে যায় কমলারঙা মোটরগাড়ির দিকে। লাফাতে লাফাতে আনুস্যা ছুটছে ঢালুটায়, এঁটে ভর্তি একটা ব্যাগ নিয়ে মা যাচ্ছে তার পেছু পেছু, আর দরজা বন্ধ করে জ্যোতিষী ঘাড়ে তুলছে তাঁবু খাটাবার জন্য কাপড়ে জড়ানো পোল।

'ও মশায়!' ছুটে গিয়ে মরিয়া গলায় বলে বাবা, 'মাপ করবেন মশায়... ভগবানের নামে একটু উদ্ধার করুন!'

দয়ামায়া না করে সে পিষতে থাকে টুপিটাকে। এই প্রথম সাশুকের চোখে পড়ে কী যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে তার মুখে, কী ভাবে কাঁপছে তার ফ্যাকাশে ঠোঁট। সাশুকের নিজের ঠোঁটও কাঁপতে শুরু করে।

'কী ব্যাপার?' ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্যোতিষী মাটিতে রাখে পোলগুলো।

তাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসে আনুস্যার মা, তারপর থেমে গিয়ে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকে।

'বৌয়ের আমার অবস্থা খারাপ, হাসপাতালে পাঠানো দরকার তুজলীতে... কত ছুটোছুটি করলাম, মাথা কুটেও কিছু পেলাম না, না একটা ঘোড়া, না একটা গাড়ি। মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার। আর তীর বরাবর গেলে হয়ত আরো কম।'

'ইয়েভগেনি, একটু শুনে যাও,' জ্যোতিষীকে ডাকে তার বৌ।

'একটু দাঁড়ান,' বলে চলে যায় জ্যোতিষী।

পা দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলে জোরে নয়, তাহলেও সাশুক শুনতে পায়।

'খবরদার যাবে না বলছি!' বলে বৌ।

'কিন্তু কেন?'

'কেন? কী না কী রোগ, তা জানো?'

'জানি যে মেয়েটি অসুস্থ, আর সেইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা।'

'আর আমরা? আমি? এসব কোন কথা নয়? ফলাফলের কথা ভেবে দেখেছ?'

'আহ্, তোমায় নিয়ে...' একেবারেই অস্বাভাবিক, শুকনো, নিষ্ঠুর গলায় বলে জ্যোতিষী, 'একেবারেই সীমা ছাড়িয়ে গেছ। অসুস্থ মানুষ, সাহায্য দরকার... এখনো আমার বিবেক হারায় নি, নিশ্চয় যাব।'

'ও, বটে? বেশ!' রাগে প্রায় ক্ষেপে উঠে বলে বৌ, নাক তার ফ্যাকাশে হয়ে ফেঁপে উঠেছে, 'যার জন্যে খুশি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি হও গে... কিন্তু মনে রেখো, এখানে আমি আর থাকছি

না। এক দিনও নয়! যতসব নোংরা, আবর্জনা, পরোপকারব্রত, বদ ছোঁড়া — এসব আমার যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়! কালকেই চলে যাব। ছুটি কাটাতে এসেছি, মানুষের মতো থাকব...'

'যা অভিরুচি,' শুকনো গলায় জবাব দিয়ে জ্যোতিষী চলে যায় গাড়ির কাছে। 'বসুন,' দরজা খুলে দিয়ে সে বলে সাশুকের বাবাকে।

সাশুকের বাবা আনাড়ীর মতো পাশকে ভঙ্গিতে, পাছে কিছু নোংরা করে ফেলে এই ভয়ে সসঙ্কোচে বসে সীটে। সামনে ছুটে যায় সাশুক যাতে সেও চোখে পড়ে, তাকেও গাড়িতে নেয়। কিন্তু কেউ খেয়াল করে না ওকে, ফলে 'মস্ক্‌ভিচের' চাকার ওঠা ঘন ধুলোর মধ্যে পেছু পেছু ছোটা ছাড়া তার কিছু করার থাকে না। যখন সে আঙিনায় এসে পেঁছয়, ইভান দানিলভিচ আর বাবা ততক্ষণে মাকে শোয়াচ্ছে পেছনের সীটে। বাবা বসে জ্যোতিষীর পাশে, সঙ্গে সঙ্গেই স্টার্ট নেয় গাড়ি, কিন্তু ঘোরে নিকলায়েভ্‌কার দিকে নয়, তীর বরাবর সীমান্ত মিনারটার দিকে, তার কাছ দিয়েই চলে গেছে অল্প-ব্যবহৃত রাস্তাটা। ধুলো থিতিয়ে আসার পর সাশুক দেখতে পায়, আনুস্যার মা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, তার পা ফেলার ভঙ্গিটা পর্যন্ত কেমন রাগী-রাগী। পেছনে মাথা নিচু করে অনিচ্ছায় চলছে আনুস্যা।

কুর্খাতিল

বেলা গড়িয়েই চলেছে, বাবা আর জ্যোতিষীর কিন্তু তখনো দেখা নেই। আঙিনায় ঘোরাঘুরি করে সাশুক, তীরে যায়, কিন্তু কেউ নেই সেখানে, একা একা বিচ্ছিরি লাগে, তাছাড়া ভয় হয় জ্যোতিষী হয়ত এসে চলে যাবে, ও দেখতে পাবে না, তাই ঘরে ফেরে। চালার তলে বসে আড্ডা মারছে জেলেরা, কী সব চুটকি বলছে আর হোহো করে হাসছে। সাশুকের ইচ্ছে হয় সেখানে একটু বসে, কিন্তু তাড়িয়ে দেয় তাকে।

'পালা, পালা, এখনো তুই ছোটো, এসব শুনতে হয় না...'

অভিমান হয় সাশুকের, যদিও এই প্রথম নয়, এতদিনে অভ্যাস হয়ে যাবার কথা: বড়োরা নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টার কোনো গল্প শুরু করলেই নির্ঘাত তাকে তাড়িয়ে দেবে।

শেষ পর্যন্ত সীমান্ত মিনারের কাছে ধুলোর মেঘ উঠে রাস্তা বরাবর এগিয়ে আসতে থাকে ব্যারাকের দিকে। ছুটে যায় সাশুক। 'মস্ক্‌ভিচ' থামে ফটকের কাছে। এখন আর তা কমলারঙা নয়, ধুলোয় হলুদ-খয়েরি। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে বাবা। জ্যোতিষীকে বলে:

'ধন্যবাদ আপনাকে, যা উপকার করলেন কী বলব... এই নিন!' পাঁচ রুব্‌লের একটা দলামোচড়া নোট এগিয়ে দেয় সে।

নোটটার দিকে তাকায় জ্যোতিষী, তারপর বাবার দিকে, ভুরু কপালে তোলে।

'পাগল হয়েছেন নাকি! এখ্‌খুনি ওটা সরান!'

'সে কী করে হয় ?'

'হয়। টাকা পকেটে ঢোকান।'

'তাহলে মাছ এনে দেব ? টাটকা ? এ্যাঁ ?'

'কিছুই আমার লাগবে না। পরের বিপদ আমার রোজগার করার জন্যে নয়।' এই সময় সাশুককে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে যে আলাপটা অন্য প্রসঙ্গে ফেরানো যাবে। বলে, 'আরে এই যে, মরা কাঁকড়ার নির্ভীক শিকারী ! কেমন চলছে ? নিজের তারাটা খুঁজে পেলি ?'

'না,' মাথা নাড়ে সাশুক।

'পাবি পাবি, এখনো তোর সময় আছে ঢের... আচ্ছা, আমার বাড়ির লোকদের দেখেছিস ? সমুদ্রতীরে রয়েছে ?'

'বাড়ি ফিরে গেছে, আপনি যেই গেলেন, তখ্খুনি...'

'তখ্খুনি ? গতিক খারাপ...'

সাশুক ভাবে, জ্যোতিষী এই বার ওকে গাড়িতে বসাবে, যাদু-করা হর্ণ বাজাতে দেবে, তারপর স্পীড দিয়ে ছুটবে 'দুনিয়া ছাড়িয়ে' — বালাবানভ্কার পাঁচ নম্বর কুঠিতে। খোলা দরজাটার দিকে সে এক পা এগিয়েও যায়। কিন্তু তার নাকের সামনেই দরজা বন্ধ করে দেয় জ্যোতিষী। খোঁচা খাওয়া ঘোড়ার মতো তীর বেগে 'মস্ক্ভিচ' হারিয়ে যায় ধুলোর মেঘে।

'নাস্তিয়া কেমন আছে ?' জিজ্ঞেস করে ইভান দানিলভিচ।

'হাসপাতালে দিলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা, 'আমায় বরং বকলে এত দেরি করেছি বলে। আর একটু হলেই... কিন্তু আমার কী দোষ ?.. সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত দিতে লাগল... আশা করছে...'

'ভাবনা নেই, সেরে উঠবে,' বলে জোর্কা, 'দেখতে না দেখতে। ডাক্তারি যে, মহাবিদ্যা তো !'

'ডাক্তারি ডাক্তারিই,' অনিশ্চিত স্বরে বলে ইভান দানিলভিচ, 'থাক গে, ওহে জেলেরা। নাস্তিয়ার তো এই অবস্থা... জানোই তো। কী করা যায় ? আজ কাটিয়ে দেওয়া যাবে — দোকানে সসেজ এসেছে... তবে রোজ তো আর এভাবে সারা যাবে না। টাকারও শ্রাদ্ধ, তাছাড়া আমাদের যা কাজ, তাতে শুকনো খেয়ে চলবে না।'

'ঠিক কথা। রান্না খাবার ছাড়া হবে না।'

'কাজটা ঘাড়ে নিতে রাজী আছে কেউ ? স্বেচ্ছাসেবক !'

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জেলেরা হাসাহাসি করে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না।

'ও কাজে জোর্কাকে লাগাও, চেষ্টা করে দেখুক।'

'চেষ্টা করা দেখিয়ে দেব, ভেব না !'

'কেন ? বাচ্চাটাও তো রাঁধলে।'

'আহা, বড়ো বললেন।'

'চুপ!' বাধা দেয় ইভান দানিলভিচ, 'এ কি বাজার পেয়েছ? কাজের কথা বলো, হল্লা নয়।'

সবাই চুপ করে যায়।

'আমি রাজী হতে পারি,' সাবধানে বলে ইগ্নাৎ, 'কিন্তু হিশেব-নিকেশের কী হবে?'

'কিসের হিশেব?'

'সমবায়ে খাটলে আমি উপরি রোজগারের ভাগ পেতাম। আর এখানে?'

'খাঁই দ্যাখো বেটার!' চেঁচিয়ে ওঠে জোর্কা।

ইভান দানিলভিচও মাথা নাড়ে:

'সত্যি দেখালি বটে... তুই যে এখনো ঠিক জেলে নস, মাছ ধরতে এলি এই প্রথম, আর চাইছিস...'

'আমি তো আর এমনি নিচ্ছি না, সমানে-সমানে খাটছি।'

'সমান-সমান হতে তোর এখনো বাকি আছে। যাক গে। তুইও ভাগ পাবি। দিন কয়েকের তো মামলা। সেমিওন আসবে, নেক্রাসভ্কায় বলে পাঠাব কাউকে পাঠাতে... আপত্তি আছে কারো?'

সবাই চুপ করে থাকে। সাশ্কের মায়ের বালিশের তলে যে চাবিটা থাকত, সেটা পকেট থেকে বার করে ইগ্নাৎকে দেয় ইভান দানিলভিচ।

'নে, এই আমাদের ভাঁড়ার। কাল থেকে তোর রাঁধুনিগিরি। এবার খাওয়া যাক, দম দিয়ে নিই, শীগগিরই বেরুতে হবে...'

সবাই যায় দোকানে, সসেজ আর এক এক বোতল 'সিত্রো' কেনে। জোর্কা এক বোতল চেরভোনে নেয়, কিন্তু ইভান দানিলভিচ এমন খেঁকিয়ে ওঠে যে জোর্কা সঙ্গে সঙ্গেই তা ফেরত দেয় দোকানীকে। সমুদ্রে যাবার আগে মদ খাওয়া বারণ।

সসেজটা খুব নোনা আর শক্ত; তাহলেও ভারি মুখরোচক। নিজের ভাগটা সাশ্ক পুরো খেয়ে শেষ করে, ছালটাও বাদ দেয় না। সিত্রো সে খাচ্ছে জীবনে এই প্রথম। চটচটে, গাঢ় মিষ্টি, তার আঙুল আর ঠোঁট আটকে যায়। তাহলেও সে পুরো বোতল খেতে রাজী, এমনকি দু'বোতল। পুরো পিপে। ইভান দানিলভিচ কেন বললে যে এ খাওয়ায় চলবে না? নিজে সে খুব রাজী। এমনকি প্রত্যেক দিন।

জেলেদের কাছ থেকে সসেজের ছাল জুটেছিল বীমের। বীম আর সাশ্ক এর পর কেবলি জল খেতে ছোটে।

'আর এর কী হবে?' ইভান দানিলভিচকে জিজ্ঞেস করে বাবা, 'সঙ্গে নেব নাকি?'

'খেপেছিস নাকি, বাচ্চাকে নিয়ে সাগরে যাওয়া — খেলা পেয়েছিস! আবহাওয়া যদি বিগড়ায়?'

সাশুকের ইচ্ছে হয় বলে, আবহাওয়াকে সে ডরায় না, ওকে বরং সঙ্গে নেওয়া হোক, সমুদ্রে যাওয়ার তার খুব ইচ্ছে, এখানে একলা পড়ে থাকতে ভয় নেই বটে, কিন্তু... বলা তার হয়ে ওঠে না। ইভান দানিলভিচ ফেরে তার দিকে:

'ওরে সাশুক, তোর ওপর একটা দায়িত্বশীল কাজের ভার দিচ্ছি। তুই একলা থাকছিস ব্যারাকে। পাহারা দিবি, চারিদিকে নজর রাখবি, বুঝেছিস ?'

সাশুক মাথা নাড়ে। এমন দায়িত্ব পেলে অন্য কথা।

'একা একা ভয় পাবি না ?'

'আর আগের কালে ? ভয় পেত ছেলেরা ?'

'নে, ঠিক আছে। হয়ত আলো থাকতে থাকতেই ফিরব। আজ বেশি দূর যাব না। দেখিস কিন্তু, তোর ওপরেই ভরসা।'

'ব্যারাকে বরং তালা দিয়ে যাওয়াই ভালো,' বলে ইগ্নাৎ, 'বলা তো যায় না...'

'আর ও থাকবে কোথায় ? কিছুই হবে না, চোর-ছ্যাঁচোড় এখানে নেই।'

চলে যায় জেলেরা, আর সত্যিকারের পাহারাদারের মতো সাশুক গুরুগম্ভীরভাবে টহল দেয় ব্যারাকে, দেখে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। অবিশ্যি দেখবার কিছু নেই। মাছ প্রসেসিঙের কারখানাটা বন্ধ। ব্যারাকের বাঙ্কে বাঙ্কে ধামসানো বিছানা আর মাছি। ভাঁড়ার চাবিবন্ধ আর উঠোন বরাবরের মতোই রোদে পোড়া, ধুলো ভরা। সূর্য ডোবার আগেই এখনো ছুটে গিয়ে দূর থেকে একবার 'মস্ক্‌ভিচ'টা দেখে ফিরে আসা যায়। কিন্তু ব্যারাক ছাড়া অসম্ভব। কী করে সে যায় যখন ইভান দানিলভিচ বলেছে, সেই ভরসা ?

সীমান্ত মিনারটার কাছে টিলার পেছনে আধাখানা ঢাকা পড়েছে সূর্য। ভালো হত ব্যারাকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে, ভয় হত না তাতে। কিন্তু সেটা আরো খারাপ, ঘরের ভেতর কোণে কোণে অন্ধকার জমেছে, অথচ বাইরেটা তখনো গোলাপী আলোয় ঢালা।

চ্যাপ্টা লম্বাটে হয়ে ওঠে লাল সূর্য, তারপর একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু আলো তখনো অঢেল, বেশ দেখা যায় যে সীমান্ত মিনারের কাছে ফের একটা ঘোড়া রয়েছে, লেজ নাড়াচ্ছে। তার মানে সীমান্ত প্রহরীরা ফিরেছে। সাশুকের তাতে ভয় কমে গেল এমন নয়, কেননা মোটেই তার ভয় হয় নি, তাহলেও কেমন যেন স্বস্তি বোধ হয়। হাকিম আর নক্সা-কাটা উর্দি-পরা লোকটা যখন রয়েছে ওখানে, তখন কিছু একটা হলে সে সংকেত পাঠাবে, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তখন... কিন্তু সংকেত দেবে কী করে ? আগুন জ্বালাবে ? কিন্তু আগুন জ্বালাতে জ্বালাতেই তো... ভালো হত বন্দুকের শব্দ করতে পারলে, কিন্তু করবে কী দিয়ে ? ব্যারাক থেকে লণ্ঠন আর দেশলাই নিয়ে আসে সাশুক। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর খুলতে পারে সেটা, আলো জ্বালে। জ্বালে সময়মতোই। চারপাশটা এর মধ্যেই একেবারে আঁধার হয়ে গেছে। শুধু পশ্চিম আকাশটা একটুখানি ফরসা। তবে, সেটাও শীগগির নিবে যাবে। ব্যারাকের দরজা বন্ধ করে

সাশ্বক, চাবিটা সব সময় তালাতেই লাগানো থাকে, সেটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করার পর শেষ পর্যন্ত ক্যাঁচকেঁচিয়ে তা ঘ্বরে যায়। সেটা বার করে নিয়ে সাশ্বক তার জামার তলে রাখে। বলা তো যায় না, যদি কিছ্ব হয়।

জ্বলন্ত পলতেটার দিকে তাকিয়ে থেকে যদি আর কোনো কিছ্বই না ভাবা যায়, তাহলে মনে হয় শ্বধ্ব লণ্ঠনের কাছটুকুতেই নয়, চতুর্দিকেই আলো, একেবারেই ভয় লাগে না তখন। সাশ্বকও চেষ্টা করে আশেপাশে না তাকিয়ে কেবল আলোটাই দেখতে। আলোর দিকে উড়ে যায় সব পোকা। এমনিতে ছোটো ছোটো — একেবারে ক্ষ্বদে, একটু বড়োও আছে, কতকগ্বলো আবার বেশ বড়ো, প্রজাপতির মতো, মোটা মোটা মখমলী পেট তাদের। ছোটো পোকাগ্বলো দেখতে দিনের মতো নয়, কেমন যেন ফ্যাকাশে, শাদাটে। লণ্ঠনের চারপাশে উড়ছে তারা, কাচের গায়ে ঠোকর খেয়ে প্বড়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে টেবিলটার ওপর। পোকাগ্বলোকে তাড়াবার চেষ্টা করে সাশ্বক, কিন্তু একগ্বঁয়ের মতো তারা কেবল উড়ে আসে সাশ্বকের দিকে আর প্বড়ে মরে। ভালো করে লক্ষ্য করার জন্য সাশ্বক ম্বঠোর ওপর ম্বঠো চাপিয়ে তার ওপর থ্বতনি রাখে। উড়ছে আর উড়ছে পোকাগ্বলো, কেবলি ঠোকর খাচ্ছে...

মিটমিট করে লণ্ঠনের আলো, কমে আসে একটা ব্বত্তে, একটা বিন্দ্বতে। আর সে বিন্দ্ব থেকে ফের জ্বলে ওঠে আলো, দেখা দেয় অসাধারণ জ্বলজ্বলে রোদ-ঢালা দিন।

প্বরো ব্রিগেড চালার তলে বসে গা জ্বড়িয়ে নিচ্ছে। সাশ্বকও বসে আছে টেবিলে। 'মস্ক্‌ভিচ' এসে দাঁড়ায় আঙিনায়। গাড়ি থেকে নেমে জ্যোতিষী কুশল বিনিময় করে সবার সঙ্গে, সাশ্বককে বলে: 'তা, কেমন চলছে?'

'সব ঠিক আছে,' বলে সাশ্বক।

'আর মা?'

'মা হাসপাতালে।'

'তাহলে তো দেখতে যেতে হয়। ওঠ...'

সাশ্বকের সামনে ডান দিকের দরজা খ্বলে ধরে সে।

'ও সীটে কেন?' বলে ইভান দানিলভিচ, 'নিজেই ও চালিয়ে নিয়ে যাক। ওর ওপর আমার ভরসা আছে।'

জ্যোতিষী তখন বসে ডান দিকের সীটে, আরোহী হিসেবে। আর গ্বর্বগম্ভীরভাবে সাশ্বক বসে স্টিয়ারিঙের সামনে। বলে:

'চালাতে হলে কী করা দরকার?'

'হর্ণ দিতে হবে বৈকি,' বলে জ্যোতিষী।

হর্ণ দেয় সাশ্বক, এমন প্রচণ্ড শব্দ হয় যে তাড়াতাড়ি কানে আঙ্বল গোঁজে সচকিত জেলেরা।

'স্পীড দেব ?' জিজ্ঞেস করে সাশ্বক।

মাথা নাড়ে জ্যোতিষী, চোখ মটকায়।

'লাগা !'

শোঁ করে গাড়ি ছুটতে থাকে তীর বরাবর স্বল্পব্যবহৃত কাঁচা রাস্তাটায়। সীমান্ত প্রহরীবা ওপরের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত নাড়তে থাকে তার উদ্দেশে। সাশ্বকও বাঁ হাতটা বার করে আঙুল নাড়ে, যা করে সেমিওন কাকু।

মিনারটা পড়ে থাকে অনেক পেছনে, তারপর একেবারেই অদৃশ্য হয়। রাস্তা বরাবর রোদ-পোড়া মাঠে চরে গরুর পাল। হর্ণ দেয় সাশ্বক, যেন ঝড়ে উড়িয়ে নেয় গরুগুলোকে আর হাঁ করে হাত এলিয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায় রাখাল, উল্লাস করে ওঠে।

মেঠো পথে গাড়ি ছুটছে, হঠাৎ জ্যোতিষী বলে:

'আরে দাঁড়া, কী ওটা ওখানে ?'

সামনে দেখা যায় কালো একটা বিন্দু, বিন্দুটা দ্রুত বড়ো হয়ে ওঠে, 'মস্ক্‌ভিচ' যে জিনিসটার কাছে থামে সেটা কিছু আগেও ছিল একটা জীপ।

চাকাগুলো তার চার দিকে ছিটকে গেছে, মাঝামাঝি ভেঙে পড়েছে বডিটা। বনেট থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। ধোঁয়া উঠছে পেছন থেকে। আকাশের দিকে উঁচানো র‍্যাডিয়েটরের সামনে দাঁড়িয়ে হতাশভাবে মাথা চুলকাচ্ছে ড্রাইভার।

আধ-ভাঙা বডি থেকে ঘর্মাক্ত কলেবরে বেরিয়ে আসে কালিমাখা নিটোল। ছুটে আসে সে 'মস্ক্‌ভিচ'এর কাছে, হালকা রঙের ফুটো-ফুটো টুপিটা আগে থেকে খুলতেও ভোলে না।

'শোন ভাই,' মিনতি করে বলে সে, 'বাঁচা আমায়, উপকার কর একটু। তুজলীতে পেঁছে দে, এ্যাঁ ?'

সাশ্বক আর জ্যোতিষী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। নিটোল তাদের দৃষ্টি ধরার চেষ্টা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে:

'ভেঙে পড়েছে... এদিকে ঘোড়া-টোড়া কিছু নেই, আর কলখোজের সব গাড়ি ক্ষেতে... একটা উপকার করুন। তুজলী পর্যন্ত আপনার গাড়িতে নিয়ে চলুন। এ্যাঁ ? সেখানে আমায় হাঁকড়াতে হবে লোকেদের।'

ভিখিরির মতো সে তাকায় একবার সাশ্বক, একবার জ্যোতিষীর দিকে, দলা পাকাতে থাকে টুপিটা, ঘাম মুছতে গিয়ে আরো নোংরা আর কালিমাখা করে মুখখানা। সাশ্বক বলে:

'আর অন্য লোকে যখন তোমার কাছে চেয়েছিল, তখন গাড়িটা দিতে তোমার কষ্ট হয়েছিল, তাই না ?'

এ কথায় দমে গিয়ে নিটোল ছটফট করে আরো দীনহীনের মতো, কিন্তু সাশ্বক আর জ্যোতিষী অটল।

'ঠিক কথা,' বলে জ্যোতিষী, 'বসে থাকুক এখানে। ন্যায় কাকে বলে টের পাক।'

স্পীড দেয় সাশ্বক, অপমানিত উপেক্ষিত নিটোল পড়ে থাকে পেছনে।

তুজলীর রাস্তা দিয়ে ছুটছে গাড়ি, থেকে থেকে সাশ্বক এমন তীক্ষ্ম প্রচণ্ড হর্ণ দিচ্ছে যে লোকে হুড়মুড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছে রাস্তা থেকে। হাসপাতালের অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে মা আর ডাক্তার। মাকে এখন আর ফ্যাকাশে, বেজার দেখাচ্ছে না, রঙ তার গোলাপী, মুখ হাসি-খুশি, একেবারে ভালো হয়ে গেছে সে। ডাক্তারের চেহারাটা জোরকার মতো, শুধু চশমা-পরা, দাড়িওয়ালা।

'ভালো হয়ে গেছে তো?' জিজ্ঞেস করে জ্যোতিষী।

'নয় তো কী!' ডাক্তার বলে জোরকার গলায়, 'দেখতে না দেখতে। ডাক্তারি যে, মহাবিদ্যা তো!'

'তাহলে বসুন,' বলে জ্যোতিষী, 'আমি আপনাদের নিয়ে যাব দুনিয়া ছাড়িয়ে। কিংবা সোজা মহাকাশে...'

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আসে, ডাক্তার পরিণত হয় জোরকায়, চ্যাঁচায় ঠিক সাশ্বকের কানের কাছেই:

'আমি তো আগেই বলেছিলাম, খাঁটি সারেঙ! ব্যারাক পর্যন্ত বন্ধ করে রেখেছে...'

তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জোরকা আর ইভান দানিলভিচ, নিচ থেকে লণ্ঠনের আলো পড়েছে তাদের ওপর।

'সাবাস!' বলে ইভান দানিলভিচ, 'ডোবাস নি দেখছি। চাবি দে।'

জামার তল থেকে চাবি বার করে এগিয়ে দেয় সাশ্বক, তারপর হঠাৎ বুক ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'হল কী তোর বোকা কোথাকার?' অবাক হয় জোরকা।

'সত্যি নয়!' কান্নায় দম বন্ধ হয়ে আসে সাশ্বকের।

'কী সত্যি নয়?' জিজ্ঞেস করে ইভান দানিলভিচ।

'কিছুই সত্যি নয়!' চ্যাঁচায় সাশ্বক, কাঁদতে কাঁদতে মুখ গোঁজে কনুইয়ের ভাঁজে।

ইভান দানিলভিচ আর জোরকা নীরবে চেয়ে থাকে সাশ্বকের দিকে। বাপ এসে ওকে কোলে করে নিয়ে যায় তার খাটে। শান্ত হয়ে আসে সাশ্বক, কিন্তু তারপরেও ফোঁপাতে থাকে অনেকক্ষণ, কেঁপে কেঁপে উঠে নিশ্বাস ফেলে।

নতুন করে আর শুরু হয় না স্বপ্নটা। মড়ার মতো ঘুময় সে, কোনো স্বপ্নই আর দেখে না। জেগে উঠে সব মনে পড়ে যায় তার, প্রথমেই ইচ্ছে হয় তাকে জাগিয়ে দিয়েছিল বলে গালাগালি দেবে জোরকাকে। কিন্তু গাল খাওয়ার মতো কেউ নেই, ব্যারাক শূন্য, আঙিনায় একা ইগ্নাৎ চুল্লি ধরাচ্ছে। জ্যোতিষীর কুঠিতে ছুটে যায় সাশ্বক। 'মস্কভিচ' দাঁড়িয়ে আছে

অলিন্দের কাছে, মাল বইবার ডালাটা তার খোলা। রাস্তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে জ্যোতিষী কী যেন ঘাঁটাঘাঁটি করছে সেখানে। হয়ত... হয়ত কোথাও যাবে সে, সাশ্রুককে সঙ্গে নেবে হয়ত? হয়ত বা বাস্তব হয়ে যাবে স্বপ্নটা। কেন হবে না, দিদিমা তো কতবারই বলেছে স্বপ্ন ফলে যায়...

দরজায় দেখা দেয় আনুস্যার মা, দুটো ব্যাগ রাখে অলিন্দে। বলা যায় না কী হয় ভেবে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে সাশ্রুক। মা চলে যায়, বেরিয়ে আসে আনুস্যা, তখন আস্তে করে শিস দেয় সাশ্রুক। জ্যোতিষী তা শুনতে পায় না, অথবা খেয়াল করে না, আনুস্যা কিন্তু মাথা ফেরায়। হাতছানি দেয় সাশ্রুক। বাইরে বেরিয়ে আসে আনুস্যা। মুখখানা ওর কেমন মনমরা অথবা হয়ত মাত্র ঘুম-ঘুম। আজ তার সাজে আরো ঘটা, পরনে লাল বর্ডার দেওয়া শাদা ফ্রক, মাথায় নতুন পানামা টুপি, তাতেও লাল বর্ডার, পায়ে লাল জুতো।

'এত সাজগোজ করেছিস যে, একেবারে নবাব বেটী?' জিজ্ঞেস করে সাশ্রুক।

'আমরা চলে যাচ্ছি,' দুঃখ করে বলে আনুস্যা, 'একেবারে।'

চুপ করে সাশ্রুক তাকায় একবার আনুস্যা, একবার জ্যোতিষীর দিকে, ব্যাগদুটো গাড়িতে তুলেছে সে। আনুস্যা ফের টান দেয় তার টুপির রবারে, ফট করে সেটা লাগে তার থুতনিতে।

'আমার জন্যে?'

'সব কিছুর জন্যে। এসব মায়ের কাণ্ড... 'থাকব না। কিছুতেই না...' মায়ের বলার ভঙ্গি অনুকরণ করে সে, 'অথচ আমার এখানে বেশ লাগছে। বাবারও!'

'তাহলে যাচ্ছিস কেন?'

'মাকে কি কখনো বোঝানো যায়?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনুস্যা, 'বলে, এখানে মানুষ নেই, কলের জল নেই, কিছুই নেই...'

'মানুষ নেই মানে? দ্যাখ না কত লোক।'

হতাশে কাঁধ নাড়ে আনুস্যা। চুপ করে থাকে দু'জনেই। অনেকক্ষণ, মন ভার করে।

'আর আমি ভেবেছিলাম আমার জন্যে তুই আরো কাঁকড়া ধরবি। আমিও ধরব। লুকিয়ে রাখব কোথাও।'

'একটু দাঁড়া!' চেঁচিয়ে ওঠে সাশ্রুক, 'আমি এখ্খুনি আসছি!'

পড়িমরি বাড়ি ছুটে যায় সে, খাটের তল থেকে কুর্খতিলটা নিয়ে সাবধানে তা দুই হাতে আঁকড়ে ফের ছুটে আসে। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আনুস্যা।

'নে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে সাশ্রুক।

চোখ বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে আনুস্যার, আনন্দের হাসিতে কুঁচকে ওঠে নাক।

'চিরকালের জন্যে? স্মৃতি?'

'হ্যাঁ।'

'ওহ্! বাবা, ও বাবা, এটাও রাখো... দ্যাখো কী জিনিস সাশ্রুক আমায় দিলে!'

আনুস্যা আঙিনায় ছুটে যেতেই মুখোমুখি হয় মায়ের। কুর্খতিলটা দেখে মা, নাক তার শাদা হয়ে ফুলে উঠতে শুরু করে।

'ফের যত সব নোংরা ছাইপাঁশ!'

আনুস্যার কাছ থেকে কুর্খতিলটা কেড়ে নিয়ে সে সরোষে ছুড়ে ফেলে দূরে। অলিন্দের কাছে আবর্জনা সরাবার লোহার আঁচড়াটায় লেগে তা চাপা আর্তনাদে ভেঙে যায়। আতঙ্কে দু'হাত জড়ো করে আনুস্যা, তুলে ধরে জালের থলিটা, ঠন-ঠন করে ওঠে কাচের ভাঙা টুকরোগুলো।

'কেন করলে বলো তো! এতটুকু মায়া নেই তোমার!' চেঁচায় আনুস্যা, হু-হু করে কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবার ওপর, 'বাবা, বাবা, বলো না ওকে!'

আনুস্যার কম্পমান কাঁধ চেপে জ্যোতিষী নীরবে চেয়ে থাকে বৌয়ের দিকে। মুখ ফিরিয়ে চলে যায় বৌ, গিয়ে বসে সামনের সীটটায়।

কুর্খতিলের সঙ্গে সঙ্গে আরো কী একটা জিনিস ভেঙে যায়, সাশুক এখনো সেটার নাম জানে না, কিন্তু অসহ্য দুঃখ হয় তাতে। ক্ষিপ্তের মতো তাকায় সে, বেড়ার গোড়ার কাছ থেকে শুকনো এক দলা মাটি ভেঙে নেয়, হাত তোলে — তারপর হাত নামিয়ে নেয়। রাগে কাঁপতে থাকে সে, মাটির দলাটা সে ছুঁড়েই মারত ওই সুন্দর দজ্জাল মুখখানায়, কিন্তু বোঝে যে তা করা চলে না। নালা পেরিয়ে সে উবু হয়ে বসে সেই ধুলোভরা বুড়ো পপলার গাছটার কাছে।

আনুস্যা তখনো কাঁদছে, জ্যোতিষী তাকে বসায় পেছনের সীটে, বাড়ির গিন্নির কাছে বিদায় নিয়ে মোটরে স্টার্ট দেয়। 'মস্‌ক্‌ভিচ' দুলে উঠে বেরিয়ে আসে রাস্তায়।

জ্যোতিষী আর তার বৌ দু'জনেই তাকিয়ে থাকে সোজা সামনের দিকে, একটা কথাও বলে না তারা, যেন মাঝখানে তাদের এক অদৃশ্য দুর্ভেদ্য দেয়াল। সীটের ওপরকার প্যাকেজগুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে আনুস্যা। কেউ লক্ষ করে না সাশুককে।

নিকলায়েভ্‌কার দিকে বাঁক নেয় গাড়িটা। এ রাস্তায় একদিনকার থকথকে কাদা শুকিয়ে গেছে বহুদিন, চাকায় চাকায় তা পরিণত হয়েছে বাদামী ধুলোয়। ঘন মেঘে তা পাক খেয়ে উঠে ঢেকে ফেলছে কমলারঙের ছুটন্ত যাদুকে।

নচ্ছার

বরাবরের মতোই বীম আনন্দে ছুটে আসে সাশুকের দিকে, লুটোপুটি করে পায়ের কাছে, যেন ধরতে চায় তার আঙটার মতো গোল লেজখানা। সাশুক ভ্রূক্ষেপও করে না। বুক ভরা তার অভিমানের জ্বালা। বীমের কিন্তু মান নেই। পাগলার মতো সে ছোটাছুটি করে,

এদিক-ওদিক বাঁক নেবার সময় মোটা পেটটা তার একদিকে হেলে যায়, দাঁড়িয়ে পড়ে সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে ফের ছুটে আসে সাশুকের কাছে। আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসে সাশুক। এমনকি বিবেকেই বেঁধে: বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে তার দেখাশোনাই ছেড়ে দিয়েছে। এটা নয় ওটা নিয়ে মেতে আছে, আর ভুলে গেছে ওকে। একেবারেই হাঘরে হয়ে পড়েছে। বলে:

'এবার সব চুকে বুকে গেল। এখন থেকে আমাদের আর ছাড়াছাড়ি হবে না। খিদে পেয়েছে?'

ছুটে আসে তারা ইগ্নাতের কাছে। সাশুক বলে:

'ইগ্নাৎ কাকু, ভাঁড়ারের চাবি দাও, রুটি নেব।'

'কী আবদার, ভাঁড়ার ঘাঁটবি!'

'কেন? মা আমায় দিত।'

ইগ্নাৎ কেমন অদ্ভুতভাবে আড়চোখে চায় তার দিকে, চুপ করে থাকে, তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে:

'মা দিত, বটে... দাঁড়া। ভাঁড়ার থেকে নিয়ে আসছি।'

কিছুক্ষণ পরে সে ভাঁড়ারে ঢোকে, দরজা বন্ধ করে নিয়ে আসে এক টুকরো রুটি। সুস্বাদু চটার দিকটা নয়, মাঝখান থেকে।

'দু'জনের জন্যে কম পড়বে,' ঠোঁট ফুলায় সাশুক।

'আবদার রাখ, কুকুরের জন্যে আবার ওর রুটি চাই। এঁটো কাঁটা যা পড়ে থাকবে খাবে। কুকুর কুকুরই।'

'কঞ্জুস বটে!' মনে মনে অবাক হয়ে চলে আসে সাশুক। রুটিটা ফুটোফুটো, স্যাঁতসেঁতে, পুরো সেঁকা হয় নি। নিজের জন্য ওপরকার চটাটা ভেঙে নেয় সাশুক, বাকিটা খাওয়ায় বীমকে।

অবিশ্যি আনুস্যার সঙ্গে খেলতে যত ভালো লাগে, বীমের সঙ্গে খেলতে তা লাগে না — যে কথাই ওকে বলো, শুধু চোখের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়বে। তবে ফেলে তোমায় পালাবে না কোথাও। আর পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে সে রাজী সব সময়।

ছুটেই তারা যায় তীরের কিনার পর্যন্ত, বালি যেখানে ভেজা, অথচ পা এঁটে যায় না। গাংচিলেরাও অপেক্ষা করে জেলেদের, ভাবে মুফতে পেট ভরাবে, কেবলি যায় আর আসে, যায় আর আসে। ভারি বেহায়া পাখিগুলো, হয়ত টের পেয়েছে যে সাশুক আর বীম এখনো ছোটো, একটুও ভয় পায় না তাদের, ওড়ে একেবারে মাথার ঠিক ওপরেই। ডানা মেলা ছায়াটা তাদের ওপরে আসতেই বীম ভয় পেয়ে লুটিয়ে পড়ে বালিতে, পালিয়ে যায় দূরে, তারপর আহতের মতো ঘেউ-ঘেউ করে সরে যাওয়া বেহায়া পাখিটার উদ্দেশে আর হেসে ওঠে সাশুক। বলে:

'ছি ভীতু কোথাকার। তবে দাঁড়া বড়ো হয়ে ওঠ, তখন আর কাউকে ভয় পাবি না, তোকেই ভয় করবে সবাই...'

এই অদূর ভবিষ্যৎটা সাশুক খুব স্পষ্টই দেখতে পায়। বড়ো হয়েছে বীম, প্রকাণ্ড এক হিংস্র কুকুর সে। সবাই তাকে ভয় পাচ্ছে, এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে, তোয়াজ করতে চাইছে। কিন্তু কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না সে, শুনছে কেবল তার মনিব সাশুকের কথা। সবখানেই তারা যাচ্ছে একসঙ্গে। গম্ভীর চালে তার পাশে পাশেই কদম ফেলছে বীম, মাঝে মাঝেই দাঁত বার করছে, ফুঁসে উঠছে দরকার পড়লেই। সাশুককে অপমান করতে, তার পেছনে লাগতে আর সাহস পাচ্ছে না কেউ...

গলা ফাটিয়ে ডাকতে শুরু করে গাংচিলগুলো, জেটিতে ভিড়ছে নৌকোগুলো। মাছ ধরা পড়েছে এবার অনেক, জেলেরা খুশি ফুর্তিতে রঙ্গরসিকতা করছে।

'এই সারেঙ!' চেঁচায় জোর্কো, 'আয়, হাত লাগা, নইলে পেরে উঠব না।'

ইগ্নাৎও জেটিতে আসে সমবায়ের জন্য মাছ নেবার ঝুড়ি নিয়ে। সবাই তাকে দেখে চেঁচায়:

'হ্যাদে গো রাঁধুনি, অ্যাপ্রন তোর কোথায়? ঘাগরা পরলে পারতিস, মানানসই হত।'

ঠাট্টার বদলে ঠাট্টায় জবাব দিতে পারে না ইগ্নাৎ, গোমড়া মুখে চুপ করে থাকে, আরো কুঁচকে ওঠে তার ভুরু।

মাছ বাছার জন্য সাশুক উবু হয়ে বসে জোর্কোর পাশেই। জেটিতে হৈচৈ খুব ভালো লাগে বীমের, সবারই পায়ে পায়ে ঘোরে সে, সবখানেই শুঁকে বেড়ায় তার জিভ বার করে। তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাকে, কিন্তু ওর মনে হয় এটা মজাদার খেলারই একটা অঙ্গ, আরো মেতে উঠে সে ছুটে যায় ইগ্নাতের পায়ের কাছে। ইগ্নাৎ কিন্তু রেগে তার হাইবুট দিয়ে লাথি মারে তাকে। সামান্য একটু ক্যাঁক করে বীম উড়ে গিয়ে পড়ে সমুদ্রে।

জেটির ধার পর্যন্ত ছুটে আসে সাশুক। খলবল করছে না বীম, সাঁতরাচ্ছে না, ধীরে ধীরে উল্টে গিয়ে তলিয়ে যেতে থাকে।

'হাবুডুবু খাচ্ছে?'

'হতে পারে না...'

লম্বা হাতলওয়ালা ছাঁকনি দিয়ে নৌকোর এক জেলে ছেঁকে তোলে বীমকে, তুলে দেয় জেটিতে। সাশুক নাড়াচাড়া করে তাকে, কুকুরছানা কিন্তু অসাড়, আধ-খোলা মুখ থেকে কিছু জল বেরিয়ে আসে, আর গোলাপী জিভের ডগাটুকু। জেলেরা চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখে ছানাটাকে, সাশুককে, ইগ্নাৎকে, শুধু মাথার ওপর এদিক-ওদিক ওড়ে গাংচিলগুলো আর তীক্ষ্ণ ডাকে।

'মারা গেল?' সাশুকের পেছন থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করে।

'মরে নি, মেরেছে। মারতে আর কত!'

'গায়ের ঝাল মেটাবার আর লোক পেল না...'

কেবল তখনই সাশুকের খেয়াল হয় কী ঘটেছে। কুকুরছানাটাকে সে বুকে করে চাপে, নাড়া

দেয়। নড়বড় করে নিষ্প্রাণ লেজ আর পা, ঝুলে পড়া মুখটা থেকে দেখা যায় ছোটো ছোটো দাঁত, তার ফাঁকে জিভের ডগাটুকু। কান্নায়, হতাশায়, রাগে সাশুকের চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

'তুই... তুই ফ্যাসিস্ট!' চেঁচায় সে ইগ্নাৎকে লক্ষ করে, 'নচ্ছার কঞ্জুস!'

বাক্সগুলোর ওপর ঝুঁকে থাকা জোর্কা ধীরে ধীরে ভয়ংকর ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে ওঠে, বাক্সগুলোর ভেতর দিয়ে গিয়ে সে ইগ্নাতের শার্ট চেপে ধরে ঘুসি তোলে।

'ইয়েগর!'

ইভান দানিলভিচের ডাকটা যেন বেতের ঘা। ক্ষ্যাপার মতো জোর্কা কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে ইভান দানিলভিচের দিকে, গলার শিরা তার এমন ফুলে উঠে যেন এখখুনি ফেটে যাবে। ঘুসি নামিয়ে নিয়ে ঠেলে দেয় ইগ্নাৎকে, চিত হয়ে সে পড়ে কনভেয়রের ওপর।

'ভাগ শালা। আমার সামনে যেন আর না পড়িস!'

হাত থেকে পড়ে যাওয়া ঝুড়িটা তুলে নিয়ে মাথা নিচু করে ইগ্নাৎ তাড়াতাড়ি চলে যায় জেটি থেকে। নীরবে সেদিকে তাকিয়ে থাকে জেলেরা।

'শোন সারেঙ,' হাঁপাতে হাঁপাতে জোর্কা সাশুকের কাঁধে হাত দিয়ে বলে, 'রোদ্দুরে দে, হয়ত বেঁচে উঠবে...'

'নাও হয়েছে, লাগাও হে,' হুকুম দেয় ইভান দানিলভিচ, 'কাজ থেমে রয়েছে!'

রোদ্দুরে কাজ হল না। লোমগুলো শুকিয়ে উঠল, কিন্তু কুকুরছানাটা নিজে শিটিয়ে গেল, পাগুলো হয়ে উঠল লাঠির মতো শক্ত, বাঁকানো যায় না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদতে থাকে সাশুক। জোর্কা এসে তার পাশে বসলেও মাথা তোলে না সে। মরা কুকুরটাকে নেড়ে জোর্কা বলে:

'হয়ে গেছে! নে, এখন আর কেঁদে কী হবে।'

'ক-কষ্ট হচ্ছে,' খাবি খেয়ে বলে সাশুক।

'কষ্ট হচ্ছে, বুঝছি। কিন্তু শুধু কষ্ট দিয়ে তো আর কিছুই হবে না। গোর দিতে হবে,' মরিয়ার মতো মাথা নাড়ে সাশুক। 'তা নইলে কী করে চলবে। এমনি রেখে দিলে গাংচিলেরা ঠোকরাবে, টেনে নিয়ে যাবে কাঁকড়ারা, মড়ার ওপর এ জীবগুলোর ভারি লোভ।'

জেটি থেকে খানিকটা দূরে, মাটির খাড়াই পাড়টার কাছে জোর্কা হাত দিয়েই বালি খোঁড়ে। লাসটা সেখানে রেখে বালি চাপা দেয়। তারপর সাশুকের হাত ধরে বাড়ি নিয়ে আসে। হাত ধরার দরকার ছিল, কেননা প্রায়ই হোঁচট খায় সাশুক। কান্নায় বন্ধ হয়ে যায় তার চোখ, গাল ভেসে যায় চোখের জলে, মুঠো দিয়ে সাশুক তা মোছে, কিন্তু ফের জল ঝরতে থাকে। জোর্কা তাকে বোঝায়, ছি-ছি করে, কিন্তু সাশুক অবুঝ। বুক তার কুরে কুরে যায় কষ্টে। অনুতাপ হয় যে ছানাটার দিকে সে এ কয়দিন নজর দেয় নি, একেবারেই ভুলে গিয়েছিল শুধু

তাই নয়, এখানে এই বালাবানভ্‌কায় নিয়ে এসেছিল বলেও। নেক্রাসভ্‌কায় বাচ্চাটাকে সে রাখতে চায় নি, ভয় হয়েছিল ওকে ছাড়া বাচ্চাটা হয়ত পটল তুলবে, অথচ মারা পড়ল কিনা এখানে। নেক্রাসভ্‌কায় বীমকে রেখে এলে হয়ত সে বেঁচেই থাকত, আর এখন...

রুটি আর কন্দের সাশুকের কাছে তেতো লাগে, নামে না গলা দিয়ে। ফোঁপানি আটকাবার চেষ্টা করে সে, কিন্তু তাতে তা হয়ে ওঠে আরো চাপা, দমকা-মারা। জেলেরা খেয়ে যাচ্ছে চুপচাপ, মন সবার ভার, রোজকার মতো হাসিঠাট্টা কিছু নেই, সেটা এইজন্য নয় যে শোক হচ্ছে কুকুরছানাটার জন্য — কারো বিশেষ টান ছিল না তার ওপর — কিন্তু মেজাজ সবার মাটি হয়ে যাচ্ছে। শুধু সারাক্ষণ কে যেন গজগজ করছে:

'নাস্তিয়ার রান্নাটা হত অনেক ভালো বেশ সুস্বাদু...'

কেউ সমর্থন করে না তাকে। ইগ্নাৎ ভাব করে যেন শোনে নি। শুতে যায় জেলেরা। আঙিনা ছেড়ে চলে যায় সাশুক, ইগ্নাতের কাছাকাছি থাকতে সে চায় না।

দুপুরের ঝাঁঝ কাঁপছে, ঝিলমিল করছে পুরনো ট্রেঞ্চগুলোর খাল আর ঢিবি, ভেঙে যাওয়া পিল-বক্সের কংক্রীট চাঙড়গুলোর ওপর। এখন সেদিকে সাশুক তাকায় নিঃস্পৃহের দৃষ্টিতে — লড়াই লড়াই খেলবার কেউ নেই। বীম পর্যন্ত নেই, যদিও সেও খেলতে পারত না। হয়ত পরে শিখে নিত...

খাড়াই পাড়টার ওপর বসে সাশুক চেয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। নৌকো নেই, ধোঁয়া নেই, পাল নেই সেখানে। শুধু সীমাহীন ঝিলিক, রোদের ছোপ আর দিগন্ত বরাবর উত্তপ্ত আবছায়া। গাংচিলগুলো পর্যন্ত নেই, কোথাও লুকিয়ে আছে, নিশ্চয় শুতে গেছে তারাও। ডাঙাতেও নেই কেউ। ব্যারাকের আঙিনা ফাঁকা, রোদ্দুরের ঝাঁঝে বালাবানভ্‌কা জনশূন্য, মাঠ তো একেবারেই খাঁ-খাঁ করছে। বিশাল এই নির্জনতায় নিজেকে এত ছোটো, এত হারিয়ে-যাওয়া মনে হয় সাশুকের যে অসহ্য কষ্ট হয় নিজের জন্য। বিপদের ওপর বিপদ। মা হাসপাতালে। আন্‌স্যাকে নিয়ে চলে গেছে জ্যোতিষী। এবার বীমও গেল, সাশুক পড়ল একেবারে একা। জেলেদের সঙ্গে কি আর কথা বলা চলে। কেবল হাসবে তারা। আর খেলার কথা তো... সাশুককে সবাই ভালো চোখেই দেখে, কিন্তু লাভ কী তাতে, সবাই ওরা বড়ো, সারাক্ষণ হয় কাজ করছে নয় ঘুমুচ্ছে, জিরচ্ছে। একা কেবল জোর্‌কা...

সবার আগে ঘুম ভেঙে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসে জোর্‌কা। দু'জনে তারা চান করে বালির ওপর শোয়, নানা আলাপ করে। জোর্‌কা বলে:

'দুঃখু করিস না রে। নেক্রাসভ্‌কায় গিয়ে তোকে এমন কুকুরছানা জোগাড় করে দেব যে নাচবি। সত্যিকারের তল্লাসী কুকুর। সীমান্তরক্ষীদের যেমন থাকে, জানিস তো?'

'জানি,' তল্লাসী কুকুর পেতে সাশুকের খুবই ইচ্ছে। তাহলেও একটু ভেবে সে বলে 'কিন্তু সে তো হবে অন্য কুকুর। বীম তো নয়।'

‘বীমকে তো আর ফেরাতে পারবি না, কী হবে ভেবে... ইভান দানিলভিচ না থাকলে আমি ও শালাকে...’

‘অন্তত একটা ঘা মারলেও পারতে!’ আফশোসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাশুক।

‘সে হয় না ভাই, ইভান দানিলভিচকে কথা দিয়েছি। ক্ষেপে উঠলে আমি তাণ্ডব বাধাতে পারি...’

দুপুরের খাওয়ার সময় ফের সেই কন্দের, ফের সেটা সাশুকের কাছে মনে হয় বিস্বাদ। শুধু সাশুকের কাছেই নয়। সকালে যে জেলে নাস্তিয়ার কথা তুলেছিল, সে চামচে দিয়ে কন্দের ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলে:

‘নির্ভেজাল পানি।’

‘ইগ্নাৎ, চর্বি দিয়েছিলি তো?’

‘দিয়েছি বৈকি,’ বলে ইগ্নাৎ।

‘কোথায় দিয়েছিস, চর্বির টুকরোর টিকিও দেখা যাচ্ছে না।’

‘যেমন আছে তেমনি দিয়েছি। টেনে চলতে হবে তো। নইলে এক দফা গমগম, তারপর ঢনঢন।’

‘কেন, চর্বি আমাদের নেই নাকি?’ জিজ্ঞেস করে ইভান দানিলভিচ।

‘আছে, তবে কম। দেড় টুকরো।’

‘কিন্তু গেল কোথায়? ছিল তো অনেক।’

‘আমি কী জানি? প্রথম থেকেই ভাঁড়ারের দায়িত্ব আমার থাকলে নয় হত। যার খুশি সেই ভাঁড়ারে ঢোকে। যেমন এইটা,’ সাশুককে দেখায় ইগ্নাৎ, ‘এটাও ভাঁড়ারে ঢুকেছিল। কে জানে হয়ত চর্বি খাইয়েছে কুকুরকে...’

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে সাশুকের। কী করে এই মিথ্যে কথাটা ও বলতে পারল? কী জন্য? এমন হতভম্ব বিক্ষুব্ধ বোধ করে সাশুক যে একটা কথাও বলতে পারে না, শুধু চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে সে তাকিয়ে থাকে নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী ইগ্নাতের দিকে।

‘তাই তুই কুকুরছানাটাকে মেরেছিস?’ হাঁকড়ে ওঠে জোর্কা।

‘বাজে কথা রাখ,’ তাকে থামিয়ে দিয়ে ইভান দানিলভিচ ফেরে ইগ্নাতের দিকে, ‘নাস্তিয়ার নামে দোষ দিতে যাবি না বলছি। সবার চেয়ে সে সৎ। আর বলবার থাকলে লোকের পেছনে নয়, মুখোমুখি বলতে হয়।’

‘আপনার মতে তাহলে আমি নিয়েছি? দাঁড়াচ্ছে যে চুরি করেছি?’

ইভান দানিলভিচ চুপ করে থাকে, কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে না জোর্কা, চেঁচিয়ে ওঠে:

‘হ্যাঁ, তাই দাঁড়াচ্ছে!’

‘তুই দেখেছিস চুরি করতে?’ আক্রোশে জবাব দেয় ইগ্নাৎ, ‘দেখেছিস?’

'এখখুনি দেখব। গিয়ে ঝাঁকাব তোর বাক্স, দেখব কী লুকিয়ে রেখেছিস।'

'কোনো অধিকার নেই তল্লাস করার!'

'বিনা অধিকারেই করব। ইচ্ছে হয় আমাকেও তল্লাস কর। লুকোবার আমার কিছু নেই। আর তুই যখন লুকোচ্ছিস...'

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় জোর্কা। ইগ্নাৎ পেছিয়ে যায় ব্যারাকের দরজার দিকে, মুখ তার হয়ে ওঠে ছাইরঙা।

'কী বলছ তোমরা সব!' এক এক করে জেলেদের মুখের দিকে চায় সে, 'তাই চলে কখনো? আর চর্বি যদি আমি বাড়ি থেকে এনে থাকি? দরকার হতে পারে তো। বাড়ি থেকে আনা চলবে না?'

আস্তে করে লম্বা শিস দেয় কে যেন, চাপা গলায় বলে:

'ধরা পড়েছে!'

'বুঝলাম!' বলে ইভান দানিলভিচ।

সবাই মুখ ফেরায় ইভান দানিলভিচের দিকে, অপেক্ষা করে কী সে বলবে। ইভান দানিলভিচ চুপ করে তাকিয়ে দেখে ইগ্নাৎকে। তারপর একে একে তাকায় সকলের দিকে। কিছুই বলে না, জিজ্ঞেস করে না, শুধু তাকিয়ে দেখে। নিশ্চয় সেইটেই দেখতে পায় যা দেখতে চেয়েছিল। তারপর ফের তাকায় ইগ্নাতের দিকে, দৃঢ় চাপা গলায় বলে:

'ভাগ এখান থেকে!'

'ভাগ মানে? কোথায়?'

'আমাদের কাছ থেকে। চিরকালের মতো।'

'কী বলছ ইভান দানিলভিচ? কী শুরু করেছ এসব? কোন এক বিটকেলে কুকুরের জন্যে লোককে তাড়িয়ে দেওয়া যায় কখনো?'

'কুকুরের জন্যে নয়, মানুষের জন্যে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে হয়। তুই সেটা পারিস না। অমন লোকে আমাদের পোষাবে না। চলে যা তোর চাটিবাটি গুটিয়ে...'

'কিসের জন্যে? কী আমি করলাম?'

'নিজেই তুই ভালো জানিস। নাকি সত্যিই তল্লাস করব?.. সমুদ্র — এ তোর বাড়ির বাগান পাস নি, একলা-একলি এখানে চলে না। আমাদের হল সমবায়ের কাজ — শুধু নিজের কথা যে ভাবে তেমন দুমুখোদের আমরা পছন্দ করি না। বুঝেছিস?.. কারো আপত্তি আছে?'

'পাত্তাড়ি গুটোক!'

'একটু বিবেকের কথা ভাবুন, সামনে রাত...'

'ভাবনা নেই, পথ-চলতি গাড়ি ধরে চলে যাবি। আর বিবেকের কথা ভাবিস তখন। নিজের বিবেক।'

কিছুক্ষণ আগে জেটিতে যা হয়েছিল, সেইভাবেই মাথা নিচু করে ইগ্নাৎ ব্যারাকে ঢোকে।

'ইভান দানিলভিচ কাকু,' বলে সাশুক, 'ও সব মিছে কথা বলেছে। মাইরি বলছি! মা আমায় কখনো এই এতটুকু চর্বিও দেয় নি। বলে সমবায়ের জিনিস...'

'ঠিক কথা!' মাথা নাড়ে ইভান দানিলভিচ।

'কিন্তু তুমি টের পেলে কি করে?'

'টের পাই নি রে, জানি।'

নিজের বাক্স নিয়ে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে ইগ্নাৎ সেটা নামিয়ে রাখে:

'আর হিসেব-নিকেশের কী হবে? আইনে আছে, মেয়াদের আগে বরখাস্ত করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে...'

'আইনে ঠিকই আছে,' বলে জোর্কা, 'ক্ষতিপূরণ তোকে এই এখুনি মিটিয়ে দিচ্ছি, আমার নিজের তরফ থেকে,' প্রকাণ্ড ঘুষো পাকিয়ে সে মুঠোটা রাখে টেবিলের ওপর।

'পাগলামি করিস না,' থামায় তাকে ইভান দানিলভিচ, 'সভাপতিকে আমি সব জানাব, এ তো হাট পাস নি, হিসেবে ঠকাবে না।'

'যাই বলো, নালিশ করব কিন্তু।'

'নে-নে ভাগ এখন!' বলে জোর্কা।

কাঁধে বাক্স তুলে ইগ্নাৎ চলে যায় রাস্তায়, তারপর বাঁক নেয়, বালাবানভ্কার দিকে। বাক্স কাঁধে মূর্তিটা তার ক্রমেই ছোটো হয়ে আসে।

দুই হাঁটুর মধ্যে হাত চেপে সাশুক আড়চোখে তাকায় অপসৃয়মাণ মূর্তিটার দিকে, বিতাড়িত ইগ্নাতের জন্য কেমন মায়াই হয় তার। জিজ্ঞেস করে:

'কিন্তু কোথায় ও যাবে এখন?'

'ফের নেক্রাসভ্কায়,' বলে জোর্কা, 'শব্জী ভুঁইয়ে মাটি কোপাবে, ইজমাইলে শহুরে লোকদের শসা টমাটো বেচে ঠকাবে... ভয় নেই, অমন চীজ ডুববে না কখনো।'

জেলেরা চলে যায়। টেবিলের কাছে শুধু সাশুক আর জোর্কা। নোংরা বাসনগুলো গাদা করে জোর্কা আর সাশুক কী যেন ভাবে। বলে:

'কিন্তু কেন...'

তার দিকে তাকায় জোর্কা।

'কেন লোকে হিংসেমি করে, মিথ্যে কথা বলে, ঠকায়?'

চুপ করে থাকে জোর্কা।

'আদপেই,' চিন্তিতভাবে বলে সাশুক, 'খারাপ লোক হয় কেন?'

'কোনো মানে নেই, কিন্তু হয়। তা কী করা যাবে, বস্তাবন্দী করে জলে ফেলে দেব?'

আড়চোখে, নিচু থেকে ওপর পানে সাশুক চায় জোর্কার দিকে। জবাবটা তার মনঃপূত হয় না, ফের সে হাঁটুর মধ্যে হাত গুঁজে কুঁজো হয়ে ভাবতে থাকে।

ভাবনাটা তার আনন্দের নয়। ছোটো হওয়ার কত অসুবিধা, কত কষ্ট, সবাই তোমার মনে আঘাত দিচ্ছে বলে নয়। সে তো আছেই। প্রধান কথা — কত জিনিস কিছু বোঝা যায় না। 'তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে উঠতে পারলে হয়!' আকুল হয়ে ভাবে সাশুক। সবচেয়ে ভালো হয় জ্যোতিষী যে তারার কথা বলেছিল সেটা খুঁজে পেলে... তাহলে হ্যাঁ, তাহলে সে জানতে পারবে কোথায় ভালো লোক, কোথায় খারাপ, কাকে বিশ্বাস করা যায়, কাকে নয়, কোনটা সত্যি, কোনটা ধাড়িবাজি, কী করা উচিত...

'এবার আমাদের সমুদ্রে যেতে হবে,' বলে জোর্কা, 'একলা ভয় পাবি না?'

মাথা নাড়ে সাশুক।

'না... আমি কেবল জেটিতে যাব। গাংচিলগুলো দেখব...'

চলে যায় জেলেরা। ব্যারাক বন্ধ করে সাশুক ছুটে যায় তাদের পেছু পেছু। সন্ধ্যার আগে গাংচিলদের সংখ্যা কমে এসেছে, উড়ছে আর চ্যাঁচাচ্ছে সেগুলো।

চলে যায় নৌকোগুলো। জেটির ধারে দাঁড়িয়ে সাশুক তাকিয়ে থাকে সেদিকে। একটা নৌকো থেকে কে যেন হাত তোলে, দূর থেকে ভেসে আসে জোর্কার গলার স্বর:

'ঘাবড়াস না সারেঙ!'

নড়ে না সাশুক, উত্তরও দেয় না কেবল তাকিয়ে থাকে অপসৃয়মাণ নৌকোগুলোর দিকে।

ডুবে যায় সূর্য, বরাবরের মতোই, তারপর দ্রুত অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। পূবে দেখা দেয় একটা তারা। প্রথমটা আবছা হলেও ক্রমেই তা জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে আরো তারা ফুটে ওঠে, গহন অন্ধকার সমুদ্রে ফুলকি ছোটায় তাদের প্রতিফলন ঝিলমিল করে ওঠে। কিছুই সেসব দেখে না সাশুক। খালি বাক্সগুলোর কাছে গুটিসুটি হয়ে সে ঘুমোয়।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

বাড়ি নম্বর ৩৩, সী — ১৪

তাশখন্দ — ৭০০০১১, সোভিয়েত ইউনিয়ন

"Raduga" Publishers
House No. 33, C—14
Tashkent—700011, USSR

